জীবন-জিজ্ঞাসা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
গ্রাম-কুলগাছিয়া ; পোঃ-মহিষরেখা ;
জেলা-হাওড়া
১৩৫৮

শ্রীমান্ ভূমীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণীয়েষু

সূচী

মুখবন্ধ

'জীবন-জিজ্ঞাসার' প্রবন্ধগুলি পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের অধিকাংশই লেখকের স্বকীয় ভাব-চিন্তা ও কল্পনা-প্রসূত; দুই-একটি ছাড়া, কোথাও তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই। সকল রকমের চিন্তাই ইহাতে আছে—সাহিত্যও আছে, কাব্যও আছে, হয়তো ধর্ম্মতত্ত্বও আছে, কিন্তু সকলই লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা, অর্থাৎ, এগুলি—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "Personal Essays"—তাহাই; নিজ-চিত্তের আকুতি ও উৎকণ্ঠা এই লেখাগুলিতে নানা ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে; জিজ্ঞাসা-নামটিও সেই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। এই জিজ্ঞাসা কেমন, এবং তাহা যে আদৌ জীবন-সম্বন্ধীয়—এই গ্রন্থের 'অতি-পুরাতন কথা' নামক প্রবন্ধে পাঠক তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন; বস্তুতঃ ঐ প্রবন্ধে আমার সাহিত্যিক জীবনের অন্তরতর আত্মকথা আছে।

'জীবন-কাব্য'-নামক একটি পৃথক্ খণ্ডে যে রচনাগুলি স্থান পাইয়াছে, তাহার অধিকাংশই Imaginative Prose বা গদ্যকাব্য। এগুলি আমার প্রথম বয়সের রচনা,—তখনও কবিতা আসে নাই, কিন্তু জীবনকে কল্পনার রঙে রঙীন করিয়া দেখিবার—তাহার রহস্য-রসে আবিষ্ট হইবার কাব্য-প্রেরণা যে সত্যই আসিয়াছে, আজ এ বয়সে ঐ রচনাগুলি পড়িয়া সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছি; ঐ ভাষা পরে আর লিখিতে পারি নাই। তাই এতদিন পরে সেই বিস্মৃত ও উপেক্ষিত রচনাগুলিকে স্বীকার করিলাম—জীবনের ঐ কাব্যময় রূপ-কল্পনা "জীবন-জিজ্ঞাসা"য় স্থান পাইতে পারে। এগুলির মধ্যেও 'আমি'-শীর্ষক রচনাটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এই রচনাটি একালের একটি বহুবিখ্যাত কবিতার সাক্ষাৎ প্রেরণা, এবং স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার আহরণ-স্থান হইয়াছিল। পাছে কেহ—কোন মহামনস্বী সমালোচক—আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসরচনা-কালে আমাকে পরস্বাপহারী বলিয়া সাব্যস্ত করেন (একজন ঐ শ্রেণীর পণ্ডিত ইতিমধ্যে আমাকে উক্ত কবির শিষ্য বলিয়া রায় দিয়াছেন), তাই আমি এখানে মাত্র ঐটুকু জানাইয়া রাখিলাম।

কিন্তু তৃতীয় খণ্ডে 'মন-মর্ম্মর' নামে যে চিন্তাগুলি সংকলিত হইয়াছে, সেগুলিরও একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। মাঝে মাঝে ডায়েরীর মত নোট-বহিতে আমি আমার মনের যে কথাগুলি ধরিয়া রাখিতাম—নিজের মনের সহিত নিজেরই পরিচয়ের মত যে চিত্ত-চমকগুলি ভাল লাগিত—তাহা হইতেই, এই গ্রন্থের উপযোগী কয়েকটি চিন্তা, আমি ঐ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ডায়েরী-লেখার মত কালক্রমিক ভাবে আমি এগুলি লিখি নাই—তাহা স্বাভাবিকও নয়, কারণ, ঐরূপ চিত্ত-চমকের কোন দিন-ক্ষণ থাকে না; তথাপি মোটামুটি একটা কালানুযায়ী ভাগ উহাতেও সম্ভব, আমি সেইরূপ বৎসর-ভাগ করিয়া—কেবল বয়সের নির্দ্দেশ দিয়াছি। বলা বাহুল্য, 'মন-মর্ম্মরে' যে সকল চিন্তা আছে, তাহা এক-এক সময়ের এক-একটা ভাব-তরঙ্গ, তাহাতে কোন বিশিষ্ট মত বা চিন্তাধারার পূর্ব্ব-পর সঙ্গতি নাই; যে-বিষয়ে যখন যে-প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তৎকালীন ভাবনা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বড়িশা, ২৪ পরগণা,
দশহরা, ১৩৫৮।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জীবন-জিজ্ঞাসা

সত্য ও জীবন

আমরা সকলেই সত্যের অনুরাগী; সত্যের যাহা বিপরীত, অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা আমাদিগের মনকে বিমুখ করিয়া তোলে; কথায় ও কাজে আমরা সত্য-নিষ্ঠার পক্ষপাতী। কিন্তু এই সত্য কি? জাগতিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক অর্থে ইহার মূল্যভেদ আছে কি না? দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র যে সত্যের সন্ধান বা প্রচার করে, তাহার কোনও প্রয়োজন আছে কি না? এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

সত্য ও সত্যবাদ সম্বন্ধে ইংরেজ দার্শনিক বেকন তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—"What is Truth?—said jesting Pilate and would not stay for an answer"। অর্থাৎ—সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর নাই, অতএব প্রশ্নই বৃথা—সংশয়বাদী Pilate এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু দর্শনে বা বিজ্ঞানে যেমন হউক, ধর্ম্মে ও নীতিশাস্ত্রে সত্যবাদ ও সত্যাচরণের একটা আদর্শ বহুদিন হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ধর্ম্মগুরু বা সংহিতাকার সামাজিক জীবনযাত্রার আদর্শ যুগে যুগে যতই পরিবর্ত্তন করুন, সত্যের এই নৈতিক মূল্য বা মর্য্যাদা মানুষের সংস্কারে চিরদিন অটুট হইয়া আছে। এই সত্যনিষ্ঠার গৌরবে রামায়ণের নর-চরিত্র দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

এই সত্যনিষ্ঠা আদিম বর্ব্বর জাতির মধ্যে আরও অকৃত্রিম, আরও প্রবল। তাহার কারণ, সৃষ্টির মধ্যে যে আত্মরক্ষণ-নীতি আছে, যাহা জীবধর্ম্ম-নীতি, তাহাই এই সত্যনিষ্ঠার মূল। জটিলতর সমাজ-জীবনে, উন্নত মনোবৃত্তির প্রভাবে, মানুষের এই স্বভাব-ধর্ম্ম যেমন সজ্ঞান ও সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই ব্যক্তি ও সমাজ এই উভয়ের স্বার্থ যতই পরস্পরবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে, ততই—যাহা এককালে স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত জৈব প্রবৃত্তি ছিল, তাহাই ক্রমশঃ স্বার্থসম্বরণমূলক ত্যাগধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই আদিম সত্যনিষ্ঠার মধ্যে কোনও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ছিল না; যাহা জানি বলিব, যাহা বলিব তাহা করিব—ইহা যেমন সহজ তেমনই স্বাভাবিক ছিল; সে-সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ চিন্তার বাধা ছিল না। কিন্তু যখনই সেই

বাধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখনই এই সত্যভাষণ ও সত্যাচরণ আর সহজ বা স্বাভাবিক রহিল না; ইহার জন্য আত্মনিগ্রহ, এমন কি আত্মবিসর্জ্জন করারও প্রয়োজন হইল। সেজন্য, একদিকে যেমন ইহার মূল্য বাড়িয়া গেল, তেমনই আর এক দিকে ইহার অর্থ কমিয়া গেল। স্বভাব বা স্বাস্থ্যের জন্যই ছিল যাহার প্রয়োজন, তাহাই একটা নৈতিক আদর্শ-নিষ্ঠায় পরিণত হইল; অর্থাৎ, তাহার দ্বারা কোনও প্রত্যক্ষ কল্যাণ সাধিত না হইলেও—এমন কি অনিষ্ট ঘটিলেও, একটা ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহের মহিমাই ইহার একমাত্র অর্থ হইয়া দাঁড়াইল, একটা নৈতিক অহংজ্ঞানই মুখ্য কারণ হইয়া উঠিল।

অতঃপর, এই সত্য-সাধনের মধ্যে মানুষের মনের একটা সূক্ষ্ম অহংকার জড়িত হইয়া গেল—মানুষ আপনার মধ্যে বিবেক নামক যে বস্তুটির আবিষ্কার করিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজেরই উচ্চতর অহংকার। এইরূপে হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা মানসবৃত্তির প্রাধান্য ঘটিল! কারণ, প্রেম এই ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিরোধী—অন্যায় বা অসত্য যত বড়ই হোক, প্রেম তাহাকে ক্ষমা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার পক্ষে কোনরূপ অসত্যের সঙ্গে সন্ধি করা অসম্ভব। মানুষ এই দ্বন্দ্বের নিরসন-চেষ্টাও করিয়াছে, সত্যের সঙ্গে ধৃতি ও ক্ষমাকেও মহাপুরুষ-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু এ সাধনা অতি কঠিন সাধনা,—ইহার মূলে সত্যের যে উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন, তাহা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্যমূলক ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে এই নৈতিক সত্য বা চরিত্রধর্ম্মের মূল্যও যেমন অল্প, তেমনই, যে প্রেম বলে—"It is really the errors of man that make him lovable"—সেই প্রেমের মোহ নাই বলিলেই হয়।

"To know all is to pardon all"—এই বাক্যে যে প্রকার জ্ঞানের ইঙ্গিত আছে, সেই জ্ঞানের কাছে সমাজনীতি বা চরিত্রনীতি ছোট হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্যনিষ্ঠার মধ্যে একটা অহংকার আছে, ব্যক্তির একটা স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান আছে; যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ, সে যেন সমাজের মধ্যেই দাঁড়াইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতে চায়, কারণ সকলেই তাহার মত সত্যনিষ্ঠ নয়, তাহা সে জানে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে সত্যকে বিশ্বের মধ্যে প্রসারিত করিয়া সকলকে তাহার অন্তর্গতরূপে দেখে বলিয়া, সকলের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে এমন একটা মহানিয়ম আবিষ্কার করে, যাহার জন্য কাহাকেও দায়ী করিতে

পারে না। এমন অবস্থায় 'মরালিটি'কে সে একটা সংস্কার বলিয়াই মনে করে; একেবারে নিষ্প্রয়োজন মনে না করিলেও, সে তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

যে অহং-সংস্কার মানুষের জীবধর্ম্ম, যাহার স্ফূর্ত্তি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন—আদিম সমাজের সত্যনিষ্ঠায় যাহা বীজরূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহাই সমাজ-জীবনের জটিলতর প্রভাবে একটা সজ্ঞান নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু আরও পূর্ব্ব হইতেই, ইহারই বশে মানুষের প্রাণে আর একটা বৃত্তি জাগিয়াছে, ইহারই নাম ভক্তি বা Faith। জগৎ বা জীবন-ব্যাপারের একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য মানুষকে প্রতি পদে অভিভূত করিয়াছে—আপনার অহং-সংস্কারের উপযোগী করিয়া মানুষ যাহাকে ধরিয়া থাকিতে চায়, বাহিরে চতুর্দ্দিকে তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ তাহাকে দিশাহারা করিয়া তোলে। প্রকৃতি যেন প্রতি পদে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে—যাহা তোমার জীবধর্ম্মের প্রয়োজন, তাহার অধিক জানিতে চাহিও না। প্রকৃতি-পরবশ মানুষ তাহাই স্বীকার করিয়াছে, নিজের অহং-সংস্কার একটা বৃহত্তর অহংকে সমর্পণ করিয়া দুই দিক রক্ষা করিয়াছে। এই পরাজয়মূলক জয়, এই যে আত্মরক্ষার জন্যই আত্মসমর্পণ, ইহারই নাম—Religion। এ প্রবৃত্তি অতিশয় আদিম ও অতিশয় প্রবল। যে নৈতিক সত্যনিষ্ঠার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে মানুষ আপনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে, এবং আপনার মত করিয়া একটা যুক্তিবিচারও খাড়া করে, এবং শেষ পর্য্যন্ত বিবেকের দোহাই দেয়। ইহার মধ্যেও প্রকৃতির প্ররোচনা আছে—কেবল, সে তাহা স্বীকার করে না—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান মানুষ এই অহংকে বিসর্জ্জন দিয়াই একটি অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এই Faith বা ভক্তির মূলে যাহাই থাক, ইহার বশে হৃদয়বৃত্তি জ্ঞানবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখে। সত্যনিষ্ঠার মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ আছে, তাহাতে সত্য-জিজ্ঞাসা না থাকিলেও একটা ব্যাবহারিক সত্যাসত্য-জ্ঞান আছে; ধর্ম্ম-বিশ্বাস অন্ধ, এখানে 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—অথবা গুরুর আদেশই অভ্রান্ত। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও বিবেক এক নয়—'হৃদিস্থিত হৃষীকেশ' বিবেকেরও উপরে। বিবেকের অন্তরালে যে অহং-জ্ঞান আছে, তাহাকে আবৃত করিয়া এই হৃষীকেশ আপনার আসন পাতিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষের ক্ষুদ্র-চেতনা বিশ্বচেতনার অঙ্গীভূত হইতে চাহিতেছে। মানসবৃত্তির অনুশীলনে মানুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করে, এই স্বাতন্ত্র্য-কল্পনায় বাহিরের সঙ্গে

অন্তরের যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানুষ আর একটা সত্তার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে—জানে না, এখানেও সেই প্রকৃতি-পারবশ্য; বাহিরে যাহাকে স্বীকার করে নাই, অন্তরে তাহারই শক্তি 'হৃষীকেশ'-রূপে তাহাকে জয় করিয়াছে, বুদ্ধি পরাভূত হইয়া একটা অজ্ঞান-চেতনার অপূর্ব্ব আবেশে ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের এক দিক—অতিশয় ব্যক্তিগত—নিঃসঙ্গ সাধকের অবস্থা। কিন্তু যাহাকে আমরা বহুব্যাপী সামাজিক ধর্ম্মবিশ্বাস বলি, তাহার মধ্যে এই অন্তরচেতনা তেমন পরিস্ফুট নয়; সেখানে অহংকার আরও স্পষ্ট—মানুষ গুরুর নামে নিজের অহংকারকে গোপনে তৃপ্ত করে। কারণ, জগতের যাঁহারা ধর্ম্মগুরু, তাঁহারা যে Idea বা তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহার মধ্যে একটা অতিশয় কঠিন আত্ম-প্রত্যয় আছে। তাঁহাদের এই আত্ম-বিশ্বাসের অপরিমিত শক্তিই শিষ্যবর্গকে জয় করিয়াছে; সেখানে তত্ত্বটাই বড় নয়, বড় তাঁহাদের সেই Personality, সেই Character। কেবল মাত্র Idea-র মূল্য খুব বেশি নয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা দার্শনিকের প্রতিপত্তি অনেক বেশি হইত। কিন্তু—"If both an Idea and a Character come together, they give rise to events which fill the world with amazement for thousands of years"। তাই এই সকল গুরুদের বাণী মানুষের মনে কোনও জিজ্ঞাসামূলক সত্যের প্রতিষ্ঠা করে নাই, মানুষকে অন্ধ-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান করিয়াছে মাত্র। বাণী অপেক্ষা গুরু বড় হইয়াছে, গুরুর পূজা বাণীতে বর্ত্তিয়াছে। যে বুদ্ধ সত্যকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন, যিনি বার বার উপদেশ দিয়াছিলেন, 'বুদ্ধ' কোন ব্যক্তি নয়, মানুষ মাত্রেরই সাধনার আদর্শ-স্বরূপ একটা Idea—সেই বুদ্ধই পরিশেষে শত সহস্র বিগ্রহরূপে পূজা পাইয়াছেন!

ইহাই মানুষের স্বভাব, ইহাই তাহার ধর্ম্ম। সত্য কি? এ জিজ্ঞাসা মানুষের প্রকৃতিগত নয়; মানুষের প্রকৃতি ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। সত্যের যে আদর্শ মানুষের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, তাহা কোনও তত্ত্বের ধার ধারে না। জীবধর্ম্মের দুইটা প্রয়োজন—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার; এই দুইটির স্বাভাবিক নিয়মে যে নীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তত্ত্ব-বিচারের অধীন নয়। মানুষ যাহা বিশ্বাস করে তাহাই সত্য। এই বিশ্বাস ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। মানুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার সূত্রপাত করিয়াছে, তাহা তাহার মনোবৃত্তির বিলাস মাত্র; এই বিলাসকেই যদি সে ধর্ম্ম

বলিয়া মনে করে, তবে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে মানুষের একটা স্থূল ঐক্যবুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ভিতরে ও বাহিরে একটা কিছুকে এক করিয়া লইতে চায়—এই একনিষ্ঠার মধ্যে যে সত্য-চেতনা, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার বশে আত্মসম্বরণ ও আত্মপ্রসার—এই দুই ধারায় মানুষের জীবন প্রবাহিত হইতেছে। Pontius Pilate যে প্রশ্ন করিয়াছিল—What is Truth? এবং উত্তরের অপেক্ষাও করে নাই—সেই Truth-এর সন্ধান মানুষের একটা মানসিক ব্যাধি মাত্র। মানুষ যে-সমস্যার সমাধান করিতে চায়, সে-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার জীবধর্ম্মের ব্যতিক্রমে; সেইজন্যই জীবনের আলো মৃত্যুর ছায়ায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব মানুষের পক্ষে যদি কোন সত্য-সমস্যা থাকে, তবে সে প্রকৃতির অনুযায়ী জীবনযাপনের সমস্যা। এই জীবনের আদি-অন্ত রহস্যময়। দূর হইতে এই রহস্য চিন্তা করিবার নয়—এই রহস্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া নিজেও রহস্যময় হইতে হইবে। সত্য এক নহে, বহু,—এ জন্য সকলই সত্য, এবং সকলই মিথ্যা। যেখানে জীবনের স্ফূর্ত্তি, সেইখানেই সত্য। এই স্ফূর্ত্তির কি কোনও নিয়ম আছে? এই বৈচিত্র্যকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিবে কে? এই ক্ষণ-সত্যের আদর্শ নির্ণয় করিবে কে? গতি ও প্রবাহই যাহার নিয়ম, মৃত্যুময় জীবনপ্রাচুর্য্যই যাহার ধর্ম্ম—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, স্বপ্ন-জাগরণ, স্মৃতি বা বিস্মৃতি যাহার অঙ্গে এতটুকু চিহ্ন রাখে না, তাহার আবার সত্য কি? কোন্ মাপকাঠিতে তাহাকে মাপিবে? ইহার অর্থ করিতে গেলেই—প্রহেলিকা; তত্ত্ব সন্ধান করিলেই—শূন্যবাদ। তাই যাহারা জীবনধর্ম্ম পালন করে, কোনরূপ সত্যজিজ্ঞাসার মতিভ্রমে যাহারা পড়ে নাই, তাহারাই সত্য পালন করিয়াছে, অজ্ঞানে জ্ঞানীর কাজ করিয়াছে।

সত্য কি,—প্রাণকে জিজ্ঞাসা কর, বুঝিতে পারিবে। নিজের মধ্যে যে শক্তি যেটুকু আছে, সেই শক্তিটুকুই সত্য; তাহার প্রেরণায় যে জীবধর্ম্ম তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহাই সত্য। যে-সংস্কার তোমার প্রাণে বদ্ধমূল, তাহাই তোমার স্বধর্ম্ম; আবার যে সংস্কার তোমার প্রাণকে বিচলিত করে, বিদ্রোহী করিয়া তোলে, তাহাই তোমার বিধর্ম্ম। কল্পনাবিলাস বা তত্ত্বহিসাবে যাহা তোমার প্রেয়, তাহাই সত্য নয়; কারণ, তোমার নিজ-চেতনার বাহিরে, কেবলমাত্র চিন্তাহিসাবে, কোনও সত্য নাই; আবার, যাহা তোমার জীবচেষ্টাকে অলস করিয়া দদ্রু-কণ্ডূয়নের মত সুখসাধন করে, তাহাও সত্য নয়; কারণ তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

যাহা তুমি বিশ্বাস কর তাহাই সত্য। সূক্ষ্ম তত্ত্ব, উৎকৃষ্ট যুক্তি বা উদার ভাব—সূক্ষ্ম উৎকৃষ্ট বা উদার বলিয়াই সত্য নয়: যদি প্রাণে সাড়া না পায়, যদি বিশ্বাস উৎপাদন না করে, তবে তাহাও তোমার পক্ষে মিথ্যা। এই বিশ্বাস অর্থে মনের সম্মতি নয়, ভাব-বিভোরতাও নয়—প্রাণের মধ্যে শক্তিসঞ্চার। এই বিশ্বাসের প্রমাণ—নিষ্ঠা, অভয় ও একাগ্রতা; নিদ্রালস সুখস্বপ্ন নয়, প্রলাপোক্তি নয়, শক্তিক্ষয়ের সুখলাম্পট্যও নয়। তুমি যাহা বিশ্বাস কর তাহাই সত্য, কারণ তাহাই তোমার স্বধর্ম। জীবনের স্বাস্থ্যই সত্যের একমাত্র প্রমাণ, সত্যের সত্যহিসাবে আর কোনও মূল্য বা অর্থ নাই।

তাই মানুষ যখন আপনার সেই প্রাণকে আবৃত করিয়া পরের অনুকরণে আপনাকে সজ্জিত করে, সত্যকে একটা বহির্গত আদর্শ মনে করিয়া এবং আপনা হইতে তাহাকে অতিশয় উচ্চ দেখিয়াই, তাহার রঙে নিজেকে রঙিন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে—বিদ্রোহী-বীর বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায়, অথবা বহুজনপূজিত কোনও ব্যক্তির সাদৃশ্যলাভের আশায়, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সেই মিথ্যার পীড়নে তাহার আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে। সারা জীবন একটা অভিনয়ের ভূমিকা রক্ষা করিতে গিয়া সে একটা প্রাণহীন যন্ত্র হইয়া উঠে; বাহিরের প্রতিষ্ঠাই তাহার একমাত্র সম্বল বলিয়া, সে অন্তরে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। স্বধর্ম্মের মূল—আত্মস্ফূর্ত্তি; তাহার ফল—বিশ্বাস, ও লক্ষণ—নির্ভীকতা; পরধর্ম্মের মূল—আত্মসঙ্কোচ বা কুণ্ঠা; তাহার ফল—আত্মপ্রবঞ্চনা, লক্ষণ—ভয়। সত্যকে যাহারা তত্ত্ব, শাস্ত্রবিধি বা স্বানুষ্ঠিত পরধর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধি করিতে চায়, নিজের প্রাণকে প্রামাণ্য না করিয়া কেবল মনেরই মনরক্ষা করে, জগতে তাহার মত ভাগ্যহত আর কে আছে?

জগৎ ও জীবনকে মানুষ আপনার প্রাণের মধ্যে আপনার মত করিয়া গ্রহণ করে, তাই জগৎসম্বন্ধে সকলের মনে একটা সাধারণ ধারণা থাকিলেও, প্রত্যেকের জগৎ স্বতন্ত্র। মন এই প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া জগৎকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ একটা সত্তারূপে ভাবনা করে, তাই দর্শনের সত্য অদর্শন হইয়া উঠে। বিজ্ঞান জড়ের রহস্য সন্ধান করিতে চায়, সেও মনের ক্ষুধা—প্রাণের নয়। দুঃশাসন মন প্রকৃতি-দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে চায়,—সে বসন যতই পর্দ্দায় পর্দ্দায় বিচিত্র ও রাশীকৃত হইয়া উঠে, ততই তাহার লালসা বাড়ে; শেষে সে আপনাকেও ভুলিয়া যায়, যাদুকরীর যাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া ভূতগ্রস্তের মত বিচরণ করে।

সত্যকে সেও পায় না, হয়তো শেষে আর চায়ও না—অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ কতকগুলি তত্ত্ব, জড়শক্তির কতকগুলি ব্যাবহারিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়া, তাহা হইতেই এমন একটা সিদ্ধান্ত করে, যাহাতে সংশয়ই সত্য হইয়া উঠে; মন প্রথম হইতে যে সত্যের সন্ধান করিয়াছিল, সে সত্যের আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন খুলিতে গিয়া সে এমন একটা যন্ত্রের আভাস পায় যে, গণিতশাস্ত্রই তাহার বেদ হইয়া উঠে। বিজ্ঞান যে-রহস্যের সমাধান করিতে পারে নাই, তাহার রসটুকু বাহির করিয়া দিয়াছে; যন্ত্রের জড়ধর্ম্মই মানুষের জীবন-ধর্ম্মের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মানুষের প্রাণ এখনও মরে নাই, এবং সম্ভবতঃ কখনও একেবারে মরিবে না, তাই সত্যকে সে আর এক দিক দিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকে। এই অসীম বৈচিত্র্য ও বিরোধকে সে প্রাণের দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া এক আশ্চর্য্য উপায়ে তাহার মধ্যে একটি ঐক্যরস উপভোগ করে, প্রেমের দ্বারা সে সকল জিজ্ঞাসা ও সকল সংশয় দূর করে; আদি-অন্তের ভাবনা না করিয়া একটি আশ্চর্য্য প্রাণশক্তির বলে সে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতিকে যেন একটি গানের সুরে বাঁধিয়া লয়। দর্শন যে প্রশ্ন সমাধান করিতে গিয়া শেষে তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে, বিজ্ঞান যে দুঃখ দূর করিবার আড়ম্বর মাত্র করে—ফলে আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া তোলে, সেই দুঃখকে স্বীকার করিয়াই, এই প্রেম তাহাকে নিরস্ত করে। ইহার কারণ কি? প্রেম কোনও সত্যের অধিকারী হইতে চায় না, জগৎ ও জীবনের কোনও অর্থ করিতে চায় না—আপনাকে তাহার নিকটে সমর্পণ করে, বিলাইয়া দেয়। যাহার প্রাণশক্তি যত বেশি, অর্থাৎ যত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে এই জগৎ-সমুদ্রে স্নান করিয়া সাঁতার দিয়া—ইহার তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়াই তত আনন্দ পায়। যে-মানুষের প্রাণে এই আনন্দ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে, তাহার প্রাণে সৃষ্টির বেদনা সঙ্গীতরূপে উৎসারিত হয়, ব্যক্তির সুখ-দুঃখ নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠে। এই ব্যক্তির নাম—কবি। ইনি এই আনন্দের সত্যকে রূপ দেন; কিছু বলেন না, কিছু বুঝান না—প্রাণে-প্রাণে জানাজানি কানাকানি হয়; যে-সত্য জগৎসৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে, মানুষের প্রাণের মধ্যেই সেই রহস্য রসময় হইয়া উঠে। এই রসানুভূতিই সত্যানুভূতি। সত্যের আর কোনও পরিচয় নাই, আর কোনও রূপে তাহাকে জানিবার উপায় নাই।

পৌষ, ১৩৪৫

কাব্য ও জীবন

আধুনিক কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে কাব্য-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে বহু মনীষী কাব্যসম্বন্ধে যে সকল উপাদেয় তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করিতেছেন, সে সকলের মধ্যে একটা কথা বিশেষভাবে সকলকেই আলোচনা করিতে দেখি। সে কথা এই যে, সকল উৎকৃষ্ট কাব্য জীবনেরই সত্য ও সুন্দরতম প্রতিরূপ—জীবন-দীপিকা। কাব্য কল্পনামাত্র নয়; জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে যে সত্য-সুন্দরের প্রতিবিম্ব শত-খণ্ড দর্পণে ভগ্ন ও অসংলগ্ন ভাবে বিকীর্ণ হইয়া আছে—অতি চঞ্চল উর্ম্মি-বন্ধুর নদীবক্ষে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় যাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিতেছে না, তাহারি একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি কবি-কল্পনায় ধরা পড়ে; কবি-প্রতিভাই সেই প্রজ্ঞা, যাহার বলে সৃষ্টির এই অশান্ত লীলার—এই দিক্‌ভ্রান্তকারিণী কামরূপা প্রকৃতির কটাক্ষ-ঈক্ষণের অন্তরালে, ক্ষণিকের জন্য একটা গভীরতর অর্থ প্রকাশ পায়, জীবন ও জগতের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এজন্য ম্যাথু আর্ণল্‌ড্‌ কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—Criticism of Life; কিন্তু এই বাক্যের সুগভীর তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় আজও পর্য্যন্ত এ-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের অবসান হয় নাই। এজন্য ম্যাথু আর্ণল্‌ড্‌কে দায়ী করা যায় না; নানা উদাহরণ-সহযোগে তিনি নিজেই এই বাক্যের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে criticism কথাটির আভিধানিক অর্থ ধরিয়া আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই। সকল কবি-সৃষ্টির মধ্যে একটা implicit criticism যে থাকে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এবং জীবনের criticism বলিতে যাহা বুঝায়, কবির সৃষ্টিধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই। হোমার, শেক্‌স্‌পীয়ার, গেটে প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য যে কারণে উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা হয়—তাহাকে criticism of life বলিয়া অভিহিত করিলে, এই বাক্যের অর্থসম্বন্ধে কোনওরূপ গোলযোগ হইতে পারে না। মানুষ আপনার কল্পনাবলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক, তাহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক, তার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে, তাহা হইলে এমন

একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয়, যাহার জন্য মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে ; সে কাব্য সত্যকার বেদনা, আশ্বাস ও সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। আবার, ঐ 'criticism of life' কথাটার তাৎপর্য্য এই নয় যে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান, সেই ব্যাবহারিক বাস্তব জীবনকেই কাব্যে যথাযথ চিত্রিত করিতে হইবে। কারণ, ম্যাথু আর্ণল্ড্ একথাও বলিয়াছেন যে, 'কাব্যে যেমন 'truth of substance' থাকা চাই, তেমনই 'high poetic seriousness' না থাকিলে তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে না।' যথাদৃষ্ট জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতামূলক কতকগুলি Idea থাকিলেই কাব্য হইবে না, জীবনের গভীরতম সত্য কবির গভীরতম চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়া চাই। "The high seriousness which comes from absolute sincerity"—এই যে কথাটি ম্যাথু আর্ণল্ড্ অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন ইহার সম্যক অর্থ করিলে, তাঁহার criticism of life কথাটির সম্বন্ধে আপত্তির কারণ থাকিবে না।

যে-কল্পনায় বাস্তব জীবনসম্বন্ধে কোনও গভীর বেদনার অনুভূতি নাই, যাহা—সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় জীবনের যতটুকু ভোগ করিতে পারে তাহা হইতেই—নানা রসরূপের সৃষ্টি করে, তাহা যে মিথ্যা, এমন কথা ম্যাথু আর্ণল্ড্ বলেন নাই। কিন্তু সেরূপ কাব্যে জীবনসম্বন্ধে absolute sincerity নাই, এজন্য high seriousness-ও নাই। যাহা কবির নিজস্ব খেয়াল-কল্পনার ফল, তাহাতে 'truth of substance' নাই বলিয়া তাহা ভাগবতী সৃষ্টির রহস্যে অনুপ্রাণিত নয়—তাহাতে sincerity নাই, 'adequate poetic criticism of life' নাই। এই প্রসঙ্গে এই কথাও তিনি বলিয়াছেন—

"For supreme poetical success more is required than the powerful application of ideas to life, it must be an application under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty."

অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কবি কাব্যরচনা কালে সজ্ঞানে এমন একটা নিয়মপালনের সংকল্প করিয়া বসেন না—কাব্যসৃষ্টির মধ্যেই কবি-প্রতিভার এই গূঢ় প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে ম্যাথু আর্ণল্ড্ শেলীর মত কবির সম্বন্ধেও এমন কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—"that beautiful spirit building his many-coloured haze of words and images"—"pinnacled dim in the intense inane."

অবশ্য শেলীর কাব্যসম্বন্ধে ম্যাথু আর্ণল্ডের এই মত কতখানি কি অর্থে যুক্তি-সঙ্গত, মূল কাব্য-জিজ্ঞাসার পক্ষ হইতে সে বিচারের প্রয়োজন আছে ; এবং ইহাও সত্য যে, কাব্যে যদি কোনও হিসাবে criticism of life না থাকে, তবে তাহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে না। কিন্তু সে বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

ম্যাথু আর্ণল্ড্-নির্দ্দিষ্ট এই sincerity কথাটির অর্থ কি? তিনি প্রমাণস্বরূপ যে সকল কাব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই হিসাবে যে সকল কাব্য অপকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই কথার একটা স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। জীবন ও জগৎব্যাপারে যে কবির হৃদয় সাড়া দেয় নাই, যিনি এই সৃষ্টির রহস্যকে উপেক্ষা করিয়া জাগ্রত প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া, আত্মরতির মোহবিকারে স্বপ্ন-প্রলাপ রচনা করেন, তাঁহার কাব্যে সত্যকার অনুভূতি নাই; তিনি মিথ্যারই মায়াজাল রচনা করেন। জীবনের চেয়ে সত্যকার কিছু নাই—কবিধর্ম্মও জীবনধর্ম্ম। প্রকৃতির নেপথ্য-গৃহে যাঁহার দৃষ্টি প্রবেশ করে নাই, যিনি এই জীবনযজ্ঞের হোতারূপে আপনাকে আহুতি করিয়া, সেই জল-স্থল-আকাশ-বিসর্পী বিশ্বপ্রাণ অগ্নির হবিঃশেষ পান করিয়া দিব্যানুভূতি লাভ করেন নাই, তাঁহার কাব্যে যেমন 'truth of substance' নাই, তেমনই sincerity-ও নাই ; কারণ, তাহা ভাববিলাস, কল্পনাবিলাস, সূক্ষ্ম চিন্তারসবিলাস মাত্র ; তাহার মধ্যে সেই দিব্যশক্তি নাই যাহার বলে, কবিই—বহির্জগৎ ও অন্তরের অহং—এই উভয়ের দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারেন; যাহাতে subject ও object-এর মধ্যে এক অপূর্ব্ব উপায়ে সেতু-যোজনা হয় ; এবং কাব্যসৃষ্টির কতটুকু subjective ও কতটুকু objective—এ প্রশ্নের সমাধানে Psychology-র মূঢ়তা প্রকাশ পায়। কাব্যে আমরা সেই অহং-অনুবিদ্ধ অথচ অহং-নিরপেক্ষ চিরবিস্ময়কর সত্তাকে একটি অপূর্ব্ব অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করি ; এজন্য কাব্যই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-যোগ। যে-কবির কল্পনা এই সৃষ্টিরহস্যেরই অনুগত নয়, যাঁহার বাঁশীর রন্ধ্রগুলি এই জগজ্জীবন প্রশ্বাসবায়ুতে পূর্ণ নয়, যিনি এই রহস্যের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া "make me thy lyre"—মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন নাই, তাঁহার কাব্যসৃষ্টি সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতই ক্ষণ-স্বপ্নের ইন্দ্রজাল ; চিরন্তন হরিত-নীলিমার অমৃতরসে সিঞ্চিত নয়।

আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্বে যে-ধরণের কাব্যবিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাকে Metaphysic of Aesthetic Sentiment বলা যাইতে পারে।

কাব্যবস্তুকে প্রাধান্য না দিয়া কাব্যের বহিরঙ্গটাকেই মুখ্য স্থির করিয়া কাব্যের যে স্বাদ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাতে ভারতীয় মনীষার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু সেই বিচারের মধ্যে মধ্যযুগের Scholasticism—বিষয়-নিরপেক্ষ যুক্তি-প্রবণতাই—সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের শাঁস-খোসা বাদ দিয়া তাহার দেহগত details-কে কতকগুলি সাধারণ সূত্রে বাঁধিয়া আলঙ্কারিকগণ কাব্যের আত্মার সন্ধান করিয়াছিলেন। এ বিচার কাব্য অপেক্ষা Aesthetics-এর অধিকতর উপযোগী। কারণ, classification বা generalisation কাব্য-জিজ্ঞাসার পক্ষে কতটুকু আবশ্যক তাহা, আধুনিক কাব্যসাহিত্যের রস যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন। এই প্রাচীন কাব্য-বিচারে কবি-মানসের পরিচয় নাই—যে-সৃষ্টিশক্তি বা Imagination আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান বিচার্য্য বিষয়, আলঙ্কারিকগণ কুত্রাপি তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করেন নাই। কাব্যের সকল উপাদান ও উপকরণকে একটি নির্ব্বিশেষ রসতত্ত্বের অধীন করিয়া লইলে, একটা philosophy of art দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তাহা যথার্থ কাব্য-জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য সাধন করে না। 'কাব্য শুধুই একটা mode of art নয়, 'a mode of higher interpretation'-ও বটে।' জগতের প্রাচীনতম উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে আধুনিক শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির সম্বন্ধে একথা খাটে। কবির কাব্যনির্ম্মাণে যে সৃষ্টিপ্রেরণা আছে রসসৃষ্টিই তাহার সজ্ঞান উদ্দেশ্য নয়। তবে এ প্রেরণা আসে কোথা হইতে? এবং সে প্রেরণার sincerity কোথায়? এই জীবন ও জগতের সঙ্গে কবিহৃদয়ের যে নানারূপ স্পর্শ ঘটে তাহাতেই কাব্যসৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই স্পর্শহেতু যে গভীর ও বিচিত্র বেদনা, যে আকুল রহস্য-বিস্ময় কবিকে অভিভূত করে, তাহাতেই কবিচিত্তে সৃষ্টিপ্রেরণা জাগে; কারণ, বাস্তবের যে নিগূঢ় স্বরূপ তখন কবিকল্পনায় প্রকাশিত হয় সেই রূপটিকে ধরিবার বা রূপ দিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা এত সহজ ও এত প্রবল যে, তার জন্য কোনও সজ্ঞান উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় না। এই যে সৃষ্টি—ইহা প্রত্যেক কবির নিজস্ব; ইহা এতই স্বতন্ত্র, ইহার রূপ ও ভঙ্গি এতই বিচিত্র যে, ইহাকে কতকগুলি বাঁধা-ধরা emotion-এর মার্কা দিয়া classify করিলেই জিজ্ঞাসার শেষ হয় না। যে-কোনও কাব্য বিশ্লেষণ করিলে যে একই রসতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু কাব্যবিচারে কাব্যের সেই বৈচিত্র্য, কাব্যবস্তু ও তাহার রূপভঙ্গির অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিয়া দিলে কাব্যের কাব্যত্বই

থাকে না। প্রত্যেক কাব্যের এই যে বৈশিষ্ট্য, ইহার কারণ কি? জীবন বা কাব্যবস্তুর অসীম বৈচিত্র্য এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক কবির কবিমানসের স্বাতন্ত্র্যই এই বৈশিষ্ট্যের কারণ। শেকস্‌পীয়ার, মিল্টন, ব্রাউনিং এই তিন কবির কবিমানস যেমন স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কাব্যও সেইরূপ স্বতন্ত্র ; আবার, একই কবির বিভিন্ন কাব্যও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিচিত্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিচিত্রভাবের এই যে সম্মিলন, এবং তাহার ফলে প্রত্যেক কাব্য যে অভিনব সৃষ্টিসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতেছে, যুগে যুগে যে নব নব রূপ পরিগ্রহণ করিতেছে, এমন কি রসিকের রসবোধেও যে স্বাদবৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহারই রহস্য-সন্ধান আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়।

কাব্যরস-উপভোগের মধ্যে জগৎ ও জীবনসংক্রান্ত বস্তুবিশেষের emotion সর্ব্বত্র প্রবল। রসবাদীদের মতে তাহা যদি নিম্নাধিকারীর কথা হয়, তথাপি বলিব—কাব্যরস-আস্বাদনে এই বস্তুবিশেষের চেতনা Universal-এর অনুভূতির মধ্যেও জাগ্রত থাকে, এবং থাকে বলিয়াই একটি অপূর্ব্ব সংবেদনার সঞ্চার হয়। যাহা particular তাহা particular থাকিয়াই একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা করে বলিয়াই কাব্যরস অনির্ব্বচনীয়। কাব্যবস্তুর সম্পর্কে কাব্যরসের বিচারে একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

"It will be a part of our theory that poetry with varying intensity reveals to us a world which answers to the gravest and deepest requirements of the mind, a world ideal in its harmony and its permanence, in its security and, above all, in its significance, but neverthless a world real in its substance. That is to say, we must raise our speculation of this art until we can see every poem as the capture and preservation of some perfection of experience."

ম্যাথু আর্ণল্ড্ যাহাকে 'poetic truth of substance' বলিয়াছিলেন, এখানে তাহাকেই 'perfection of experience' বলা হইয়াছে। ইহাই কবির অপূর্ব্ব imagination-এর ফল, ইহারই নাম—খণ্ড, অস্পষ্ট ক্ষুদ্র বাস্তবকে পূর্ণ ও অখণ্ড করিয়া তোলা। ইহাই ম্যাথু আর্ণল্ডের কথায়—"powerful poetic application of ideas to life", অথবা "এ criticism of life under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty"। এই জন্য সত্যকার কবিসৃষ্টি যেমন জীবন ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবাস্তবের সাধনা

করে না, তেমনই জীবনের মর্ম্মগত রহস্য—বাস্তবের গভীরতর reality-কে—প্রকাশিত করাই শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম্ম। জীবনের সহিত কাব্যের এই সম্বন্ধ—কবি-প্রতিভার এই সত্যকার সৃষ্টিধর্ম্ম—কাব্যবিচারে সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। এই অর্থেই অপর একজন রসবিদ্ কাব্যসমালোচক বলিয়াছেন—

"If the technical art of poetry consists in making patterns out of languages, the substantial and vital function of poetry will be analogous ; it will be to make patterns out of life"—"The poetry of each age must re-interpret and re-incarnate life anew."

আমাদের দেশীয় কাব্যবিচারে রসের উচ্চতত্ত্বের সন্ধান থাকিলেও কাব্যের এই "substantial and vital function"-এর দিকটা উপেক্ষিত হইয়াছে। এজন্য Modern Study of Literature বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পক্ষে এই ধরণের কাব্যজিজ্ঞাসা অনেকটা নিষ্ফল হইয়াছে। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী—কাব্যের রসপরিণাম-প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য এই সকল ভাবের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু Scholasticism-এর প্রভাবে এগুলিকে (চিন্তাপ্রণালীর পথে) পশ্চাতে ফেলিয়া, আমাদের আলঙ্কারিকেরা একটি তত্ত্বের উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি মহাকবি ও মহামনীষী গেটের কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব।

"In aesthetics it is hardly correct to speak of the Idea of the Beautiful, for by so doing we dissover the Beautiful which after all cannot be conceived as being detached."

"It matters a great deal whether the poet is seeking the particular for the universal or seeing the universal in the particular. The latter is the nature of poetry. It gives expression to the particular without in any way thinking of or referring to the universal. And he, who vividly grasps the particular will at the same time also grasp the universal, and will either not become aware of it at all, or will only do so long afterwards."

—শেষের কথাটিতে পূর্ব্বে যে কবিদৃষ্টির কথা বলিয়াছি, যাহার বলে খণ্ড, ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্নের মধ্যেই অসীমের আভাস ফুটিয়া উঠে—বাস্তব experience perfect হইয়া দাঁড়ায়—তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই particular-কে উচিত মর্য্যাদা দেন নাই—দিলে, তাঁহারা যাহাকে সঞ্চারী ভাব বলিয়াছেন, রসবিচারে তাহাকেই মুখ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এ সম্বন্ধে গেটের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। গেটে বলিতেছেন—

"In a work of art, the question *what* interests a man far more than the *how*; hence comes the practice of laying stress upon particular parts, in which, if we pay particular attention we shall ultimately find that effect of totality is not wanting, even though it remained unnoticed by every one."

আলঙ্কারিকের কাব্যজিজ্ঞাসায় এই how-টাই বড় হইয়াছে, what-কে তাঁহারা আমল দেন নাই;—এজন্য কাব্যবিচারে, সকল রসগ্রাহী পাঠকের পক্ষে যে প্রশ্ন সহজ ও স্বাভাবিক, কবিকর্ম্মের সকল সৌন্দর্য্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—তাহার সমাধান বা বিশ্লেষণ নাই; জীবনসমুদ্রের ছায়ালোক-বিচিত্র উর্ম্মিমালায় যে ক্ষণ-সৌন্দর্য্য কাব্যের ভিতর দিয়া চিরন্তনের ইঙ্গিতরূপে রসিকচিত্ত আকুল করিয়া তোলে, কবি-প্রতিভার সেই সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্বের কথা ইহাতে নাই।

কেন নাই? এ প্রশ্নের বোধ হয় উত্তর আছে। অন্ততঃ আমাদের সাহিত্যে কাব্যের এই substantial ও vital function-এর স্পষ্ট লক্ষণ না থাকার একটা কারণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ নয়। কিন্তু তার পূর্ব্বে সাহিত্যসম্বন্ধে একটা কথা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য ইতিহাসের মত সাহিত্যের ইতিহাসেও Mediaevalism বলিয়া একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। শেকসপীয়ারের Hamlet বা গেটের Faust-কাব্যের সম্বন্ধে একটা কথা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ঐ দুই কাব্যে মানব-মনের modern রূপটি বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্যের এই modern ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলে, যে একটি প্রধান লক্ষণ ধরা পড়ে তাহার অভাবাত্মক ধারণাই mediaevalism। য়ুরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মানুষের ভাবরাজ্যে যে যুগান্তর সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Renaissance,—একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—"Discovery by mankind of himself and of the world"। ইহার পর হইতেই য়ুরোপের সর্ব্ববিদ্যা-বার্ত্তাবিধি—Modern বলিতে যাহা বুঝায়—তাহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া

উঠিল। গ্রীক সাহিত্যকলা ও দর্শনের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ে মানুষ জগৎ ও জীবনকে আর এক চক্ষে দেখিতে লাগিল।

"Human life which the mediaeval church had taught them to regard but as a threshold and stepping-stone to eternity, acquired suddenly a new momentousness and value: the promises of the church paled like its lamps at sunrise, and a new paganism ran like wild-fire through Italy."

—এই যুগান্তরের পূর্ব্বে সকল বিষয়ে seriousness হয়তো ছিল, কিন্তু Scholasticism-এর চাপে জীবনের স্ফূর্তি কুত্রাপি ছিল না। আমাদের দেশেও এইকালে, সাহিত্যরচনায় যেমন, তেমনি তাহার আদর্শবিচারে, জীবনের গভীরতম অনুভূতির স্থান বড় বেশি ছিল না। সেকালে কাব্যসৃষ্টিতে সত্যকার imagination বা 'perfection of experience'-এর প্রয়োজন হয় নাই; জীবনকে কতকটা আড়ালে রাখিয়া বাস্তব-মুক্তির সাধনাই ছিল রসচর্চ্চার নিপুণতম কৌশল। আমাদের দেশে, এ-যুগে একদিক দিয়া কাব্যের একটা বৃহত্তর মূল্য ছিল—"it was a means of escape from the ills of life"। কিন্তু এই artistic monasticism-এর দ্বারা যে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন নয়—এ অবস্থা বেশিক্ষণ টিকে না; তাই জার্ম্মান দার্শনিক Schopenhauer খাঁটি Asceticism-এর পক্ষপাতী। তাঁহার মতে—"The Hindu Sannyasin shows the way"। জীবন ও জগতের সম্বন্ধে যে মনোভাবের ফলে ভারতীয় কাব্যবিচারে রস-বাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই, imagination-এর পরিবর্ত্তে fancy, এবং স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে conceit কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। কাব্যরচনার জন্য কবিগণ যেন একটু সাজসজ্জা করিয়া বসিতেন—মানস-চক্ষে বাস্তব-বিস্মৃতির অঞ্জন পরিয়া লইতেন। যে personality ও ব্যক্তিগত জীবনের গভীরতম experience-এর বাস্তব পরিচয় আমরা সকল উৎকৃষ্ট কাব্যে পাই বলিয়া একটি সুগভীর আনন্দ-বেদনায় মুগ্ধ হই, এবং কবির সেই ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির সাহায্যেই পাঠকের মনেও একটি সুগভীর আত্মপরিচয়ের আশ্বাস জাগে, সে রস এ সাহিত্যে বিরল।

এই বাস্তব-চেতনা বলিতে আমি কি বুঝি এবং বুঝাইতে চাই, তাহা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাস হইতে এক উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পঞ্চদশ

শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফরাসী দেশে একজন কবির উদয় হইয়াছিল, ইহার নাম Francois Villon—এ নাম বোধ হয় অনেকেরই পরিচিত। একজন সাহিত্য-সমালোচক Villon-র সম্বন্ধে বলেন—

"He is the first poet in France and the greatest rogue in the history of Literature."

ইহার পরেই বলিতেছেন—

"With the advent of Villon mediaevalism breathed its last, and with the death of mediaevalism was born the modern poetry of France."

এমন কথা বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর—

"The two hundred verses of the Grand Testament present for the first time in the literature of France, a distinct and striking personality, a personality distinct because he is alone a being of real flesh and blood, among a crowd of shadows.

"It is from the contemplation of his own experience that the poet speaks...he looked in his heart and wrote, and his life is the theme of his writing."

সমালোচক আরও বলেন যে, Villon-র কাব্যে মৃত্যুসম্বন্ধে যে গভীর বাস্তব-অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য—Villon-র কবি-যশ ইহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

"In death he can see nothing but the horrors of dissolution. In brighter moments he may seek to console himself by a kind of philosophy, that all beauty must perish, that life is but fleeting, and so on; but even while he speaks his teeth are chattering, and there rise up before his eyes the creaking gibbets of Montfaucon with his own place prepared and ready, and he hears the hollow croaks of the magpies rising upon the night air." (Villon নিজের জীবনে বহুবার গুরুতর দুষ্কৃতির জন্য কারাবাস এবং একাধিকবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন)।

উপরিউক্ত উদাহরণের দ্বারা আমি কাব্যের আদর্শ নির্ণয় করিতেছি না—Villon-র কাব্যই যে আদর্শ কাব্য, এমন কথা বলিতেছি না। আমার

প্রধান বক্তব্য এই যে, গভীরতম বাস্তবানুভূতি বা সত্যকার হৃদ্‌স্পন্দনের উপরেই কাব্যপ্রেরণা নির্ভর করে। এই Villon-র কাব্যসম্বন্ধে ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলে, এ বিষয়ে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন হইবে না। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ লিখিয়াছেন—

"A voice from the slums of Paris, fifty or sixty years after Chaucer, the voice of poor Villon out of his life of riot and crime, has at its happy moments more of this important poetic virtue of seriousness than all the production of Chaucer. But its apparition in Villon, and in men like Villon, is fitful: the greatness of the great poets, the power of their criticism of life, is that their virtue is sustained."

এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলি, Hamlet ও Faust-কাব্যে এই experience, এই truth of substance, এই criticism of life,—'high and excellent seriousness' দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে; তাই সে কাব্যের মূল্য এত বেশী। এই perfection of experience-ই কাব্যের প্রাণ; ইহাকেই ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ criticism of life বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী সমালোচকেরা এ বাক্যের ভিন্ন অর্থ করিয়া নানা বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই criticism of life—epic, drama বা narrative কবিতায় concrete কাব্যনির্ম্মাণেই যে প্রকাশ পাইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না; উৎকৃষ্ট 'লিরিক' কবিতায় ভিন্ন ভঙ্গীতে ইহার প্রকাশ দেখা যায়—Villon-র কবিতাও 'লিরিক'। আবার, শুধু ভাবে বা রূপে নয়, ভাবনামূলক কবিতার মধ্যেও উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ থাকিতে পারে। যাঁহারা কবিতাপাঠকালে ভাবলেশহীন রসাস্বাদের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মনে হয়ত এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা কবিতাই নয়—কিন্তু এ সকল কবিতার ভাবনাও যে ভাবহীন নয়, ছন্দ ও স্বরের সহিত বাক্যযোজনার আবেগেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি কালিদাসের একটি নিছক কবিতা ও তাহারই সঙ্গে সুইনবার্ণের কয়েকটি ভাবনা-প্রধান শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিব; ইহার কোন্‌টি কাব্যহিসাবে কতখানি সার্থক হইয়াছে, পাঠক সে বিচার করিবেন। কালিদাসের শ্লোকটি এই—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।

উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

(মেঘদূতের বিরহী যক্ষ প্রিয়ার উদ্দেশে বলিতেছেন—"হে চণ্ডি, আমি শ্যামালতায় তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব, চকিত হরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টি, চন্দ্রে তোমার মুখকান্তি, শিখিপুচ্ছে তোমার কেশরাশি, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাস দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু হায়! কোনও একটির মধ্যে তোমার সমগ্র রূপসাদৃশ্য নাই।")

স্বইনবার্ণের কাব্যের কয়েকটি লাইন এইরূপ—

"Love that for very life shall not be sold,
Nor bought nor bound with iron nor with gold ;
So strong that heaven, could love bid heaven farewell,
Would turn to fruitless and unflowering hell ;
So sweet that hell, to hell could love be given,
Would turn to splendid and sonorous heaven ;
Love that is fire within thee and light above,
And lives by grace of nothing but of love ;
Through many and lovely thoughts and much desire,
Led these twain to the life of tears and fire ;
Through many and lovely days and much delight
Led these twain to the lifeless life of night."

এই দুইটি কবিতার কাব্যবস্তু স্বতন্ত্র হইলেও—একটি যেমন প্রিয়া-বিরহিত প্রেমিকের একখানি ভাবচিত্র, অপরটি তেমনই প্রেমসম্বন্ধে কবির অতিশয় আবেগমূলক ভাবনার উৎসার। তথাপি স্বইনবার্ণের কবিতায় মানবজীবনের একটি মুখ্য experience-কে যে ভাবনার দ্বারা মণ্ডিত করা হইয়াছে, সেই ভাবনার মূলে এমন একটি দিব্যানুভূতির আবেগ ভাষায়, ছন্দে ও স্বরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাতে জীবনরস-রসিকের চিত্তেও সাড়া জাগে; অর্থাৎ এই ভাবনা অতিমাত্রায় ভাবতান্ত্রিক হইলেও ইহাতে sincerity ও seriousness আছে। অপর পক্ষে, কালিদাসের কবিতাটিতে বিশুদ্ধ কল্পনাবিলাসই আছে, বাস্তবের নামগন্ধও নাই—এরূপ প্রেমোন্মাদ যদি সত্যকার জীবনে ঘটে, তবে তাহা কাব্যের বিষয় না হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীন হওয়াই উচিত; কিন্তু বাস্তবের নামগন্ধ নাই বলিয়াই রসবাদী আলঙ্কারিকের মতে ইহাই একটি উৎকৃষ্ট রস-রচনা।

আধুনিক কালের কাব্যে এই জীবনের অনুভূতি গভীরতর হইয়া উঠিলেও, সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিতেই, criticism of life, বা higher interpretation of life আছে। কেবল, যখনই কোনও জাতির মধ্যে জীবন-ধর্ম্ম—যে-কোন কারণেই হোক—ক্ষীণ হইয়া আসে, অথবা মানসবৃত্তির অতিরিক্ত প্রাধান্য ঘটে, তখনই সেই জাতির কাব্যে sincerity ও seriousness-এর অভাব হয়। কবিকল্পনা, হয় কেন্দ্রাতিগ ভাব-মার্গে স্বপ্ন-প্রয়াণ করে; নয় প্রাণহীন পঙ্কবিলাসে অধঃপতিত হয়। মধ্যযুগের পারলৌকিকতা ও বৈরাগ্যের অন্ধকার হইতে য়ুরোপ বহুদিন মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই জীবনধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া আছে। কি কারণে, এবং কতকাল ধরিয়া এই অবস্থা ঘটিয়াছে সে অনুসন্ধান ঐতিহাসিক করিবেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা passive, পাশব চেতনা—একটা তামসিক দেহধর্ম্মই—আমাদের মধ্যে আজও টিকিয়া আছে; জড়ের সহিত সংঘর্ষে আত্মার যে সজীবতা—হৃদয়কে অবারিত ও প্রসারিত করিয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরে গ্রহণ করিয়া যে আত্মোপলব্ধি—তাহা হইতে আমরা বহুদিন বঞ্চিত আছি। মধ্যে মধ্যে যে দুইচারিজন মনীষী আবির্ভূত হইয়া জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে, এই রক্তমাংসগঠিত দেহের মধ্যে যে প্রাণদেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ করা হইয়াছে; দেহের মধ্যেই দেহহীন হইয়া থাকিবার—স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির অনুশীলন করিবার—মানুষ না হইয়া অতিমানুষ হইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আজিকার দিনেও, এই অতীন্দ্রিয়বাদ, এই ভূমা, এই দেহতত্ত্ববর্জ্জিত অধ্যাত্মজ্ঞান একটি নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। যে monasticism এতকাল ধর্ম্মে-কর্ম্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই নিঃসঙ্গ গুহাবাসীর ধ্যানবিলাসই আজ আবার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় কাল্‌চারের দুষ্প্রধর্ষ Idealism য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে আত্মসাৎ করিয়া—ভারতীয় ভাববাদ য়ুরোপীয় রূপবাদকে আশ্রয় করিয়া—যে আশ্চর্য্য নবজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহাতেও জীবন ও জগতের সঙ্গে দেহগত পরিচয় নাই; 'discovery by mankind of himself and of the world' বলিতে যাহা বুঝায়, সেই জগৎ-সাক্ষাৎকার ও জীবন-চেতনার পরিচয় নাই; তাই এ সাহিত্য প্রাণের উদ্বোধন করিল না। কবির বাঁশিতে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে রাগিণী উৎসারিত হইয়াছে, সে সঙ্গীত একটি অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি

করিয়াছে; তাহাতে কাব্যের দিক দিয়া ভারতীয় রসবাদের হয়ত হানি হইবে না, কিন্তু জীবনের দিক দিয়া এমন একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যাহাতে, বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ একটি পরম সত্যের ভাবস্বর্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে।

আমাদের mediaevalism ঠিক য়ুরোপের mediaevalism নয়; সেখানকার পারলৌকিকতা কখনও এমন একটি সুদৃঢ় অদ্বৈত-ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে নাই—ইহলোকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল মাত্র, তাহাকে শেষ করিতে পারে নাই। এজন্য প্রাণের দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই, মানুষ অবশেষে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাই যেমনই সহসা দুয়ার একটু খুলিয়া গেল, অমনি য়ুরোপ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পীড়নে সেখানে প্রাণধর্ম্ম বা দেহচেতনা কখনও অলস হইতে পারে নাই—প্রাণকে ঘুম পাড়াইয়া মনের অদ্বৈত-মহিমা জয়ী হইতে পারে নাই। এখানে প্রকৃতির শাসন অতিশয় শিথিল হওয়ায় জীবনসমস্যা অপেক্ষা মৃত্যুর সমস্যাই বড় হইয়াছে; বাস্তব-প্রত্যক্ষের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করিতে হয় নাই বলিয়া, অবাস্তব অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবসর মিলিয়াছে; যে-বীর্য্য জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হয় নাই তাহাই অধ্যাত্ম-সংগ্রামে নিয়োজিত হইয়াছে। এখানকার মানুষ কল্পনায় আত্মজয়, তথা বিশ্বজয় করিয়াছে; বহুপূর্ব্বকাল হইতেই দলে দলে সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; দিগ্বিজয়ী গ্রীকবীরকে ভারতীয় নগ্ন-ক্ষপণক সঘৃণ কৃপাকটাক্ষের দ্বারা পরাস্ত করিয়াছে। এই মনোভাব আমাদের অস্থি-মজ্জাগত। জগতে বাস করিব অথচ জগৎকে ভ্রূক্ষেপ করিব না, দেহ ধারণ করিয়া দেহকে মানিব না—এই প্রবৃত্তি বহুদিন প্রশ্রয় পাইয়া একদিন এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে, তখন প্রাণধর্ম্মকেই সবচেয়ে প্রয়োজন, কিন্তু সে আর সাড়া দেয় না। ভারতবর্ষ, দেহ ও আত্মা, অর্থ ও পরমার্থ এই দুইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছিল; কিন্তু একদিন বাহিরের এক দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবান জাতি এই ঘুমন্ত পুরীতে আপতিত হইয়া তাহার সুখ-স্বপ্ন নষ্ট করিল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, প্রাণ স্বাস্থ্য হারাইয়াছে। সেইদিন হইতে ভারতের ইতিহাসে যে অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে আজ তাহারই শেষ পৃষ্ঠা খুলিয়াছে। আর সেই প্রাণ-ধর্ম্ম যাহাদের মধ্যে জ্ঞানে ও বীর্য্যে পূর্ণবিকশিত হইয়াছে, পশ্চিমের সেই প্রকৃতি-উপাসক জাতি ব্রহ্মের অণ্ড-ব্যবসায়ীদের শেষ পিণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছে। তথাপি এই মৃত জাতি মৃত্যুধর্ম্মকেই আঁকড়াইয়া আছে, কবির মুখ দিয়া জগৎকে শুনাইতেছে—দেহের

চেয়ে আত্মা বড়; প্রকৃতির শান্ত আনন্দময়ী মূর্ত্তির ধ্যান কর; জাতীয়তা বর্জ্জন করিয়া মহামানবের আসন প্রস্তুত কর। এখনও সেই কথা, সেই উচ্চ চিন্তার শূন্যবাদ, সেই বাস্তব-ব্যভিচারী শাশ্বত-সনাতনের পূজা!

ভারতবর্ষ যে-সত্যকে চাহিয়াছিল সে-সত্য প্রকৃতির সত্য নয়, সে মন্ত্র জীবনের মন্ত্র নয়। প্রকৃতিও সনাতনী; তাহার ধ্বংস ও সৃষ্টি-লীলার মধ্যে যে চিরন্তনী ধারার আভাস পাওয়া যায়, সে তত্ত্ব স্বতন্ত্র—তাহাকে ধ্যানের দ্বারা নয়, মূক-মুগ্ধ জীবনাবেগের দ্বারাই উপলব্ধি করিতে হয়। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—এই বাক্যে যে সত্যের ধারণা আছে, তাহার জয় যে-জগতে ঘটে, তাহা মানুষের জীবন-রঙ্গভূমি নয়। সে-সত্যের পূজা করিতে হইলে শ্মশানকেই তীর্থভূমি করিতে হয়, সর্ব্বনাশকেই সর্ব্বপ্রাপ্তি বলিয়া মানিতে হয়। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন শ্মশানচারী দিগম্বরের প্রভুত্ব চলিবে না, তাহার বক্ষে কালীই নৃত্য করিবে; ততদিন উন্মাদবিজৃম্ভিত শাশ্বত-সত্য বা দেশকালাতীত অবাস্তবের সাধনা কখনও জয়ী হইবে না।

এই অবাস্তব ভাব-বিলাস জীবনকে পঙ্গু করে বলিয়াই সাহিত্যকেও প্রাণহীন করিয়া তোলে; সকল সাহিত্যেই, ভাব যখন বস্তুকে ছাড়াইয়া উঠে, তখনই কাব্যের অধঃপতন হয়। আমাদের বর্ত্তমান জীবন এইরূপ ভাববিলাসের অতিশয় অনুকূল। কিন্তু, একে জীবনীশক্তি ক্ষীণ—জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহুকাল যাবৎ ঘটে নাই, তার উপর ভাবস্বর্গের কল্পধেনুদোহন—ইহার ফলে জীবন-চেতনার মত সাহিত্যচেতনাও অসাড় হইয়া উঠিতেছে। তাই আমাদের কাব্য কেবল ছন্দ ও বাক্যের কসরৎ—অর্থহীনতাই তাহার রস, এবং অস্বাভাবিকতাই তাহার মৌলিকতা। জার্ম্মান রোমান্টিকগণের ভাববিলাস যখন অতিচারী হইয়া পরিশেষে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, কবি Heine তখনকার সেই সাহিত্যের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন, আমাদের আধুনিক কাব্য সেরূপ সমালোচনার উপযুক্ত হইতে পারিলেও ধন্য হইত; বরং গেটে এই যে কথাগুলি একস্থানে লিখিয়াছেন, আমাদের কবিদের সম্বন্ধে তাহাই অধিকতর সত্য—

> If feelings does not prompt, in vain you strive;
> If from the soul the language does not come,
> By its own impulse, to impel the hearts
> Of hearers, with communicated power,
> In vain you strive—in vain you study earnestly.

Toil on for ever ; piece together fragments ;
Cook up your broken scraps of sentences,
And blow, with puffing breath, a struggling light,
Glimmering confusedly now, now cold in ashes ;
Startle the schoolboys with your metaphors :
And, if such food may suit your appetite,
Win the vain wonder of applauding children !
But never hope to stir the hearts of men,
And mould the souls of many into one,
By words which come not native from the heart !

—কিন্তু words আসিবে কোথা হইতে?—heart কোথায়? তাই এ সকল কবিতার সম্বন্ধে গেটের ভাষাতেই বলিতে হয়—

Oh ! these fine holiday phrases
In which you robe your worn-out common-places,
These scraps of paper which you crimp and curl,
And twist into a thousand idle shapes,
These filigree ornaments are good for nothing,
Cost time and pains, please few, impose on no one ;
Are unrefreshing as the wind that whistles
In autumn, 'mong the dry and wrinkled leaves.

কিন্তু এই ব্যাধি একটি নূতন রূপে দেখা দিয়াছে আধুনিক ছোকরা-কবিদের কাব্যে। ইহারা নাকি এই বিলাসের বিরোধী—ইহারা জীবনেরই পূজারী! কিন্তু জীবন কোথায়? পিতৃপিতামহের মধ্যে তাহার যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল, ইহাদের মধ্যে সেটুকুও আর নাই। তবু জীবন চাই-ই। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের এত স্ফূর্ত্তি!—আমাদের ভিতরে খুঁজিয়া তাহার এতটুকুও কি মিলিবে না? কিন্তু মেলে না যে! অগত্যা দেহের শেষদশাতেও যাহা একেবারে শেষ হয় না, সেই যৌন-প্রবৃত্তিকেই ইহারা জীবন-ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং অতিশয় অকথা-কুকথাপূর্ণ ব্যাকরণ-অভিধান-বর্জ্জিত ভাষায় কাম-বিদ্রোহের প্রচার করিল—শীর্ণ শবদেহকে দানোয় পাইল। ইহারই নাম হইল সাহিত্যের জীবনধর্ম্ম! এই সম্পর্কে Faust হইতে আরও কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা চলে—

"The Night and Churchyard poets are engaged in an interest-

ing conversation with a newly arisen vampire, from which they anticipate the development of a new school of poetry".

জীবনের নামে এ যুগের তরুণদের এই যে বিকারজনিত পিপাসা—সর্ব্বাঙ্গে পঙ্কলেপন ও ধূলিভক্ষণ—জাতির পক্ষে ইহা যে কতবড় মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি, সেকথা হৃদয়বান চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। জীবনকে চাই, এ জ্ঞান জন্মিয়াছে—পরের জীবন, পরের সাহিত্য দেখিয়া; কিন্তু সত্যকার জীবনধর্ম্ম হইতে যাহারা বঞ্চিত, জীবন যে কি বস্তু তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাহাদের নাই, তাহারা পরের অনুকরণে যে জীবন-ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে তাহা কুৎসিত স্বপ্নবিলাস ও নির্জ্জীব কাম-জৃম্ভন মাত্র। যাহা নাই, কল্পনায় তাহার ছায়া ধরিয়া একটা উন্মাদ-উল্লাসের মর্ম্মভেদী দৃশ্য আমরা সম্প্রতি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দেখিয়াছি। হায় জীবন! বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; আরও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ পিপাসা জাগে নাই কেন? তখন জাতির দেহটা অন্ততঃ সবল ছিল, এমন মস্তিষ্কবিকৃতির সম্ভাবনা ছিল না।

জীবনের সহিত কঠিন প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বেদনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও তেমন করিয়া কবি-প্রেরণার সাহায্য করে নাই; যে বেদনা কবিচিত্তে প্রতিফলিত হইয়া মৃত্যুকেও অমৃত করিয়া তোলে, ভারতের তত্ত্বজ্ঞান তাহাকে অবস্তু বলিয়া চিরদিন দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, জীবনকে জীবনের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টাই করে নাই। তাই ভারতীয় কাব্যে ট্র্যাজেডির স্থান নাই। কিন্তু জীবন ও জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এই যে বেদনা ইহাই সুরময় হইয়া কাব্যসৃষ্টি করে, এই সুরই মানুষের চিত্তকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে—যাহা কঠিন, কর্কশ, রুদ্র ও নির্ম্মম তাহারই শোণিত-মাংস-লব্ধ বেদনায় মানুষ দেবত্বের সন্ধান পায়। কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন—

> Who ne'er in weeping at his bread,
> Who ne'er throughout the night's sad hours
> Hath sat in tears upon his bed
> He knows you not ye Heavenly Powers!

এই যে দুঃখ, মানুষজীবনে ইহা তো নিত্য-নৈমিত্তিক, তথাপি ইহা জাতি-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের কাব্য-প্রেরণার বস্তু হয় না কেন? তাহার কারণ, এই দুঃখ যদি শুধু passive, পাশব-চেতনার স্তরেই থাকিয়া যায়, তবে তাহার

seriousness কোথায়? আবার যদি ইহা অবস্থাগুণে দেহচেতনারও আড়ালে থাকিয়া যায়, এবং প্রবল মানসিকতার চাপে চিন্তাবিলাসের বস্তু হয়, তবে তাহার sincerity কোথায়? আজ আমাদের দুঃখ পাইবার শক্তিও নাই, Idea-র জগতে বাস করিবার উপায়ও নাই। আজ সব ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে, বঞ্চিত জীবন বহুকাল-সঞ্চিত ঋণের পরিশোধ দাবী করিতেছে, কিন্তু সে দাবী মিটাইবার ক্ষমতা নাই। আজ সেই ক্ষুধিত ব্যাধিগ্রস্ত জীবন বাস্তবেও যেমন, কাব্যেও তেমনি, তার সেই vital substantial function-এর অভাবে আলেয়ার মত দিক্‌ভ্রান্ত করিতেছে। একদিন এই জীবনকে উপেক্ষা করিয়া যে স্বতন্ত্র কাব্যজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, তেমনই জীবনেরই নামে যে অক্ষম মেরুদণ্ডহীন বাস্তব-বিলাস দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে তাহার ফলও শোচনীয় হইয়াছে।

কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে আমি যে আলোচনা করিলাম তাহাতে কাব্য-জিজ্ঞাসার সকল প্রশ্নের মীমাংসার দাবী করি না। আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসার প্রধান প্রয়োজন কি, তাহারই একটা ধারণা খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছি। Literature as a mode of art বিচার করা এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। Literature as a higher interpretation of life and nature—বিচার করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহাই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কেবল Aesthetics ধরিয়া কাব্য-বিচার করিলে কাব্যের যথার্থ বিচার হয় না; জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোথায় কতখানি যোগ আছে তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্য-বিচারে নানা অনর্থের সূত্রপাত হয়—সমাজ-নীতি ও ধর্ম্মের কচকচি, অথবা তত্ত্ববিশেষের কুহেলিকায় কাব্যকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, কাব্যের সঙ্গে জীবনের এই নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারায়, এতদিন কাব্যের প্রকৃত সংজ্ঞা ও মূল আদর্শ ধরা পড়িয়াছে—ইহাতে বহু বিতর্কের অবসান হইবে। জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ যেমন বিচিত্র, কাব্যের আদর্শ তেমনি সচল। কাব্য জীবন-ধর্ম্মী বলিয়াই নবনবোন্মেষশালী। আবার রসদৃষ্টিতে যেমন, রসবোধের মধ্যেও তেমনি, এই বিকাশ-ধর্ম্মের লক্ষণ আছে—অভিনব কাব্যসৃষ্টির প্রভাবে রসিকেরও চিত্তবিকাশ হয়। তাই, গেটের মত রসিকও অসঙ্কোচে স্বীকার করেন—

"I begin to find new qualities in the work, and new faculities in myself."

অতএব কাব্যবিচারে কাব্যের এই vital and substantial function-এর কথা যদি বুঝিয়া লওয়া হয়, তবে একদিকে যেমন তাহার বৈচিত্র্য ও স্বাধীন স্ফূর্ত্তির ধারণা অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনই আর একদিকে তাহার স্ব-প্রকৃতির ব্যভিচার সহজেই ধরা পড়ে। কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে ইহার যে প্রামাণ্য লক্ষণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি, তাহা এই—

"Poetry with varying intensity reveals to us a world which answers to the deepest and gravest requirements of the mind : a world ideal in its harmony and its permanence, in its security, and above all, in its significance, but nevertheless a world real in its substance."

আর একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশে আজকাল কাব্যবিচারে যে বাদবিসম্বাদ ও ভ্রান্ত ধারণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—কাব্যকে এইদিক দিয়া দেখিলে, তাহা মুহূর্ত্তেই দূর হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। অভিজাত সাহিত্য বা সাহিত্যের আভিজাত্য বলিয়া যে কথাটা কাব্যবিচারে আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাই, সে কথাটা যে কতখানি ভুল, তাহা সহজেই ধরা পড়িবে। কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে ইহাই দেখিলে চলিবে না যে, তাহার মধ্যে Idea-র perfection, বা Idealism কতখানি আছে, দেখিতে হইবে তাহাতে perfection of experience আছে কি না। যে-কল্পনা কাব্যের আভিজাত্য রক্ষা করিবার জন্য জীবনের কায়াকে ত্যাগ করিয়া তাহার ছায়া লইয়া একটি সূক্ষ্ম মায়াজাল রচনা করে, সে-কল্পনা কাব্যের পক্ষেও মিথ্যাচার। কাব্যবিচারে আভিজাত্য কথাটাই নিরর্থক। কাব্যের সৌন্দর্য্যই তাহার শুচিতা—সেই শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য কবিকে ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিতে হয় না; কেন না, চাই perfection of experience; তাহা যদি হয় তবে কাব্য সুন্দর হইতে বাধ্য; সেই সৌন্দর্য্যই তাহার শুচিতা। অপর পক্ষে, কল্পনার শুচিতা রক্ষা করিয়া যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহাতে, Idealism-ই থাকিবে, perfection of experience না থাকাই সম্ভব, এবং তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইবে না। এইরূপ বৃথা তর্কের অবসান যাহাতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা—নিজে যেমন বুঝিয়াছি তেমন করিয়া বুঝাইতে হয় ত' পারি নাই; তথাপি আশা করি, এ আলোচনা একেবারে ব্যর্থ হইবে না।

মাঘ, ১৩৩৫

কবিতা ও বৈরাগ্য

একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাহার একটি হইতেছে—বৈরাগ্য জিনিষটা কাব্যের অন্তরায় হইবে কেন? অর্থাৎ, বৈরাগ্যের মধ্যেও কি রস নাই? তদ্দ্বারা কাব্যরচনা হয় না? উদাহরণ-হিসাবে তিনি উপনিষদের অনেক স্থান ও বৈষ্ণব কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্নকর্ত্তা যে রস-পিপাসু তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষপাতী; এ কারণ, এই দুই বস্তুকে পরস্পরবিরোধী বলিয়া ধারণা করিতে তিনি অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রশ্নটির মধ্যে একটি অসঙ্গতি আছে—তিনি রসকে যখন স্বীকার করেন, তখন বৈরাগ্য বলিতে তিনি কি বোঝেন? তিনি কাব্যে বৈরাগ্য-প্রেরণার যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, ঠিক বিষয়াসক্তি না থাকিলেও, কাব্য-প্রেরণার পক্ষে অন্য ধরণের আসক্তিও কার্য্যকরী হইতে পারে। এ কথা বিচার করিবার পূর্ব্বে বৈরাগ্যের আদর্শটা একটু বুঝিয়া লইলে মন্দ হইবে না। কারণ, এই বৈরাগ্য কথাটার ব্যবহার একটু ভিন্ন অর্থেও হইতে পারে। কাব্যের পক্ষে কোন্ ধরণের বৈরাগ্য কতটুকু ফলপ্রদ তাহা বিচার করিতে হইলে, বৈরাগ্যের নানা অবস্থা বুঝিয়া লওয়া দরকার।

বৈষ্ণব আপনাকে ব্রজ-গোপিনী কল্পনা করিয়া পার্থিব প্রেমের পরিবর্ত্তে এক শাশ্বত পরমপুরুষকে পতিরূপে ভজনা করে; শক্তিসাধক মহাশক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া নির্ভয় হইতে চায়। উপনিষদের ঋষি অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার আশ্রয়ে অমৃত আস্বাদন করেন। এই সব সাধনার কোনটাই খাঁটি বৈরাগ্য-সাধনা নহে। এখানেও কাম আছে, পিপাসা আছে—সে কামের সাধনা কিছু অসাধারণ এইমাত্র। এখানে বৈরাগ্য অর্থে, কামকে প্রকৃতিমুখী না করিয়া আত্মমুখী করা। ইঁহারা কামকে বস্তু হইতে বিযুক্ত করিয়া ভাবের উর্দ্ধলোকে তুলিয়া ধরেন। ইঁহাদের মধ্যে খাঁটি বৈরাগ্য নাই, বিষয়-বৈরাগ্য আছে মাত্র। উপনিষদের ঋষিদের জীবনে কি ছিল জানি না; তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনায় যে আনন্দবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উপাদেয় মনে হইলেও, তাহা হইতে ইহাও অনুমান

হয় যে, জীবনের বাস্তব সমস্যা ইহাদিগকে বিচলিত করে নাই; যেমন করিয়াই হউক সে দুর্ভোগ হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে—আজিকার দিনেও যাঁহারা নির্জ্জন সাধনকুঞ্জে অমৃতের সন্ধান করিতেছেন, এবং আশা করেন যে সেই অমৃত পাইলে, আজিকার এই গরল-মূর্চ্ছিত জীবনযাত্রীকে তাহা দান করিয়া তাহাদের সকল দুঃখ মোচন করিবেন—তাঁহারাও ভ্রান্ত। জীবনের সম্মুখে না দাঁড়াইয়া যাঁহারা পশ্চাৎ হইতে এবং দূর হইতে, তাহাকে ভাবসাধনা বা যোগ-সাধনার দ্বারা বশ করিতে চান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সে অমৃত অপরের পক্ষে স্বাদহীন; তাহা আস্বাদন বা উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাদের সকলকেও ঐ প্রকার নির্জ্জন-নিকুঞ্জে সাধনা করিতে হইবে—একজন বা দুইজন মহাপুরুষ দূরে বসিয়া তাহাদের জন্য সাধনা করিবেন, আর তাঁহাদের সেই গুরু-মন্ত্রের বলে, আর সকলের—জগৎশুদ্ধ লোকের—পরিত্রাণ ঘটিবে, একথা যেরূপ অর্থহীন, সেইরূপ অন্যায়। সে-অমৃত আস্বাদন করিতে হইলে সকলকেই ঐ পথে চলিতে হইবে, অর্থাৎ জগৎশুদ্ধ সকলকে যোগী-সাধক হইতে হইবে। জীবনের সমস্যা তেমন করিয়া পূর্ব্বে কখনও ঘুচে নাই—ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য সর্ব্বত্র রহিয়াছে, পরেও কখনও ঘুচিবে না। আমাদের দেশে যাঁহারা অবতার বলিয়া পূজা পাইয়াছেন, তাঁহারাও মানুষ হইয়া মানুষের জীবন-লীলায় তাহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া, তবে কিছু উপকার করিতে পারিয়াছেন। এই সকল যোগী-সাধকগণের সাধনার তুলনায় তাঁহাদের জীবন-ব্যবহারে অনেক অধিক রসের অবকাশ ছিল। মনুষ্যসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া অতি-মানুষ সাধনা যাহারা করে, তাহারা যে কি করিয়া সাধারণ মানুষের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিবে, তাহাই আশ্চর্য্য। তাহাদের সেই মহাসাধনার মহামন্ত্র একবার প্রচার করিলেই মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিবে—পরমার্থঘটিত সত্যের প্রভাব মানুষের পক্ষে কি এতই প্রবল! ইহা অপেক্ষা ঋষিগণের কাণ্ডজ্ঞান অধিক ছিল বলিতে হইবে—তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যাটি গোপন করিতে চাহিয়াছিলেন; যে-সাধনা আত্মমুখী তাহাকে তাঁহারা প্রকৃতি-পরবশ জনগণের মধ্যে প্রচার করিতে চাহেন নাই। সে রস একার রস, অতএব তাহা দ্বারা সাহিত্য হয় না। কিন্তু রস যে-কোন ধরণের থাকিলেই তাহা কাব্য, ইহা যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের কাব্যের ধারণাই স্বতন্ত্র।

কিন্তু ক্রমে এমন যুগ আসিল, যখন দুঃখের দাহনে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল

এবং আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই হইল পরম-পুরুষার্থ। দিকে দিকে সত্যকার বৈরাগ্য-সাধনের প্রবৃত্তি ও পন্থা দেখা দিতে লাগিল। সে সাধনায় যে একমাত্র পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন বুদ্ধ; কারণ এমন করিয়া সুখ-দুঃখের নিদান অহংসংস্কারকে লুপ্ত করিয়া আত্মাকে অস্বীকার করিয়া, নির্ব্বাণ-মুক্তির ব্যবস্থা আর কেহ করেন নাই; তৃষ্ণা-রতির আত্যন্তিক উচ্ছেদ সেই একজনই করিতে পারিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে, এই আদর্শের সাধনায়, মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম যে কতভাবে আত্মগোপন করিয়া কামকেই জয়ী করিয়াছে—কত নব নব তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য আজও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও সংসারের উপর আক্রোশ করিয়া এই কামকে নিগ্রহ করিবার সাধনা—'The world, the flesh and the devil'-এর শাসন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া একটি কঠিন আত্মসন্তোষের অভিমান—মানুষের ইতিহাসে, নানা আকারে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, কবিতা এইরূপ বৈরাগ্যের ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। কিন্তু অন্য এক ধরণের সংসার-বিমুখতা আছে, তাহাকে পরমার্থ-প্রীতি বলা যায়। অতৃপ্ত বা অপরিমেয় কামনা হইতেই ইহার উদ্ভব। হৃদয়ের পরম উৎকণ্ঠা নিবেদনের জন্য মানুষ একজন আদর্শ প্রেমিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে চায়। সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হইলেও, এই সংসারকে ও মানুষের সর্ব্ববিধ সম্পর্ককে তাঁহারা মমতা-নির্লিপ্তভাবেই দেখেন, মানুষের সকল তাপ দুঃখ কষ্টকে সেই পরম-প্রেমিকের প্রতি প্রেমহীনতার ফল বলিয়া মনে করেন। এখানে দেখা যায়, মানুষের কাম একদিকে বাধা পাইয়া অন্যদিকে চরিতার্থ হইবার পথ খুঁজিতেছে। উপনিষদের ঋষিগণের আত্মসাধনায় যে রসোপলব্ধির পরিচয় আছে তাহা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। এখানে মন অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিই প্রবল। আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে এই যে আত্ম-সমর্পণের ভাব; নিজের কামনাকেই এক অতি-মানব প্রেম-বিগ্রহের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়া এই যে এক অপূর্ব্ব আত্মরতির উপভোগ; কামের জ্বালাকেই বিষয়ান্তরে সন্নিবিষ্ট করিয়া সংসারকে ফাঁকি দেওয়ার এই যে কল-কৌশল—ইহার রসাবেশের সুর মানুষের কণ্ঠস্বরে মধ্যে মধ্যে ধরা দিয়াছে—আমার প্রশ্নকর্ত্তা, বোধ হয়, সেই ধরণের গানকেই বৈরাগ্য-রসের কাব্য বলিতে চান।

কথাটা আমিও ভাবিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সায় দিতে পারি নাই কেন, তাহাই এইবার বলিতেছি। একথা কেহ অস্বীকার করিবে না যে, এ-ধরণের সাধনায়

প্রচুর ভাবের আবেগ আছে; এবং ভাব যেখানে আছে সেখানে সুর থাকাও অসম্ভব নহে। অতএব এই ভাব হইতে যাহা রচিত হয় তাহাকে কাব্য না বলিয়া গান বলিলে বোধ হয় আরও ঠিক হয়। গানের সার্থকতা ভাবের উদ্বোধনে। মহাশূন্যতাবোধও একটা ভাব; এই ভাব হইতেও গানের জন্ম হয়, এবং তাহা হইতে অপরের চিত্তে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা যে সময়ে সময়ে কাব্যের সীমানায় আসিয়া ঠেকে—একথা যেমন ঠিক, তেমনই, এইপ্রকার ভাবের সুর জাগিলেই তাহাতে যে কাব্যরসসৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, তাহাও নহে। ইহা হইতেই ভাবাত্মক গীতি, এবং কবিতার পার্থক্য ধরা পড়িবে। গানের সুরই সর্ব্বস্ব, অর্থাৎ যে কোনও ভাবের উদ্বোধন হইলেই তাহার কাজ শেষ হয়। কিন্তু কবিতার প্রয়োজন—কথা, যাহাকে বিশেষ করিয়া 'বাণী' নাম দিব। এই বাণী ভাবের সুরেই গৌরবান্বিত নহে—ইহা প্রত্যক্ষ রূপ-সৃষ্টি।

এই রূপ-সৃষ্টি করিতে হইলে যে ধরণের যে আসক্তি আবশ্যক—তাহা এই সকল পন্থার কোনটিতেই সম্ভব নহে। জগৎকে যে ভাবে দেখিবার ও দেখাইবার শক্তিকেই কবি-শক্তি বলে, তাহার মূলে যে বৃত্তিটি কাজ করে তাহার ইংরাজী নাম—Imagination; দেশী নাম নাই, কারণ আমাদের দেশে কাব্যের আদর্শ কিছু ভিন্ন রকমের। এই রূপ-সৃষ্টি করিতে হইলে কবিকে আত্মমুখী ভাবুক হইলে চলিবে না—কবি-হৃদয় যত ঘনিষ্ঠভাবে জগৎ-হৃদয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে, ততই সেই Imagination-এর স্ফূর্ত্তি হইবে, এবং তাহা হইতে যে বাঙ্ময় রস-রূপের সৃষ্টি হয় তাহারই নাম কাব্য। ইহা হইতে গান ও কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে। সাধকগণের যত গান আমরা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা কাব্যধর্ম্মী, সেগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের একটি না একটি সুমধুর বেদনা—ঔদাসীনতার মধ্যেও এই জীবনের প্রতি একটি সুগভীর মমতার ব্যঞ্জনা গৌণভাবে ফুটিয়া উঠে। আমার প্রশ্নকর্ত্তা রামপ্রসাদের গানের একটি কলি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

> প্রসাদ বলে, বসে আছি ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা,।
> জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা॥

সত্যই,—কি মধুর! কি সুন্দর! কিন্তু ইহার ভাবটি চিত্ররূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—জগতের একটি রূপ, জীবনের একটি অবস্থা, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ভবার্ণবে ভেলা ভাসাইয়া, তাহার নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ একটি

মানুষ যে ভাবে লক্ষ্য করিয়া নির্ভাবনায় বসিয়া আছে—সেই জল-রাশির জোয়ার-ভাঁটা এবং মানুষের সেই অবস্থান-ভঙ্গিটি, বাস্তব-রূপের সীমা লঙ্ঘন করে না; মানুষের রূপাসক্ত মন অজ্ঞাতসারে ঐ রূপ-রসে আকৃষ্ট হয়, পরে নিয়তি বা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের যে ভাবটি উহা হইতে আমাদের চিত্তে সংক্রামিত হয়, তাহার মধ্যেও বৈরাগ্য অপেক্ষা মনুষ্যজীবনসংক্রান্ত একটি ট্র্যাজেডির হৃদয়-সংবেদনাই অজ্ঞাতসারে ফুটিয়া উঠে। উহাই উহার রস। অবশ্য, ইহাও কতকটা নির্ভর করে রসগ্রাহিতার উপর; শ্রোতা যদি কাব্য-রসিক না হইয়া বৈরাগ্য-ভাবরসিক হন, তবে তাঁহার হৃদয়-সংবেদনা অন্য ধরণের হইবে। কিন্তু ঐ দুইটি ছত্রে কাব্য-রসের অবকাশও যে আছে এবং তাহা কি কারণে আছে, আমি তাহাই বলিয়াছি। এই ধরণের সাধক-সঙ্গীতের অনেকগুলি লিরিক-কবিতা হইয়া উঠিলেও, এবং সাধারণতঃ এই সকল গানের প্রেরণায় ভাবের গভীরতা থাকিলেও, যে কবি-বৃত্তিকে Imagination বলে, তাহার স্ফূর্ত্তি খুবই কম। কবি ও সাধকগণের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ এই যে, এই সকল সাধকগণের ঈশ্বরপ্রেম বা পরমার্থ-প্রীতি মূলে আত্মমুখী; কিন্তু কবি-প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাহা একেবারেই আত্মহারা; আত্মসাধন বা আত্মলাভের কোনও প্রয়োজনবোধই তাহার নাই; সে একেবারে যাহাকে বলে—লক্ষ্মীছাড়া। যতই সে আপনাকে হারায় ততই তাহার আনন্দ; এই আপনাকে হারাইবার মধ্যে পরকে পাওয়ার আশা বা আশ্বাসও নাই। যে পরিমাণে সে নিজের ব্যক্তি-সংস্কারকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, সেই পরিমাণে এই জগতের রূপ-রহস্য তাহার চেতনায় উদ্ঘাটিত হয়; সেই উদ্ঘাটন-ব্যাপারে তাহার আত্মার কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না, তাহাতে স্ব-কর্ত্তৃত্বের চেতনা থাকে না—সে একটি অবশ আবেশের অবস্থা। এই অপূর্ব্ব প্রকৃতি-পারবশ্যই কবি-প্রতিভা; তাহা হইতে কবির ভাগ্যে এই বিশ্বের যে রসরূপ-দর্শন ঘটে, তাহার সহিত আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। এই যে দর্শনের কথা বলিলাম—ইহা ঋষির আত্মদর্শন নহে, অথবা মিষ্টিক সাধকের তত্ত্বরস-চেতনার চমকও নহে; কারণ এই দৃষ্টিই সৃষ্টি, ভাব একেবারে রূপ হইয়া উঠে। কবিতার form ও content বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার একটি হইতেছে রূপোদ্ধৃত রস, এবং অপরটি হইতেছে তাহারই আশ্রয়—এই রূপ-জগতের রূপ-বিশেষ। কবির কল্পনায় এই দুইটি পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত নিত্যসম্পৃক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এই রূপের পশ্চাতে

নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা যেমনই থাকুক, তাহাই ইহার গৌরব নহে ; ঐ রূপের উপাদানে জড় ও চিৎ এক হইয়া মিলিয়া থাকে, ভাবে ও রূপে কোন প্রভেদ থাকে না। এই আশ্চর্য্য যাদু-কীর্ত্তিই কাব্য,—ইহা যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি স্বীকার করিবেন যে, কাব্যসৃষ্টি কেবলমাত্র ভাবাবেশ বা তত্ত্বরসের চমকসৃষ্টি নহে ; এজন্য বৈরাগ্য যদি বা কোথাও গীতি-রসের সৃষ্টি করে, তাহাকে কবি-কল্পনার সহায় মনে করা ভুল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক ছিল—লিরিক-কবিতার কথা ; কিন্তু তাহার অবকাশ এখানে নাই, অতএব উপস্থিত স্থগিত রহিল। আমি গান ও কবিতার যে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে এই কথা বলিয়াছি যে, ভাবমাত্রই গানের প্রেরণা হইতে পারে, তাহাতে বিষয়-বস্তুর সম্পর্ক যদি বা থাকে, তাহার বিস্তারের আবশ্যক নাই—কেবল আত্মগত অনুভূতির আবেগই যথেষ্ট। যেখানে গানের প্রেরণায় এইরূপ জীবন বা বহিঃপ্রকৃতির প্ররোচনা বিশেষভাবে বিদ্যমান, সেইখানে যে emotion-এর সৃষ্টি হয় তাহাও কাব্য, কারণ সেখানে রূপাসক্তিই প্রবল ; এজন্য এইসকল গানকেই আমরা লিরিক-কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত করি। আমাদের দেশের কাব্য-জিজ্ঞাসায় শেষে 'রস' নামক যে বস্তুটির মাহাত্ম্য-ঘোষণাই একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ সর্ব্ববিধ ভাবাত্মক রচনাতে পাওয়া অসম্ভব নহে—তাহাতে বস্তু-কল্পনা বা রূপরসের সম্পর্ক না থাকিলেও চলে। কিন্তু কাব্যে আমরা কবির যে সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পাই তাহা কেবল ভাববিশেষের ইঙ্গিতমাত্র নহে। ভাগবতী সৃষ্টির অন্তরালে—তাহাকে অতিক্রম করিয়া, যে ভাব বা Idea বিরাজ করিতেছে, তাহার ধ্যানে রতি বা অরতির একটি emotional mood জাগে, এবং তাহা সংক্রামকও বটে ; কিন্তু সেই mood কবি-কল্পনার রসাবস্থা নহে, তাহাতে কাব্যসৃষ্টি হয় না। এই জন্যই বৈরাগ্যের মধ্যেও যদি একটা emotional mood থাকে তাহা সুর পর্য্যন্ত পৌঁছায় —গান হয়, কবিতা হয় না। এখানে একটা কথা বলা দরকার। অনেক কাব্যে দেখা যায়, কবি যেন সৃষ্টি-চাতুরীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযোগ করিয়াছেন—এ রূপের রস তাঁহার পানপাত্রে বিষ-কটু হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য তাঁহার কাব্যে সৃষ্টি-বিধানের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপের অবধি নাই। তাহা হইতে আমরা যেন মনে না করি—ইহাই কাব্যের বৈরাগ্য-রস !—যেন ভুলিয়া না যাই যে, আর্ত্তনাদের কারণও প্রবল আসক্তি ; তাহা না হইলে তিনি কবিতা লিখিতেন না ; ঝাল খাইতেই

তিনি ভালবাসেন—যত মুখ জ্বালা করে ততই তাহা মিষ্ট। কাহারও কাব্যে যদি এ লক্ষণ না থাকে, তবে তাহা কাব্যই নহে।

এ আলোচনায় অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত রহিয়া গেল—অনেক গুরুতর সমস্যাও ইহার মধ্যে উঁকি দিতেছে, তাহা আমি জানি। সে সকল সমস্যার সমাধান শেষ পর্য্যন্ত তর্কের আয়ত্ত নহে; এরূপ এক তরফা আলোচনায় তাহা আরও অসম্ভব। তবু সবশেষে এই আলোচনার প্রসঙ্গে, অর্থাৎ বৈরাগ্য ও কবিতার সম্পর্ক-বিচারে, একটি প্রশ্ন আমার মনে উঁকি দিতেছে। আমি গোড়ার দিকে মানুষের জীবনে কামের প্রভাব ও তাহার প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। একথাও বলিয়াছি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য বা খাঁটি সন্ন্যাস—এই কামের উচ্ছেদ-সাধন। দার্শনিক-প্রবর Schopenhauer-এর মতে প্রবল জীব-প্রবৃত্তি, বা Will to Live—এই সৃষ্টিপ্রবাহের একমাত্র উৎস। এই প্রবৃত্তির বশে মানুষ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি পায় না। তিনি মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) যাহারা এই Will-এর শাসন হইতে মুক্ত, সংসারে উদাসীন, নৈষ্কর্ম্যই যাহাদের আদর্শ, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী; ইহারা জীব-প্রকৃতির দাসত্ব করে না, ইহাদের উৎকৃষ্ট বিবেকবুদ্ধি—"grasps the phenomena of life objectively, and so cannot fail to see clearly the emptiness and futility of it"। (২) যাহারা এই সৃষ্টিপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সন্তরণ-সুখের কামনা করে—তাহাকেই পরম-পুরুষার্থ মনে করে; ইহারা জীব-প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেয়, কারণ, তাহার দ্বারা লালসার বস্তুকে পাওয়ার পথ সহজ হয়। তিনি বলেন, "A man is great or small according to the predominance of one or the other of these views of life."

তাহা হইলে কবিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায়? কবি যে কর্ম্ম করেন তাহা কি জীব-প্রবৃত্তির অনুসারী? বাহিরের জগতে আত্মপ্রসারের চেষ্টা কবি-প্রবৃত্তির একান্ত বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। অথচ কবি সন্ন্যাসীও নহেন। অবশ্য কবিকেও সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে হয়; তবুও তাঁহার মধ্যে যে স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তি আছে তাহা অসাধারণ, এবং মনুষ্যসমাজে তাহার একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ও আছে। এই ব্যক্তিটির কথাই বলিতেছি। এই কবি-জীবনের আদর্শ কি?—বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন হইলেও, জীবনের প্রতি তাঁহার আসক্তিও কম নহে। ভোগ ও ত্যাগের মাঝখানে তৃতীয় কোন ভূমি আছে, যাহাকে কবি-চিত্তের আশ্রয়

বলা যায় ? কবি-চিত্তে—Intellect বা Will—কোনটীরই আধিপত্য নাই ; কবির কামনা যে উপায়ে চরিতার্থ হয়, তাহাতে Will-এর বালাই নাই। অথচ, কবি যে কাব্য-জগৎ নির্ম্মাণ করেন তাহাতে বহিঃসৃষ্টির আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় আছে। অতএব, Intellect ও Will ছাড়াও আর একটি শক্তি আছে—যাহা কোন কোন মানুষের জীবনে প্রকাশ পায়। এই শক্তিই সেই যাদুশক্তি—কবিপ্রতিভা ; সেই শক্তির নাম Imagination ; ইহার সাহায্যে বস্তুকে এক অভিনব উপায়ে ভোগ করা যায়—জীব-প্রবৃত্তি সৃষ্টি-প্রবাহে ঝাঁপ না দিয়া আর এক দিক দিয়া চরিতার্থ হয় ; ইহা যেন—'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।' এ শক্তি যাহার আছে তাহার বিষয়-লালসা Will-এর অপেক্ষা রাখে না ; তাহার কামই কাম্য বস্তুকে সৃষ্টি করে,—কাম ও Will এখানে অভিন্ন ; কাম আছে অথচ কাম্যবস্তু-প্রাপ্তির প্রয়াস-বিড়ম্বনা নাই। এই কল্পনাশক্তি যাহার আছে সে ভোগের মধ্যেও মুক্তি-সুখের অধিকারী ! সাধারণ মানুষ যাহাকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক ছাড়া ভোগ করিতে পারে না, কবি তাহাকে যে-রূপে ও যে-উপায়ে ভোগ করেন তাহা আরও সম্পূর্ণ, আরও যথার্থ। তাঁহার সম্বন্ধে গীতাকারের এ ভৎর্সনা খাটে না—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

কবির Imagination মিথ্যাচার নহে,—বরং মানুষের চেতনায় বাস্তবের সম্যক্ উপলব্ধির এত বড় পন্থা আর নাই। কবির মত এই জগৎ-সৃষ্টির এত বড় মর্ম্মজ্ঞ আর কেহ নাই ; তাঁহার তুলনায় Schopenhauer-এর মত দার্শনিককে বঞ্চিত, এবং নেপোলিয়নের মত কর্ম্ম-বীরকেও বিড়ম্বিত বলিতে হইবে। কাব্যের সহিত সত্যকার বৈরাগ্যের সম্পর্ক কি রকম ও কতটুকু, তাহাও ইহা হইতে অনুমান করা যায়।

শ্রাবণ, ১৩৩৮

রস-রহস্য

(একখানি পত্র)

তোমার চিঠি পেলাম। প্রতি তারিখের instalment এত স্বল্লায়তন যে, তোমার ক্লান্তির প্রমাণ ওতেই স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। তোমাদের বয়সে আমার এতটা অবসাদ কখনও ঘটেনি ; তার কারণ, বোধ হয় সেটা সেকাল, তখনকার আবহাওয়া এত শ্বাসরোধকর ছিল না। আমি সেকালের মানুষ—তোমাদের কালে আমারই কি হাল হয়েছে তা' দেখছ ত ? তোমার এই অবস্থার যে পরিচয় দিয়েছ এবং তার কারণ সম্বন্ধে আমাকে যা' জিজ্ঞেস করেছ তার উত্তরে আমার যা' মনে হয় তা' বলছি। তোমার অবস্থাটা হচ্ছে নৈরাশ্য-পীড়িতের অবস্থা ; তুমি লিখেছ, যে-কর্ম্মে কোন রকম সফলতার আশা নেই, সেই কর্ম্মে যন্ত্রের মত নিযুক্ত থাকার এমনি একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে তাইতেই তুমি জড়তা প্রাপ্ত হ'য়েছ। কর্ম্মমাত্রেই যন্ত্রবৎ নিষ্ঠা চাই, সে অভ্যাসের নেশাও চাই ; কিন্তু তাতে ক্লান্তি বা জড়তা আসবে কেন ? তুমি বলেছ—আশা নেই বলে'। আশা নেই কেন ? আশা মানে ত' সফলতার সম্ভাবনায় মনের মধ্যে নিরন্তর একটা উৎসাহ বা উৎফুল্লতা ; সেটা ত' বর্ত্তমান নয়, সে যে চিরভবিষ্যৎ ! তার জন্য চাই কল্পনা ও বিশ্বাস। তোমার ত' কল্পনা যথেষ্ট আছে, আকাশকুসুম রচনা করবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দুইই আছে। আর আশা ত' বয়সের ধর্ম্ম ; বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু আশা অপরিমিতা ; বয়সে অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায় ?" প্রথমটা তোমার, এবং শেষটা আমার অবস্থার সম্বন্ধে খাটে। তবে তোমার এমন নিরাশ অবসন্ন অবস্থা কেন ? তার একমাত্র কারণ, তুমি ঐ ব্যবসায়টিকে প্রাণ দিয়ে বরণ করনি। সংসাররূপ অভিভাবক যাকে তোমার সহধর্ম্মিণী করে' দিয়েছে তাকে তোমার পছন্দ হয় না ; তার শত গুণ থাকলেও এবং তার আপাদমস্তক অলঙ্কার-ভূষিত হ'লেও, এবং সে তোমার গৃহ ধনে ও জনে পূর্ণ করে' দেবার সামর্থ্য রাখলেও, তাকে তোমার মনে ধরেনি,—শুভদৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটেছে। শুধু তাই নয়, তুমি তার আগেই কবিতানাম্নী এক হাবভাবশালিনী স্বর্গ-বেশ্যার কুহকে পড়ে' ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-

-মোক্ষ সব বিসর্জ্জন দিয়ে, লক্ষ্মীছাড়ার যে সুখ সেই সুখের জন্য লালায়িত হয়েছে। কাজেই এই ধনসম্ভবা বণিককন্যাটিকে তোমার আদৌ ভাল লাগছে না; তুমি যদি তাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করতে, তা' হলে সে তোমার ঔরসে রৌপ্য ও কাঞ্চন-সন্তান প্রসব করে' তোমার কৌলীন্য বৃদ্ধি করত। কিন্তু তুমি তার প্রতি এত বিরূপ যে, সে হয়ত শেষে বন্ধ্যা হয়ে যাবে, কিম্বা রৌপ্যকাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কতকগুলি শিলাখণ্ড প্রসব করে' তোমার স্কন্ধে চাপিয়ে দেবে; কারণ যেখানে প্রেম নেই, সেখানে বাধ্যতামূলক যৌন-মিলনের ফলে যে সব জীব জন্মগ্রহণ করে তারা পিতৃঘাতী হয়। অতএব সাবধান! বণিককন্যাটিকে ঘরে এনে তাকে অনাদর কোরো না; তার চেহারা যদি আপাত-মনোহারী না হয়, তবে কল্পনার বলে তার ভবিষ্যৎ রৌপ্যকাঞ্চনসন্ততি-শোভা অহরহ মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করে' তার প্রতি আসক্ত হবার সাধনা কর; তা'হলেই অবসাদ জড়তা আর কিছুই থাকবে না। আর সেই দুষ্টা অপ্সরাটিকে অতিশয় গোপনে প্রেম নিবেদন কোরো; তার সপত্নী-ভয় নেই, বরং শত সপত্নীর মুণ্ডপাত করে' নিজের সর্ব্বনাশিনী শক্তি প্রমাণ করাতেই তার সবচেয়ে আনন্দ। কিন্তু এ বেটীর বড় ঈর্ষা—এ একটা সপত্নীও সহ্য করবে না; বেণের মেয়ে কিনা!—মনটা বড় ছোট। আজকালকার দিনে কবিমাত্রকেই দ্বিপত্নীক হ'তে হবে—একপত্নী-ব্রত এখন অসম্ভব; যে তা' না পারবে, কোনও পত্নীই তার ঘরে থাকবে না। বিষয়বুদ্ধি ও কবিকল্পনা এই দুয়ের মিলন না হ'লে কবিজীবন দুর্ব্বহ হয় বলে'ই আজকালকার কবিতার রস অন্যরকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—কাব্যেও এই বণিক-কন্যাকে রাণীর আসনে বসাবার জন্যে, আধুনিক কবিকুল কল্পনাকে কেটে-ছেঁটে বেনে-বৌ সাজিয়ে এত ঘটা করে Realism-এর গৌরব কীর্ত্তন করছেন। নিছক কাব্য আর চলবে না যে কেন, তার আসল কারণটি এই। এখন কতরকম ছলনা, চাতুরী ও শঠতার চর্চ্চা করতে হয়—কারণ, ডাইনে-বাঁয়ে ঐ দুইটিকেই বাগিয়ে নিয়ে চলতে হবে। তাই কাব্যের রুচি বা আদর্শ-বিচারে 'modern' আর 'life' এই দুটো শব্দের চীৎকার এত বেড়েছে। ভিতরে বড় বিপদ কিনা!—বাস্তব প্রত্যক্ষকে একমুহূর্ত্ত ভোলবার যো নেই—কবিরও নয়, পাঠকেরও নয়; তাই 'রস' জিনিষটা এখন আস্বাদনের বস্তু না হয়ে চর্ব্বণের বস্তু হয়েছে; কাব্যে চর্ব্বণযোগ্য অস্থিখণ্ড থাকা চাই—খাঁটি মোদকখণ্ডিকা হ'লে চলবে না; তাতে flavour থাকবার প্রয়োজন নেই, চাই স্বাদ-বৈচিত্র্য; তা না করতে পারলে যা' হবে তার ত' জলন্ত দৃষ্টান্ত তোমার সামনেই আছি; এতেও যদি চৈতন্য

না হয় তবে, আত্মীয়-স্বজন দারা-পুত্রের অভিশাপ বহন করে' চিরজীবন ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকতে হবে।

আজ দিন ৩।৪ হল স্ত্রীপুত্র সব ফিরেছে। অনেকদিন নিঃসঙ্গ অবস্থার পর এই পুনর্মিলনে প্রাণটা যেন একটু স্বস্থ বোধ করছিল। বৈরাগ্যটা আমার ধর্ম্ম নয়; তবে জীবনীশক্তি স্তিমিত হওয়ার জন্যে যে বৈরাগ্য, তা' আমাকে মাঝে মাঝে অভিভূত করেছে। কিন্তু এবার এই একটুখানি প্রাণের আরাম যেই অনুভব করলাম—অমনি এমন একটা হঠাৎ আঘাত পেলাম যে, তা'তে আবার আমার প্রাণটা বড় মুষ্‌ড়ে পড়েছে। প্রাচীন মিশরবাসীদের সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে, যখন তারা উৎসব-রজনীর ভরা ভোগসুখে উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌ত, তখনই সেই ফুল, আলো, গান, রূপ-যৌবন ও মদ্যস্রোতের মধ্যে হঠাৎ একটা 'মামি' তাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ছিল। জীবনের এই ভোগ-সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে বীভৎস কঙ্কাল লুকিয়ে আছে, সেটা যেন বিস্মৃত না হয়, তারই জন্য এই আয়োজন। আমিও শ্মশানে শবাসনে বসে' যে সৌন্দর্য্য-কল্পনায় বিভোর থাকবার চেষ্টা করে' এখন যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি—তাকে আরও ধাক্কা দেবার জন্যেই যেন একটা নতুন বিভীষিকা, একটা মর্ম্মভেদী অট্টহাস, আমার সামনে সহসা ফুটে উঠল। কাল আমার এখানে এক পাগল এসে অতিথি হয়েছিল।

৩।৪ বৎসর আগে তাকে দেখেছিলাম, তার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য হয়েছিল। আমাদের স্কুলে সে তখন চাকরী করত—বয়স ২৮।২৯; সৌম্যদর্শন, ধীর, সহৃদয়, শিক্ষিত যুবক। Mixed Mathematics-এ উচ্চ স্থান অধিকার করে' M. A. পাশ করেছিল। সাধারণ বাঙালী ভদ্রসন্তান যতখানি ভদ্র, শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হ'তে পারে সে ছিল তাই। বিবাহ করেছিল, ২।১টি সন্তানও হয়েছিল; তার সঙ্গে স্কুলে এবং বাহিরে অনেকদিন অনেক আলাপ করেছি। স্বভাবটা ছিল কিছু চাপা, অর্থাৎ তর্ক করত না, কিন্তু বুদ্ধি ও রসবোধ এবং একটি পরিমাণ-বোধ ছিল; আর ছিল একটি স্নিগ্ধ সংযম ও সৌজন্য। সাহিত্যপ্রসঙ্গে তার নীরব উৎসাহ ছিল; তাদের পাড়ার একটা Library ও Dramatic Club-এর একজন উৎসাহী সেবক ছিল সে। তার চরিত্রে কোথাও এতটুকু egotism বা aggressiveness ছিল না, অথচ একটি শান্ত উজ্জ্বল বুদ্ধির পরিচয় ছিল। লোকটা জীবনে দারিদ্র্য ও সাংসারিক অশান্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল, কিন্তু কখনও সংযম হারায়নি; প্রকৃতিটা ছিল কোমল, sensitive অথচ reserved। কাজেই একদিন যখন

হঠাৎ শুনলাম, সে কাউকে কিছু না বলে' গৃহত্যাগ করে' গেছে, তখন খুব বিচলিত হয়েছিলাম। পরে যখন ফিরে আসে, তখন পরম্পরায় শুনেছিলাম তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। সে তখন অন্য স্কুলে চাকরী করত। ফিরে এসে আবার সেইখানেই কাজে লেগেছিল। কিন্তু তার কি হ'ল তা' জানতাম না, তাকে আর দেখি নি। তবে শুনেছিলাম, সে আর প্রকৃতিস্থ হয় নি, এবং কাজ করবার শক্তি না থাকায়, সে চাকরী ছেড়ে কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না। তার সম্বন্ধে আমার স্মৃতিপটে এক জায়গায় একটা ক্ষতচিহ্ন বরাবর ছিল।

কাল তখন প্রায় বেলা ৪টা। সমস্ত দিন বৃষ্টি হয়েছে। আমি কলেজ থেকে ফিরে যেই বাসায় এসেছি, অমনি চাকর বল্লে, কে একজন আমায় ডাকছে—ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এসে দেখি, এক অদ্ভুত-বেশী মানুষ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে, একটু ভিতরে ঝুঁকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মূর্ত্তি দেখে আমি কতকটা ভীত, কতকটা স্তম্ভিত। কিন্তু সে মূর্ত্তির কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই, তাকে চিনতে পারলেই আমি যেন আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়ে তাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করব, এম্‌নিভাবে সে আমাকে বল্লে—"চিনতে পারছেন না?" চিনতে পেরে শিউরে উঠলাম। শরীর শীর্ণ—সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এখন কালি হয়ে উঠেছে। চোখে সেই চশমা এখনও আছে। এই প্রথম তার পাগল-মূর্ত্তি দেখলাম। ভয় হ'ল—ভাবনা হ'ল। বাড়ীতে স্থান নেই; একটি আত্মীয়-দম্পতি আসাতে আমার পড়ার ও বসবার ঘরটিকেই শোবার ঘর করতে হয়েছে; তার ওপর সেইদিনই দুই ছেলের অতিশয় সর্দ্দিজ্বর হওয়ায় মনটা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে—একটা ছেলে অঘোর হয়ে পড়ে রয়েছে। এ অবস্থায় এমন একটা মানুষ অতিথি হ'লে একটু বিরক্ত হ'তে হয়; সবচেয়ে বেশী ভয় যে—সে পাগল। বললাম, "আসুন—কি মনে করে?"—"ঢাকায় এলাম, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—আপনার এখানে এসেই উঠলাম"। বললাম—"তাইত, কিন্তু স্থান বড় অল্প, কোথায় রাখি আপনাকে?" অতি সহজ কণ্ঠে, ম্লান প্রসন্ন মুখে আমাকে বল্লে—"একটা-রাত্রির আশ্রয়ও কি হবে না?' দেখলাম, লোকটার বাহিরের আকৃতি যেমনই হোক, ভিতরের মানুষটা সেই একই, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি—কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেলাম। আগেকার সেই পরিচয়ের দিনে তার সঙ্গে ঠিক যে-সম্বন্ধ ছিল আজ সেই সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবু তার এই চেহারা! কৌপীনের চেয়ে কিছু বড় এক টুকরা ধূলি-মলিন কাপড় হাঁটুর খানিক উপর পর্য্যন্ত

কোনও রকমে জড়ানো ; গায়ে অতিশয় মলিন একটা খদ্দরের ফতুয়া ; একটা প্রায় নূতন ছাতা, তার হাতলে বাঁধা একটা এলুমিনামের ঘটির মত ছোট হাঁড়ি ও একজোড়া বহু পুরাতন ছিন্ন জলসিক্ত চটি ; কোমরে একটা দড়ির সঙ্গে পিঠের দুইটি ছোট ও বড় পুটুলি বাঁধা ; মাথার চুল খুব ছোট-করে' ছাঁটা, ছোট ছোট খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ; আর চোখে সেই চশমা। কিন্তু সেই কণ্ঠ, সেই কথা-বলার ভঙ্গি, এবং শীর্ণ মুখে সেই সরল বুদ্ধির আভাস। কেবল ক্লান্তি, অবসাদ ও একটা নিরভিমান নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের ছায়া যেন তার উপর পড়েছে। আমার কাছে সে যে অভ্যর্থনা আশা করেছিল সেটা তার সেই পূর্ব্বজীবন ও পূর্ব্ব পরিচয়ের আশ্বাসে ; কিন্তু যে অভ্যর্থনা সে পেলে, তা'কে তার বর্ত্তমান জীবন ও বর্ত্তমান পরিচয়ের অতি স্বাভাবিক পাওনা মনে করেই সে যেন নিমেষে আত্মসংবরণ করে', কিছুমাত্র বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ না হ'য়ে একজন অপরিচিত ভিক্ষুক পথিকের মত নিজের যাচ্ঞায় নিজেই লজ্জিত হ'য়ে, অতি স্নিগ্ধ বিনীত কণ্ঠে বল্লে, "অন্ততঃ একটা রাত্রির আশ্রয় হবে না ?"

ঘরে এনে বসালাম। বল্লে, "আজ বেলা ১২টায় পৌঁচেছি। আপনার ঠিকানা জিজ্ঞেস করে' একবার ঘুরে গিয়েছি। ভাবলাম, আপনার মেয়েটিকে ডেকে ভিতরে আসব—তার নামটি ভুলে গিয়েছি—কই তাকে ত' দেখছি নে ? কত বড়টি হয়েছে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এখন কোথা থেকে আসছেন ?" —"প্রায় ১০।১২ মাইল আগের এক ষ্টেশনে কাল রাতটা ছিলাম ; দিনে পথ চলি, যেখানে রাত্রি হয় সেই খানে বিশ্রাম করি।" জিজ্ঞাসা করলাম "খাওয়া হয়েছে ?" —"হাঁ, চারটি ছোলা ও গুড় খেয়েছি ; সকালে একবার খাই ; প্রায় কোনো না কোনোখানে ভাত খেতে পাই—রাত্রে আর খাবার দরকার হয় না।" জিজ্ঞাসা করে' জানলাম, মথুরা থেকে এই যাত্রা—বেরিলী, নাইনিতাল, আলমোড়া থেকে শুরু করে' সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল পায়ে হেঁটে তারপর এই বাঙলাদেশ ঘুরছে। এ যাত্রার কোন উদ্দেশ্য নেই—সংসার ও সংসার-চিন্তা বিস্মৃত হবার এই নাকি একমাত্র উপায় ; তা ছাড়া, মাথা গোঁজবার জায়গা নেই, পরের গলগ্রহ হয়ে বেশিদিন থাকবার প্রবৃত্তিও নেই, তা'তে মনের অসুখ (মাথার অসুখ) আরও বাড়ে। তাই, দিনের পর দিন এই অশান্ত পথ-চলা—কোথাও দাঁড়াবার যে স্থান নেই ! এমন কেউ আত্মীয় নেই, যার কাছে আত্মসম্মান বজায় রেখে এই চির-বেকার অবস্থায় থাকা যায়। চাকরী যে কিছুতেই হ'ল না ! কলকাতার এক হোটেলে পাঁচটাকা-

মাইনের চাকরী কিছুদিন করেছিল। মা আছেন, বড় এক ভাই, ছোট এক ভাই আছে। পাঁচ মামা আছে। স্ত্রী থাকে তার মার কাছে, তার মামার বাড়ীতে। কিন্তু এই পাগল তাদের কারো কাছে থাকার চেয়ে এমনি পথে পথে অপরিচিত অনাত্মীয়ের দ্বারে একবেলার জন্য অতিথি হয়ে, যত দিন পারে এই জীবন বহন ক'রে চলেছে। দুই দিন কেন, দুই বেলাও কোথাও থাকা—মানুষকে পীড়িত করা, এই রকম একটা বিশ্বাসে সে কোনোখানে বিশ্রাম করতে পারে না, ক্রমাগত পথ অতিবাহন করছে। পায়ে শক্তি থাক বা না থাক, শরীর অবসন্ন হোক, তবু সে চলেছে। একবেলা আহার জোটে, কখনও বা জোটে না—আশ্রয় কোনখানেই প্রায় জোটে না, তার জন্য কিছুমাত্র দুঃখ নেই ; গভীর রাত্রে, পথের ধারে, গাছতলায়—বা বর্ষার দিনে, কোনো একটা বারোয়ারী ছাউনীর তলায়—সে নিশ্চিন্ত নিদ্রা উপভোগ করে। একমাত্র নেশা বা সুখ—নিত্য-নূতন দেশ, পল্লী, শহর, পাহাড় নদী দেখা, এবং মানব-সঙ্গহীন নির্জ্জনতার উপভোগ। কিন্তু এই নিরন্তর পথচলার পরিশ্রম আর বেশিদিন সে সহ্য করতে পারবে না—এখনই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি যদি বলি, তবে দুই চারিদিন বিশ্রাম করতে পেলে বোধ হয় সে বাঁচে। কিন্তু সে তা' কখনও নিজে বলবে না—মানুষের উপর ওই একটুখানি একদিনের আতিথ্যের দাবী ছাড়া, আর কিছু করবার প্রবৃত্তি বা সাহস তার নেই। আমিও অনেক কারণে তা'কে সে অনুরোধ করতে পারলাম না—না পেরে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, আজ এখনও।

পাগল বেশী কথা কইতে পারে না, তার কষ্ট হয়। Concentration-এর ক্ষমতা তার একেবারেই নেই ; কিন্তু সহজ জ্ঞান পুরা মাত্রায় আছে, মস্তিষ্কের weakness ছাড়া আর কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কিন্তু তার মনের গভীর তলদেশে একটা fixed idea আছে—সেটা তার দৃঢ় ধারণা, সে সম্বন্ধে সে কোন তর্ক করতে নারাজ। যদিও জগতের কারো প্রতি তার কোনো অভিমান বা অভিযোগের লেশমাত্র নেই, তবু যেন মানুষের সম্পর্ককে সে একেবারে যথাসম্ভব বর্জ্জন করতে চায়। অনেক জেরা, অনেক প্রশ্নের দ্বারাও আমি তার সেই মানসিক অবস্থার মূল কারণ সন্ধান করতে পারলাম না। দেখলাম, যুক্তি বা বিচার follow করবার ক্ষমতা আছে—argument করলেও করতে পারে, কিন্তু তা' করবার উৎসাহ বা প্রবৃত্তি নেই। মানুষের সম্বন্ধে যেমন, ভগবান্ সম্বন্ধেও তেমনই তার কোনও বিশেষ কৌতূহল নেই। কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে

তার দুচারটি কথা আমার কানে লেগেছিল। একবার ব'ললে—"আমি সবাইকে সরলভাবে বিশ্বাস করতাম—সকলের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল সেই ধারণাই সত্য বলে' মনে করতাম—পরে জেনেছি সেটা আমারই ভুল, আমারই দোষ।" "ঘুরে বেড়াচ্ছি—দেখি যদি একটাও আমার ধারণামত মানুষ চোখে পড়ে।" "আপনাকে খুব প্রাণখোলা লোক বলে' জানতাম, তাই বড় আহ্লাদ করে' আপনার সঙ্গে দেখা করে' যেতে এলাম।" কিন্তু সে নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছে। সে মানুষ সম্বন্ধে সরল শিশুর মত ধারণা পোষণ করে, তাই কি একদিন হঠাৎ যখন তার চোখের সামনের সেই পর্দ্দা উঠে গেল, সেইদিনই সে পাগল হয়ে গেছে? একটা খুব বড় রকম দাগা সে নিশ্চয় পেয়েছে, তাইতে তার মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কবিকৃতি তার বংশগত—সে কথা সে-ই আমাকে বললে। কিন্তু নিজেকে সে পাগল মনে করে না। সে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, এবং কোথাও মানুষের স্নেহ-সাহায্য পাই নি—এইটিই তার বর্ত্তমান অবস্থার কারণ বলে' তার বিশ্বাস। সব কথা খুব বিশেষ করে' ভেবেও আমার এ সন্দেহ ঘুচল না—মানুষের ব্যবহারেই—খুব নিকট আত্মীয়ের (যেমন স্ত্রীর) কোনও একটা অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তি সহসা দেখতে পেয়ে—তার মাথা খারাপ হয়েছে, না, তার মাথা খারাপ হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনের coldness তাকে এমন করে' গৃহত্যাগী করেছে? হয় ত, বংশগত মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য তার ছিল, তার উপর অনেকদিন অনেক অশান্তি ও চাকরি-বাকরির ভাবনা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেলেছিল। মাথা খারাপ হওয়ার পর, তার সেই পরিচয় পেয়ে কেউ আর তাকে কোন চাকরী দেয় নি, শেষে নিরুপায় হয়ে সে তার জীবনটাকে নিঃশেষ করবার এই অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তার এই মস্তিষ্ক-বিকৃতির আর যত কারণই থাক, আমার মনে হ'ল একটা গভীর হৃদয়গত কারণ আছে। আশ্চর্য্য এই, তার কথার কোনোখানে দুঃখ অভিমান বা অভিযোগের সুর নেই, কোন bitterness, কোনও complaint কারও বিরুদ্ধে নেই। তবুও সে তার স্ত্রীর জন্যও দুঃখিত নয়—তার কাছে সে আর ফিরে যেতে চায় না। একবার তার একটা Govt. service হয়েছিল—ডেরাডুনে Survey of India Office-এ Computor-এর post—আমিই তাকে যেতে দিই নি, prospects বিশেষ কিছু নেই বলে'। আমি তার উল্লেখ করে' বললাম—"সেই চাকরী করলে বোধ হয় আপনার ভালোই হ'ত, এমন অবস্থা হ'ত না।" তাতে বল্লে—"যেটা

যেমন হয় ভালোর জন্যেই হয়—বোধ হয় আমার এই অবস্থাই ভালো।" এ কথা অতি সহজ ভাবেই বল্লে, কোনো শ্লেষ নেই, কোনো দুঃখ নেই। আমি বললাম—"আপনার বোধ হয় এই অবস্থাই ভালো, কিন্তু আপনার স্ত্রীর?" সহজ সরল অবিচলিত বিশ্বাসে উত্তর দিলে "কে জানে, তারও হয় ত ভালো, সবই কি বোঝা যায়?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার এই অবস্থায় কখনও কি হাউ হাউ করে' কাঁদতে ইচ্ছা হয় না?" বল্লে—"বেশী ভাবতে গেলে হয় ত কাঁদতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি কখনও কাঁদি নি।" বেশ প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে, সে সব কথা বলছিল। লক্ষ্য করলাম, তার মুখে ওই এক expression ছাড়া অন্য expression নেই। তার যেন self-pity-ও নেই! তাকে দেখে তার অবস্থা ভেবে আমি আজ এখনও পর্য্যন্ত একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। সেদিন সেই বহুদিন নিরাহারী লোকটিকে যথাসাধ্য জলযোগ করিয়ে একটু পরেই তাকে আহার করালাম। রাত্রে সেই ছিন্ন মলিন চীরধারীকে আমার ছোট্ট গদী-ওয়ালা লোহার খাটখানিতে মশারি খাটিয়ে শোয়ালাম। দেখলাম, সে নির্ব্বিকার। মানুষের কাছে সে একরাত্রির আহার চায়—সে আহার ক্ষুধার উপযুক্ত পরিমাণ হ'লেই হ'ল; তার উপর আর যা কিছু বাহুল্য তা'তে তার কোনও আপত্তিও নেই, আগ্রহও নেই। সাধারণ জীব-ধর্ম্মের একটিমাত্র সংস্কার আছে—ক্ষুৎ-পিপাসা। নিদ্রার জন্য সে কিছুই চায় না—মাথার উপর একটা ছাদেরও প্রয়োজন নেই! এ সবের যে প্রয়োজন নেই—ঠিক তা নয়; সে যে-ভাবে এই কল্পনাতীত কষ্ট সহ্য করছে তা' ভাবলে জ্ঞান থাকে না,—কারণ, কোনো উপায় নেই বলেই, এ সকল প্রয়োজন প্রাণপণে তাকে অস্বীকার করতে হয়েছে। এই স্নেহ-প্রেম-সৌহার্দ্দ্য-বঞ্চিত, মানুষের আত্মীয়তা-ভীত হতভাগ্য, অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিনের পর দিন পথে পথে তার দেহভার বহন করে', ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নিরুদ্বিগ্ন মনে অনবরত চলেছে, কোনোখানে দাঁড়াবার যো নেই; দাঁড়ালেই সংসারের আবেষ্টন, মানুষের সংসর্গ—পরের গলগ্রহ হ'বার ভয়। এমনি করে সে তার যাত্রার শেষ—চরম বিশ্রামের তীর্থ—অন্বেষণ করতে বেরিয়েছে। কোন মাঠের ধারে, রেল-রাস্তার পারে, গাছতলায় তার সকল ক্লান্তি দূর হবে। সে জন্য তার কিছুমাত্র চিন্তা, ভয় বা দুঃখ নেই। সে মানুষ হয়েও মানুষের আশ্রয় পাবার যোগ্য নয়, এই বিশাল জনপদের মধ্যে সে একা; তার অন্য গতি নেই। সে মনে করে, মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যের মধ্যে আত্মীয়তা নেই; তার নিজের জীবিকা নিজে স্বাধীন-ভাবে

অর্জ্জন করবার কোনও উপায় বহু চেষ্টাতেও সে করতে পারলে না, তখন এ-ছাড়া তার গতি নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, তার মনের কল যে কারণেই হোক্ বিগড়েছে বলেই মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে না। এ-অবস্থায় সে কোন কাজকর্ম্ম করবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু সে তা ভাবে না! এটা ঠিক যে, তার মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার পরিচয় পেয়ে কেউ তাকে শুশ্রূষা সান্ত্বনা করে নি—স্নেহ-প্রেমের সেই প্রমাণ সে কোনোখানে পায় নি। তার মাথা দুর্ব্বল এ কথা সে জানে, কিন্তু সহানুভূতি সেবা সাহায্য পেলে সে বোধ হয় কোনোরকমে খাড়া থাকতে পারত। কাজ করবার ক্ষমতা না থাকলেও ইচ্ছা তার খুব আছে; কারণ, সে পরের গলগ্রহ হ'তে চায় না। এ অবস্থায় খুব নিকট আত্মীয়ের নিকট মমতার প্রয়োজন ছিল; তা হ'লে হয়ত সে আবার সুস্থ হ'তেও পারত। কিন্তু তা' হয় নি, বরং আত্মীয়-সমাজে মানব-চরিত্রের যে দিকটা তার জীবনের কোনও একটা সঙ্কট-সময়ে তার মনকে বিপর্য্যস্ত করেছিল—মন বিকল হওয়ার পর সেই পরিচয় আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠায় সে Timon of Athens-এর মত misanthrope হয়ে পড়েছে। তবে তার মস্তিষ্কবিকৃতির প্রমাণ এই যে, সে একজায়গায় থাকতে পারে না, কোনোখানে বসে' থাকলেই তার monomania বৃদ্ধি পায়, সে তাই শিকারের পশুর মত দিগ্‌বিদিকে ছুটে বেড়াতে থাকে। কি ভীষণ নিয়তি!

পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর সে যখন আবার তার সেই ছিন্ন কন্থা গুছিয়ে নিয়ে বর্ষণক্লান্ত অন্ধকার আকাশের তলে তেমনি বিষণ্ণ অথচ প্রশান্তমুখে বেরিয়ে পড়ল—আমি মনশ্চক্ষে দেখতে লাগলাম, তার সামনে শুধু পথ আছে, আশ্রয় নেই; ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের কোনও নিশ্চিত উপায় নেই, তবু তাকে চলতে হবে, তাই চলেছে; এই দুর্ব্বল দেহযষ্টি যতক্ষণ খাড়া থাকে ততক্ষণ সে তার ভাগ্যবিধাতার নিষ্ঠুর তর্জ্জনী-সঞ্চালনে পলায়মান্ মূক মূঢ় পশুর মত মৃত্যুব্যাধের শরনিক্ষেপের প্রতীক্ষা করবে। তখন এই জগৎ, এই জীবন, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য, আমার কাছে শূন্য হ'য়ে গেল; সংসারের যে ঠাট বজায় রেখে আমরা বেঁচে আছি, মনুষ্য-জীবনের যে সুমহান রহস্য চিন্তা করে'—যে-মহিমা ধ্যান করে' আমরা কত কল্পনার স্বপ্ন সৃষ্টি করি, তা' এক নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল। মনে হ'ল—মানুষের আত্মার মহিমা, মানুষের রহস্যময় জীবনের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা—সব অর্থহীন হয়ে পড়ে, যদি মানুষের দেহযন্ত্রের একটা স্নায়ুতন্ত্রী হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায়; কোন সমস্যাই আর থাকে না। ওই দেহই সব, এবং সে দেহ এত দুর্ব্বল!

পাগল নিশ্চিন্ত হ'তে চায়, কোনও চিন্তা তার সহ্য হয় না। জীবন-মৃত্যু, মানুষ-ভগবান্—কোনও তর্ক বা প্রশ্নই তার রুচিকর নয়। তার পকেটে একখানা গীতা আছে, কিন্তু ভগবানের উপর তার নির্ভরতার কোন প্রমাণ পেলাম না। তার মনের কোন্‌খানটা বিকল হয়েছে তা' ঠিক করা শক্ত। আমি আগেই বলেছি, তার মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য ঘটেছে—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আরও গুরুতর কারণ আছে প্রাণে, সেইখানে একটা বড় আঘাত সে পেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তা জানতে পারলাম না। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আত্মীয়ের দুর্ব্যবহার কি তার প্রাণে আঘাত করেছে—তার উত্তরে বল্‌লে "তাদের আর দোষ কি?" বললাম—"সংসার প্রতিপালনের অক্ষমতায় কি জীবনে বড় ধিক্কার বোধ হয়েছে?" তার উত্তরে সে বল্লে—"তা হ'লে ত' আত্মহত্যা করতাম।" এ এক আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য! মনে হয়, হঠাৎ সে সংসার সম্বন্ধে এমন একটা জ্ঞানলাভ করেছে—যে জ্ঞানলাভের পর, শোক, দুঃখ, ক্ষোভ-অভিমানের আর কোনো কারণ থাকে না। তার যে অন্যরকম ধারণা ছিল তার জন্যে সে-ই দায়ী, সেটা তারি ভ্রম। কিন্তু সংসারের এই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তির অন্তরালে যে একটা অপ্রত্যক্ষ—সত্য সুন্দর প্রেমময়—কিছু বা কেউ আছে, এই মায়া-প্রপঞ্চের উর্দ্ধে একটা নিত্যবস্তু কিছু আছে, সে বিশ্বাসও তার নেই; তাই সে মানুষের সমাজও যেমন ত্যাগ করেছে, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়তেও তার প্রবৃত্তি নেই। কাজেই এই পাগলের মধ্যে আমি আসল নাস্তিককে দেখলাম। যারা তথাকথিত নাস্তিক, অথচ কামনা বাসনা সবই আছে—নিজের মত করে জীবন যাপন করে, তারা সত্যিকার নাস্তিক নয়, তাদেরও একটা জিনিষ অর্থাৎ নিজের অহংটির উপর বিশ্বাস আছে। এ একেবারে নাস্তিক, তার কারণ এর মনোধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়েছে। 'Cogito ergo sum'—I think therefore I am—এই সূত্র অনুসারে এ-ব্যক্তির কথা যেন এই—I do not think, therefore I am not—অন্ততঃ এরি সাধনা করে' সে আত্মবিলোপ বা নির্ব্বাণ লাভ করতে চায়। পাগল বটে, ব্যাধিগ্রস্ত বটে, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যাধির ফল যদি স্বাস্থ্যের চেয়ে সত্য হয়, তা'হলে ব্যাধিও সার্থক। সংসারে যে প্রকাণ্ড concert-সঙ্গীত জগৎ-যন্ত্রে বাঁধা রয়েছে, তার সঙ্গে একটা মানুষের প্রাণ-যন্ত্র ঐক্যতান রক্ষা করতে পারে নি—তাই বলে' সে কি সত্যভ্রষ্ট হয়েছে?—না, বরং এই কথাই আরও যথার্থ যে, দলবদ্ধ পাগলামী থেকে একটা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আবার, যে-মিথ্যার মাধুরীকে আমরা 'রস' বলি, যার নেশায় মশগুল

থাকতে পারাকেই আমরা supreme বোধশক্তি বা 'রসিকতা' বলে' উল্লেখ করি—সেই মিথ্যাকে যদি কেউ হঠাৎ ধরে' ফেলে, এই রূপোজ্জ্বল সৃষ্টির মধ্যে যদি একটা অন্ধকার শূন্যময় বিভীষিকা হঠাৎ কারো চক্ষে ধরা পড়ে, তবেই সে পাগল হয়ে যায় বটে ; কিন্তু সেই পাগল হওয়ার কারণ মিথ্যার মোহ নয়, সত্যেরই প্রচণ্ড আঘাত, যা মানুষের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারে না—এ কথা কি স্বীকার করা ভুল ?

তথাপি এ পাগলকে দেখে মনে হ'ল—যে উন্মাদকে আমরা দেহের বা মস্তিষ্ক-যন্ত্রের পীড়া বলি, এ ঠিক তা' নয়, এটা যেন মনের ততটা নয়—যতটা প্রাণের। এই জন্যই সাধারণ পাগলকে দেখে আমাদের যে ভাব হয়, একে দেখে তার চেয়ে ঢের বেশী আঘাত পাই। আমার মনে হ'ল—ওর মধ্যে কোনও ব্যক্তিবিশেষের দেহ নয়, সকল মানবত্মার একটা অতি সহজ-সম্ভব দুর্গতির অবস্থা ধরা পড়েছে। এ রকম পাগলকে শুধু lunatic বলে', একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কারণ, এদের একটা ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে, এদের অহং রয়েছে—এরা একেবারে কেন্দ্রচ্যুত হয়নি, তা যদি হ'ত তা হলে পাগল পশুর মত পাগল হ'য়ে যেত। অতএব এদের মধ্যে আমাদেরই 'মন' বা 'আত্মা' বা 'Ego'— যাই ব'ল, তারি একটা অবস্থান্তর মাত্র আমরা লক্ষ্য করি ; এবং তার থেকে আমরা আমাদেরই একটা সম্ভব অবস্থার পরিচয় পাই। এ জন্যে এদের প্রতি, শুধু pity নয়—একটা spiritual sympathy-র উদ্রেক হয়। এ ব্যক্তি যে এত কষ্ট সহ্য করছে—অথচ আত্মহত্যা করবে না—তার কারণ কি ? অন্ততঃ এ ধরণের পাগল তা' করবে না। যারা সহজ অবস্থায় আত্মহত্যা করে তাদের সম্বন্ধে ডাক্তারদের মত এই যে, তাদের temporary insanity হয়। সেখানে insanity-র অর্থ ঠিক উন্মাদ নয়—একটা abnormal অবস্থা মাত্র। সে অবস্থা আর কিছু নয়,—মানুষের অহং-সংস্কার—Egoism—হঠাৎ বড় তীব্র হয়ে ওঠে, খুব বড় একটা দুঃখ বা বিপদের reaction-এ তার আত্মাভিমান bursting point-এ ওঠে, তাই সে আত্মহত্যা করে' সেই অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। যারা সে অবস্থায় পাগল হয়, তাদের অহং-সংস্কার অভিভূত হয়ে পড়ে, bursting point-এ পৌঁছায় না ; তারা যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়—মর্ম্মগ্রন্থিতে টান না পড়ে', সেটা শিথিল হয়ে যায় ; সংসারের যে-মূর্ত্তি তারা দেখে, তাতে তাদের অহং উদ্ধত না হ'য়ে ভীতি-বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। তাদের চোখে সংসারের সহাস্য বদন শুধুই ভ্রূকুটি-কুটিল হ'য়ে ওঠে না—তারা যেন এই কুলটা নটীর অভিনয়-নৈপুণ্য ভেদ করে' তার নানা

হাবভাবের অন্তরালে একটা প্রস্তর-কঠিন ঔদাসীন্য, এতটা বিরাট্ শূন্য গহ্বরের অন্ধকার দেখতে পায়—তাই দেখে তাদের অহং মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, তারা আর মানুষের সঙ্গে মানুষের মত, আশা ভরসা স্নেহ প্রেমের খেলায় যোগ দিতে পারে না। আবার তাদের এই বৈরাগ্য সন্ন্যাস নয়—সে কথা আগেই বলেছি; কারণ, তাদের সেই self বা ego মূর্চ্ছিত, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে'—সংসার ত্যাগ করে' ভগবানের নামে অহং-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও তারা করে না। এই যে স্তম্ভিত 'অহং'—এরই পরিচয় পেলাম এই পাগলের মধ্যে। এর অবস্থা দেখে আমার নিজেরই একটা পুরাণো কল্পনা সত্য বলে মনে হচ্ছে। মানুষের প্রাণের ধর্ম্ম যা' কিছু—passion, emotion, sentiment—যে বাসনা কামনা বা তৃষ্ণার ফল, তার মূলে আছে মানুষের মনের development-অনুযায়ী একটা সৌন্দর্য্যভোগ বা উপভোগের নেশা। এই নেশা কারো স্থূল, কারো বা সূক্ষ্ম। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সত্যের কোনও সম্বন্ধ নেই—বরং ঠিক উল্টো, অর্থাৎ মিথ্যার কুহেলিকাই একে রঙিন করে তোলে। এর সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যার বিচার বা তর্ক যারা তোলে তারাই বেরসিক। সংসারে বাঁচতে হ'লে রসিক হ'তে হবে—বাস্তব জীবনরস-রসিক অথবা কল্পনারস-রসিক; সাধারণ মানুষ প্রথম শ্রেণীর, শিল্পীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই মিথ্যার অঞ্জন চোখে না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রেমিক রসিক বলবে—এই আনন্দ, এই রসই সত্য—তা' সে যার থেকেই পাই না কেন। এই রস যে বস্তু নিংড়ে আমরা আদায় করি, তা সত্য কি মিথ্যা, সে বিচার যে করে সে মূর্খ; কারণ রস বা আনন্দই সত্য, তাকে পেলেই হ'ল—কোথা থেকে পাই, সে সন্ধানের প্রয়োজন কি? বিড়াল কাঠের বিড়াল হ'লেও ক্ষতি কি?—ইঁদুর ধরতে পারলেই হ'ল। কিন্তু হঠাৎ যদি আত্মার নিশীথ-রাত্রে কারো ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে যদি হঠাৎ প্রকৃতির নেপথ্য-গৃহে তার অসম্বৃত অবস্থার স্বরূপ হঠাৎ দেখে ফেলে—সেই ভীষণ সত্যের আভাস যদি কোন রকমে পেয়ে বসে—তবে আর রক্ষা নেই, সে উন্মাদ হয়ে যাবে। এই পাগলের তাই হয়েছে। সে বলেছিল—"যে সরল ধারণা ও বিশ্বাসের বশে সংসারের সঙ্গে নিজের একটা সত্যকার সম্পর্ক পাতিয়ে তারই জোরে এতদিন নিঃশঙ্কচিত্তে কাটাচ্ছিলাম—পরে হঠাৎ দেখলাম, সেটা আমার ভুল।" সে মানুষের দোষ দিলে না, তার ভাবটা—সে যেন নিজেই দোষী; এ সংসারে তার স্থান নেই, সে এখানে বাস করার অনুপযুক্ত। এ কি ভীষণ attitude! সমস্ত জগৎ একদিকে, আর একদিকে সে একা! জগতের

দিক্‌টাকে বিশ্বাস করতে সে আর পারে না, কিন্তু তার প্রতি কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই; কারণ সে যে-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে সেটা তারই সত্য, আর কারো উপরে সেটাকে সে চাপাতে চায় না। তবু সংসার-সম্বন্ধে মানুষ-সম্বন্ধে, তার সেই পূর্ব্বেকার ধারণা সে যেন এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি—সেই ধারণার আলেয়া এখনও তাকে দিক্‌ভ্রান্ত করছে—যদিও, সে যে আলেয়াই, তা' সে জানে। অতএব দেখা যাক্—এই মানুষটা এত সহজে পাগল হয়ে গেল, আর তুমি আমি তা' হইনে—এর কারণ কি? এর কারণ এই যে, জগতের এই প্রকাণ্ড মিথ্যাকে পরিপাক করবার বা রসরূপে উপভোগ করবার শক্তি, সাধারণ মানুষের রক্তে বা স্নায়ুতে কতক পরিমাণে আছে। এই মিথ্যার মোহে—এই সুন্দরকেই সত্য মনে করে' তারই আবেশে প্রাণটাকে চাঙ্গা করে রাখবার প্রবৃত্তি যার যত বেশী, সে তত sane—তাকেই সহজ স্বাস্থ্য বা sanity বলে। এর থেকে যে বঞ্চিত হয়েছে—যার রক্তে বা স্নায়ুরসে এই মিথ্যাকে হজম করবার শক্তি কমে যায়, এই ঘূর্ণী-নাচে যে স্থির থাকতে পারে না—সেই পাগল হয়ে যায়। যে স্নেহ-মমতা, বা সত্যকার সরল ব্যবহার সে আশা করেছিল তা' সে পায় নি, তার বিশ্বাস-ভঙ্গ হয়েছে; আমাদের তা' হয় নি, আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সেই স্নেহ-মমতার আদান-প্রদান করে থাকি—তার কারণ, আমরা ইচ্ছে ক'রেই এই সব agreeable hypocrisies of life বাঁচিয়ে রাখতে চাই—কতকটা কালা এবং কতকটা অন্ধ হবার যে ক্ষমতা, অর্থাৎ শুষ্ক অস্থিতেও রসাস্বাদন করবার রসিকতা আমাদের আছে; তাই আমরা টিঁকে গেলাম; আর এ লোকটা পাগল হয়ে গেল। Sanity ও Insanity-র তত্ত্ব বুঝে নাও।

কিন্তু আমি যে এতক্ষণ এই তত্ত্বালোচনা করলাম—এ শুধু আসল ব্যথাটাকে একটু ভুলে থাকবার জন্যে। আমি সেই মানুষটাকে দেখেছি—তার ভীষণ নিয়তি, তার কল্পনাতীত দুরবস্থা আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে। আমি যে সেই মানুষটাকে পাগল ব'লেই ভয় করেছি, তাকে মানুষহিসেবে স্নেহ করতে পারি নি; সে যখন অতিশয় ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে আমার দুয়ারে এসেছিল, এবং—তার মনে যাই থাক—তার দেহ যে একটু দয়ার ভিখারী হয়েছিল; সে যে অন্ততঃ কয়েকটা দিন তার জীবনের বোঝাটা নাবিয়ে একটু বিশ্রাম করতে চেয়েছিল—কিন্তু সে দাবী সে করেনি, সে সাহসই তার হয় নি—অথচ আমি তাকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে অসম্মত হলাম না, এতে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি। সে আর ফিরে আসবে

না জানি ; যদি ফিরে আসে তা হ'লেও হয়ত' তাকে আমি বেশীদিন আশ্রয় দিতে পারব না—আমার প্রাণ যতই আকুল হয়ে উঠুক। আমার situation-এর এই গ্লানি, প্রাণের এই দুর্ব্বলতা বা cowardice আমাকে দংশন করছে। কোনোখানে মাথা রাখবার স্থান নেই বলে' সেই যে পথিক চলেছে ; যার রাতের আশ্রয় নেই, দিনের অন্ন নেই, ক্ষুধার তাড়না অগ্রাহ্য করে' ক্লান্ত দেহে যে দুর্গম পথ অতিবাহন করে চলেছে ; মানুষের কাছ থেকে যে কিছুই প্রত্যাশা করে না, তবু অতিশয় সঙ্কোচের সহিত দুটি ক্ষুধার অন্ন যাকে চাইতেই হয়, না পেলেও কোনও অভিযোগ যার নেই ; যার মুখে স্বপ্ন-সঞ্চরণকারীর মত একটা vacant expression—একটি উদাস প্রশান্ত বিষাদ-মলিন নিরীহতা,—সেই পাগলকে দেখে পর্য্যন্ত, তার অবস্থা চিন্তা করে' আমি আজও বড় অশান্তি ভোগ করছি—সব যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে, আমার বুকের ওপর একটা দুঃস্বপ্ন চেপে রয়েছে ; আমি যেন আর পৃথিবীতে বাস করছিনে—হাস্য-অশ্রুহীন এক মন্দান্ধকার প্রেতপুরীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার ঘরের মধ্যে কোথাও যেন একটা কঙ্কাল লুকিয়ে রয়েছে—একটু অন্যমনস্ক হবার যো নেই, সকল কাজ সকল ভাবনার মধ্যে জেগে রয়েছে। একি শাস্তি আমার! এই অবস্থাতেও আমার মত পূর্ব্ব-বন্ধুর নিকটে কোনও কিছু যাচ্ঞা করার যে কি সঙ্কোচ তার দেখলাম—তা ভুলতে পারছি নে। স্নান করবার সময় তার পুঁটুলি থেকে একটা তেলের (সর্ষের তেল) শিশি বার করে' স্বল্পাবশিষ্ট তেল অতি সন্তর্পণে হাতের উপর একটুখানি করে' ঢালছে দেখে আমি বললাম—"শিশিটা ভর্ত্তি করে নিন না"। সে বল্‌লে "হাঁ কথাটা মন্দ নয়, তা হ'লে আরও ক'টা দিন যাবে ; কিন্তু খুব বেশী দেবেন না—পড়ে' নষ্ট হবে।" শিশিটা যখন ভর্ত্তি করে দিলাম—বল্লে, "এ যে অনেক দিয়েছেন, আর বোধ হয় দরকারই হবে না, এতেই আমার পথ শেষ হবে"। 'পথ শেষ হবে' কথাটা অতি সহজ ভাবেই বল্লে, ওর ভেতরে যে ব্যঙ্গার্থ প্রকাশ পেলে, সেদিকে যেন তার খেয়ালই নেই—আমার বুকটা কিন্তু ছ্যাঁৎ করে' উঠল।

যাক্, তার কথা আর বলব না। এ যেন আমারই monomania-র লক্ষণ। আমার ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন পাগল আছে তাকে যেন এই প্রকট পাগল কতকটা জাগিয়ে দিয়ে গেছে। জীবনের যে দিক্‌টাকে আমি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি তারই এক মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ আমার সামনে দেখা দিয়ে চলে' গেল—প্রাচীন মিশরবাসীর উৎসবশালায়, নৃত্যগীত পানভোজনের ফাঁকে কে একজন সামনে দিয়ে একটা

'মমি' নিয়ে গেল। কিন্তু তবু আমি জানি, এবং এখনও আমার বিশ্বাস —জীবনের বা জগতের মিথ্যাটাই সুন্দর, মিথ্যাটাই পরম রসবৎ। যার প্রাণ সেই মিথ্যাকে ধারণ করতে পারে, যার দৃষ্টিকে কোনও বিভীষিকাই বিচলিত করতে পারে না, যার বুদ্ধি সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে—সেই জয়ী; সে প্রকৃতির মনোমোহন মিথ্যা-চাতুরীকে পরাস্ত করে', মৃত্যুরূপ মিথ্যাকে মন্থন করে', সত্যানন্দের অমৃত আস্বাদন করে। উৎকৃষ্ট কবি-শক্তির প্রমাণ এইখানে। যাদের ego সর্ব্বগ্রাসী তারাই কবি; যাদের ego সর্ব্বত্যাগী তারাই পাগল। এই দুই extreme-ই সত্য—মানুষের শক্তির তারতম্য অনুসারে এই দুই extreme-এর মধ্যে অনেক মধ্য-attitude আছে। সাধারণ মানুষ সেই মধ্যভূমিতে বাস করে। কিন্তু অপর extreme, যাকে সর্ব্বত্যাগী ego বলেছি, সেই নাস্তিক পাগলের স্থান এ সংসারে নেই। তাকেও সত্য বলেছি বটে, কিন্তু সে সত্যের আভাসেই যখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি, তখন তার সম্বন্ধে কোনও বিচার করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু 'extremes meet'—একথাও মনে রাখতে হবে।

আমি যে পাগলের কথা এতক্ষণ ধরে' লিখ্‌লাম—সে সংসার ত্যাগ করেছে, তার কারণ, তার যে সত্য-উপলব্ধি সেটা ভান নয়; সংসারকে সে যে-চক্ষে দেখেছে তার পর আর তার 'রসিক' হওয়া চলে না। আগেই বলেছি—হয় 'রসিক' হও, নয় ত' এই রকম সর্ব্বত্যাগী নাস্তিক পাগল হও—এ ছাড়া আর তৃতীয় পন্থা নেই, যদি থাকে ত' সে ভণ্ডামি। এইবার সাহিত্যের কথা ধর। সাহিত্যের Idealism ও Realism, এই দুইয়েরই মূলে আছে রসবোধ—এইখানে আসল সাহিত্য-বস্তুর পরিচয়। বাস্তবকে রসোপযোগী করে সাজিয়ে নিতে না পারলে সাহিত্য বা কাব্য হয় না, তা সে Realistic-ই হোক, আর Idealistic-ই হোক। উৎকট Realist যে, তাকেও এই রসের সৃষ্টি করতে হবে, অর্থাৎ জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তার নেশা চাই, তা সে মদের নেশাই হোক, আর আফিম বা গাঁজার নেশাই হোক। যার সে নেশা নেই সে কবি বা সাহিত্যিক নয়। কিন্তু আমাদের দেশের একদল বলেন, সাহিত্যে এই নেশাই হচ্ছে ভণ্ডামি, সাদা চোখের নিরাবরণ সত্যকেই সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—অর্থাৎ সোণার বাটি গড়তে হবে পাথর দিয়ে! এটা যে বেরসিকের আক্রোশ, তা' এদের সাহিত্য-সৃষ্টির নমুনা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যদি 'রস'কে অস্বীকার করতে চাও, আর তা' যদি একটা sincere

attitude হয়, তবে ওই পাগলের মত সাহিত্যকেও অস্বীকার করতে হবে; জোর করে' সাহিত্যকে আঁকড়ে পড়ে' থাকলে রসিকতার পরিচয় দেওয়া ত হবেই না—ওই পাগলের যে সত্যনিষ্ঠা, তা'ও প্রমাণ করা হবে না। কারণ, সাহিত্য-সৃষ্টি করতে হ'লে উৎকৃষ্ট রসবোধ চাই। উৎকৃষ্ট রসবোধ মানে Idealism-ই নয়; রসবোধ জিনিষটা একই faculty—Realism ও Idealism তার দুইটা ভঙ্গি মাত্র। এই রসবোধের একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, জীবনকে যে ভাবেই দেখ তাতে একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকবে; সে জগৎ Real হোক বা Ideal হোক, তার কল্পনায় একটা wholeness ও steadiness থাকা চাই, নইলে তা পাগলের প্রলাপ হয়, অথবা ইতরের দাঁতখিঁচুনি হয়—সাহিত্য হয় না। Idealist খণ্ডকে কল্পনায় পূর্ণ করে' দেখে, তাতেই তার রস বা নেশা জাগে; Realist খণ্ড অসম্পূর্ণকেই তার যত-কিছু ধূলো-কালি-ময়লা সমেত এমন একটা pattern-এ সাজিয়ে তোলে যে তাইতেই রসোদ্রেক হয়।—যে যে-ভাবেই জগতকে দেখুক, তার দেখার একটা শক্তি আছে—এই দৃষ্টিই সেই রসিকতার কারণ, যাকে আমি sanity বলেছি। যদি কোন রচনায় দেখা যায় যে, লেখকের এই দৃষ্টিই নেই, সে—কল্পনার চোখেই হোক, আর সাক্ষাৎ পরিচয়ের চোখেই হোক—কিছুই দেখেনি, কেবল নিজের মনের একটা বেরসিক-সুলভ আক্রোশের বশে সংসারের অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার-গুলোকেও অস্বাভাবিক করে' দেখছে—অথবা নিজের ব্যক্তিগত ব্যাধির বশে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করছে, তবে তাকে তুমি কোন্ শ্রেণীতে ফেলবে? যে তার নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে নরদেহে ছাগমুণ্ড বা ছাগদেহে নরমুণ্ড বসিয়ে, অর্থাৎ অতিশয় অস্বাভাবিক চরিত্র খাড়া করে' গল্প লেখে—আমি জগৎ-সম্বন্ধে যে দুইটা মাত্র সত্যকার attitude-এর কথা বলেছি—তার তা'হলে কোন্‌টা? কোনটাই নয়; তার মানে সে পাগলও নয়, সহজও নয়; তবে সে কি? সাহিত্যিক হিসাবে সে কিছুই নয়—সে একটা উপদ্রব মাত্র। সম্প্রতি কোন এক মাসিকে আমি একটা গল্প পড়লাম—তার লেখক অতি-আধুনিক কথাশিল্পী-মহলে একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন; কিন্তু তিনি তাঁর এই ছোট গল্পটিতে একটি নারীর চরিত্র ও জীবনেতিহাস যে রকম অস্বাভাবিক করে তুলেছেন—তা'তে তাঁর দৃষ্টি বা সৃষ্টিশক্তির পরিচয় ত নেই-ই, আছে একটা hectic fever-এর দাঁতখিঁচুনি। এ সব লেখকেরা মনে করে, এরই নাম সাহিত্যের Realism। যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, এ কাহিনী বা চরিত্র 'সত্য', তা হ'লেই বা কি?—এরা সাহিত্য-রচনা

করছে, না socialism-এর propaganda করছে? এই প্রসঙ্গে শৈলজানন্দের 'নারীমেধ' গল্পটা স্মরণ কর। বীভৎসতা যদি Realism হয়, তবে সে Realism-এর চরম তাতে আছে। কিন্তু লেখকের এমনি রসবোধ যে, তার কোনখানটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কল্পনার এই sanity-ই রসবোধ। 'নারীমেধে'র সেই নিষ্ঠুর Realism রসবৎ হয়ে উঠেছে—অতি ভীষণ tragedy-ও যে কারণে আমাদের প্রাণে রস-সঞ্চার করে, সেখানেও সেই কারণে এই 'বীভৎস' আর বীভৎস নেই—সেটা 'রস' হয়ে উঠেছে। কারণ কি? কারণ—'নারীমেধে'র লেখক কবি—propagandist নয়; Real-এর অতি কঠিন, অতি তীক্ষ্ণ ইস্পাত-ফলক তার কবিহৃদয়কে বিদ্ধ করে' রসধারা উৎসারিত করেছে; তার যত কিছু ভীষণতা ও বীভৎসতা তার রসবোধকে অভিভূত করতে পারে নি। গল্প-বস্তুটি যখন লেখকের সৃষ্টি-কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল—সেই মুহূর্ত্তেই লেখকের attitude ঠিক হয়ে গিয়েছিল; সে attitude রসিকের—দাঁতখিঁচুনির attitude নয়। একটা উপমা দেবো। রসের 'রসুই' করতে যে জানে, তার হাতে কচুর ডাঁটাও রসনা-তৃপ্তিকর হয়—যে তা' জানে না, সে ও-জিনিষকে এমন করে' তুলবে, যে খেতে গেলেই গাল গলা ফুলে উঠবে।

এবারের চিঠি বিশ্রী রকমের বড় হয়ে গেল—তুমি ভেগে যাবে বোধ হয়? চিঠি পেতে দেরী হ'লে বুঝব তুমি ভেগে পড়বার মতলব করছ। আমার স্নেহালিঙ্গন নাও। ইতি—

আগষ্ট, ১৯৩০

দুঃখের স্বরূপ

সমাজে দুর্ব্বল দুঃস্থ অসহায়ের সংখ্যা কোনকালেই কম নয়। কিন্তু কোনকালেই এইরূপ দারিদ্র্য বা দৈহিক দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই। প্রেমিক যথাসাধ্য পরোপকার করেন, কিন্তু 'কর্ম্মদোষাৎ দরিদ্রতা' বা 'স্বকর্ম্মফলভুক্‌-পুমান্‌'—বলিয়া জ্ঞানী সে আশা ছাড়িয়া দেন। এইরূপ দুঃখকে মানুষ কৃপার চক্ষেই দেখে, ইহাকেই সত্য বা মহান্‌ বলিয়া মনে করিতে পারে না। এইরূপ দুর্ব্বল দুঃস্থ জনগণের সেবা করিয়া সক্ষম সুস্থ ব্যক্তির মনুষ্যত্ববিকাশের সুবিধা হয়—সমাজের দিক্‌ দিয়া ইহাই এইরূপ দুঃখের একমাত্র সার্থকতা।

(যাঁহারা ভাবুক ও চিন্তাশীল, মনুষ্য-চরিত্র এবং মনুষ্য-ভাগ্যের সত্যনির্ণয় করিতে যাঁহারা উৎসুক—তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের নিদান অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা জানেন, কেহ কাহারও সত্যকার দুঃখের মূলোৎপাটন করিতে পারে না। মানুষের দুঃখের মূল বহুদূরপ্রসারী, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ মানুষের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। হিন্দু তাহাকে অতি সংক্ষেপে 'কর্ম্মফল' বলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন—'Character is destiny'।) কথাটা গভীরভাবে অনুধাবন করিলে প্রতীতি হইবে যে, ব্যষ্টি বা সমষ্টি—যে ভাবেই ধরা হউক, দুঃখের জন্য দুঃখীরা নিজেই দায়ী, দুঃখ মানুষের গৌরবের নয়—কলঙ্কের কথা। যে শক্তিহীন সেই দুঃখী। ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাকে পাপ বলে তাহার মূলেও শক্তিহীনতা। পথিপার্শ্বে কোন কুষ্ঠরোগীকে দেখিলে সুস্থ মানুষের মনে যেমন বিভীষিকা উপস্থিত হয়—কৃপার উদ্রেক যতই হউক, তেমনই, নিরতিশয় দারিদ্র্য দেখিলে মানুষের মনে একটা প্রবল কুণ্ঠার উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। যে-প্রেমিক এই দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হ'ন, তাঁহার অন্তরে একটা কঠিন বীর্য্য ও পৌরুষের প্রয়োজন আছে; দয়ায় অভিভূত হইয়া কেবল ক্রন্দন করিলেই হয় না, তাহাতে নিজেও দয়ার পাত্র হইতে হয়। যেখানে এই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টায় পৌরুষ ও বীর্য্যের পরিচয় পাই সেইখানেই আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করি, দুঃস্থের দুঃখকে প্রণাম করি না।

এই দারিদ্র্য-দুঃখকে দুঃখহিসাবেই মহিমান্বিত করিবার যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহতে চিন্তাশক্তির দারিদ্র্যই প্রকাশ পায়। সকল মানবীয় দুঃখের কারণই অভাব—কামনার অপরিতৃপ্তি। এই কামনার জন্য মানুষ দায়ী নয়, কারণ কামনা স্বভাবজ। কিন্তু কামনার পরিতৃপ্তির অভাবে, অর্থাৎ সুখের লালসায়, মানুষ যে পাপ করে—সে-পাপ সমর্থন-যোগ্য, তাহা ভগবানের পাপ—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী ভগবান্ কাঁদিতেছেন'—ইত্যাকার উক্তি মিথ্যা বলিয়াই কুৎসিত। মানুষের মধ্যে যেখানে শক্তি দেখি সেখানেই ভগবান্‌কে দেখি। আব্রহ্মস্তম্বে চিদ্-রূপী ভগবান্ হয়ত আছেন, কিন্তু তাহা ব্যাবহারিক সত্য নয়—সে জ্ঞানের তুরীয় অবস্থার কথা। যে-শক্তিকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া মনে করিতে পারি—সে শক্তি ক্ষুধার শক্তি নয়, সেই ক্ষুধাকে জয় করিবার জন্য মানুষ যখন অসাধ্য-সাধন করে, তখনই বুঝি তাহার মধ্যে ভগবান্ রহিয়াছেন। মানুষ-ভগবান্ ক্ষুন্নিবৃত্তি করে দুই উপায়ে—হয় ক্ষুধাকে নষ্ট করিয়া, নয় মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিয়া ক্ষুধার খাদ্য আহরণ করিয়া। এই ক্ষুধার তাড়নায় অক্ষম অসহায় জীব যখন শৃগাল কুক্কুরের মত অমেধ্য-ভোজন করে—উপুড় হইয়া নর্দ্দমার পঙ্ক-জল পান করে, তখন সেই ক্ষুধার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে মানুষের যে কত বড় অপমান হয়, তাহা মানুষমাত্রেই বুঝিতে পারে।

দুঃখ যে মানুষের পরাজয়ের প্রমাণ, মানুষ তাহা অন্তরের অন্তরেই জানে। যে-কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই সেই কামনার ব্যথায় আকুল হওয়া পুরুষের ধর্ম্ম নয়। কামনা যখন মানুষকে অভিভূত করে তখন সে পশু। অতি সহজলভ্য কদর্য্য বস্তু যখন তাহার প্রেয় হয়, এবং তাহাকেই উপাদেয় বলিয়া যখন সে শ্রেয়ঃ-বস্তুর বিরুদ্ধে আস্ফালন করে তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি নিজেই মেরুদণ্ডহীন। সে যখন বিষ্ঠাকে চন্দন বলিয়া তাহাকে ভোগ করিতে চায়, তখন বুঝিতে হইবে যে; চন্দন আহরণ করিবার শক্তি তাহার নাই, এবং বিষ্ঠা তাহার বমনোদ্রেক করে না। বিষ্ঠা ও চন্দন দুইটাকেই সমজ্ঞানে পরিত্যাগ করা, এবং চন্দনের পরিবর্ত্তে বিষ্ঠাতেই তৃপ্ত থাকা—এ দুইটি প্রবৃত্তি এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক্।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' এই শ্রুতিবাক্য অতিশয় সত্য, কারণ যে দিক্ দিয়াই দেখি ওই বাক্যই চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়। মানুষের সকল ক্ষুধার অন্তরালে একটা গভীরতর ক্ষুধা আছে—সেইখানেই আসল অভাব, আসল দুঃখ। এই দুঃখ মানুষের মনুষ্যত্বের নিদান। এইজন্যই আর সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও

কোথায় যেন একটা অভাব থাকিয়া যায়। অবশ্য মানুষ প্রথমে অন্যান্য দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টাই করিবে, সেই চেষ্টার ভিতর দিয়াই মানুষ এই পরম দুঃখের সন্ধান পায়—এই এক কারণেই আর সকল দুঃখ সত্য ও সার্থক। যাহা পাইলে এই শ্রেষ্ঠ দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহাকেই এইখানে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। নামে কিছুই যায় আসে না। ক্ষুধা সত্য হইলে মানুষ সত্যকার বস্তুকেই চায়, যাহা-তাহা-দ্বারা সে-অভাব পূরণ করিতে পারে না। কিন্তু, সেই বস্তুর পরিবর্ত্তে আর কিছুকে গ্রহণ করিব না—এরূপ প্রতিজ্ঞা করা বলহীনের কাজ নয়, এবং তাহা লাভ করিতে হইলে যে-তপস্যার প্রয়োজন তাহা 'বন্দী ভগবান্'কে আর্ত্তনাদ করাইলেই সম্পন্ন হয় না। এই ক্ষুধা কামনারই পরিণাম—দেহের ক্ষেত্রেই ইহার অঙ্কুরোদ্গম হয়, এজন্য কাম বা দেহ বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঘৃণার বস্তু নয়। কিন্তু সে কামনার সঙ্গে যদি শক্তি না থাকে তবে ক্ষুধার চরম রূপটি ধরা পড়ে না। কামনাকে সত্যের পথে জয়যুক্ত করিবার মত হৃদয়বল যদি না থাকে, তবে সে কামনা প্রাণের কামনা নয়, দেহের ব্যাধি মাত্র।

যে-দুঃখ দেহগত তাহা সার্ব্বজনীন, অতএব তাহাই পরম ও চরম দুঃখ,—এ যুক্তি অগ্রাহ্য। (দুঃখ যেমন আছে, তেমনই, দুঃখকে অস্বীকার করিবার শক্তিও আছে, এই শক্তি সত্য-হিসাবে আরও অনেক বড়। সত্যকে যে আমরা সুন্দর বলিয়া জানি, শিব ও শান্ত বলিয়াই বুঝি—এই শক্তিই তাহার মূল। যাহা ব্যাবহারিক সত্য অতএব অতিশয় প্রকট—সে দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু জানে না; পশুর দুঃখ আছে, কিন্তু দুঃখ পাওয়ার দুঃখ নাই—দুঃখকে তাহার স্বীকার করিতেই হয়। মানুষ স্বীকার করে না বলিয়াই দুঃখ তাহাকে বড় করে।) এই দুঃখ তাহার নিকট বড় হইয়া উঠে যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই দুঃখকে সে মানিয়া লইতে পারে না। সে কারণ আর কিছুই নয়—মানুষ আনন্দ চায়, আত্মাকে ভালবাসে। দুঃখ যদি সার্ব্বজনীন হয়, তবে এই আনন্দও সার্ব্বজনীন। দুঃখের ব্যাবহারিক প্রকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকেই চরম ও পরম সত্য মনে করা একটি মহৎ ভ্রম। এই আনন্দ প্রমাণ করিবার ছলে একজন রসিক মনীষী একটি বড় সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"দেখ নাই কি যে মাঘ মাসের শীতে-বৃষ্টিতে ভিজিয়া কম্পমান, দরিদ্র গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান 'বতা দে সখী কৌন গলি গিয়া মেরে শ্যাম' গীত গাহিয়া থাকে; 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'—গীত ত সে গাহে না।"

(দুঃখের সঙ্গে সুখের বিরোধ আছে বটে, কিন্তু আনন্দের বিরোধ নাই।

দুঃখ সত্ত্বেও মানুষ আনন্দ পায়, ইহাই মানুষের প্রাণের পরম রহস্য। মানুষের দুঃখ অ-সুখ নয়; সুখ দুঃখ উভয়ের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব দুঃখ—যে-দুঃখের ধাতুই আনন্দ—সেই দুঃখই মানুষের নিজস্ব। এই আনন্দের অধিকার মানুষেরই আছে, পশুর নাই। তাই, দেহই এই দুঃখের বেদী হইলেও এই বেদীর উপরে যে আগুন জ্বলে—সে হুতবহ মাত্র, সকল আহুতি সে দেবতার মুখেই পৌছাইয়া দেয়।

এই আনন্দের প্রমাণ মানুষের যাবতীয় কারুসৃষ্টিতে। সাহিত্য-কলায় তাহা আরও পরিস্ফুট। মানুষের গূঢ়তম অনুভূতির যত-কিছু ভাবচিত্র যখন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহার মধ্যে নিছক দৈহিকতা বা দেহ-দুর্দ্দশার যথাযথ কাহিনীই রসোদ্রেক করে না। যদি কোথাও তাহা করে, তবে সে কারুসৃষ্টির উপাদান হিসাবে। কবিচিত্তের একটু রং, কল্পনার একটু মায়া তাহাকে রূপান্তরিত করে বলিয়াই আমরা তাহাকে বরণ করিয়া লই। কল্পনার সেই রংটুকু আর কিছু নয়—কবির নিজেরই আনন্দ-চেতনার পরিচয়। দুঃখকে তিনি দেখিয়াছেন—হয়ত গভীর করিয়া তাহার চরম রূপটাই দেখিয়াছেন, তথাপি বেশ বোঝা যায়, তিনি তাহাকে একান্ত করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার ভাবদৃষ্টিতে তাহাই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয় নাই—একটা বৃহত্তর চেতনা বা অখণ্ড অনুভূতির সঙ্গে ছন্দে ও লয়ে সুসমাহিত হইয়া তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছে, তাই তিনি তাহা হইতে রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। নতুবা তাহা জড়, অচেতন ও কুৎসিত হইত। কোন বস্তুরই যথাযথ বর্ণনা সাহিত্যের প্রয়োজন নয়—বাহিরের বস্তু যখন অন্তরের মধ্যে একটি ভাবের উদ্রেক করে, এবং সেই ভাবকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশিষ্ট অথচ সুসম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া ওঠে, তখনই সাহিত্যের জন্ম হয়। যাহা বস্তুগত বিচ্ছিন্ন তথ্য তাহাকে ভাবের পরিমণ্ডলে সম্পূর্ণ করিয়া ধরিবার শক্তিই যথার্থ সৃষ্টিশক্তি। ভাবের এই অখণ্ডতাই সাহিত্যের সুনীতি, সাহিত্যের আর কোন সত্য বা নীতি নাই। যেখানে ভাবের এই পরিমণ্ডলটি পূর্ণ নয়—যে-রচনায় রচয়িতার ভাব এই সামঞ্জস্যের কামনা করে না—বস্তুকে খণ্ড তথ্যের আকারে নকল করিয়া সত্যবাদ বা বৈজ্ঞানিক সৎসাহসের বড়াই করে, সে রচনা সাহিত্য-হিসাবে ব্যর্থ, সাহিত্যহিসাবেই দুর্নীতিপূর্ণ।

যে-মানুষ দুঃখকেই একান্ত করিয়া দেখিয়াছে, জীব-জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া বুঝিয়াছে—সে সুখকেও বিশ্বাস করে না। যে সুখ চায় বলিয়া দুঃখে কাঁদে, এবং যে সুখ চায় না বলিয়া দুঃখেও কাঁদে না—এই উভয়ের প্রকৃতিতে আকাশ-

পাতাল প্রভেদ। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মানুষ যাহা চায়—সেই চাওয়ার মধ্যে শক্তি নাই বলিয়াই তাহা পায় না; তারপর যদি না পাওয়ার জন্য সে কাঁদে তবে সে লজ্জাহীন, তাহার আত্মসম্মানবোধও নাই। যে এইরূপ কাঙালপনা করিয়া কাঁদে, সে যদি সমাজ বা ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করে, তবে তাহা নিতান্তই হাস্যকর। ক্ষুধা স্বাস্থ্যের লক্ষণ, পীড়ার লক্ষণও বটে। হজম করিবার শক্তি নাই, খাইবার ইচ্ছা আছে—কিম্বা, যখন ক্ষুধার তাড়নায় খাদ্যাখাদ্য বিচারও নাই,—তখন সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে দেখিলে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে হয়, শ্রদ্ধান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। শক্তির অভাব দেখিলে শক্তিমানের দয়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অশক্তির আস্ফালন দেখিলে মহাপুরুষেরা ক্ষমা করিতে পারেন, কোনও পুরুষ পারে না।

শক্তির কথাই বলিব। জ্ঞান ও প্রেম, এই দুয়ের যে পথেই হউক —মানুষ বহুদিন দুঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়া আসিতেছে। কোন্ পথ উৎকৃষ্ট সে কথা বলিবার আমার অধিকার নাই, কেবল ইহাই বিশ্বাস করি,—এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় পথ নাই। কিন্তু এই দুঃখের মূলে আছে কাম। দুর্ব্বল বা বিকৃত কামনাই জড়ত্বের লক্ষণ, ইহাই শাস্ত্রবর্ণিত তমোগুণ। যাহাদের কামনা দুর্ব্বল সেই মানুষের সংখ্যাই বেশী, তাহাদের অত্যহিত-নিবারণের জন্যই সমাজ-বিধির প্রয়োজন। কামনার প্রসারেই চিন্তার প্রসার; মানুষ জ্ঞানী হইয়াছে কামেরই কল্যাণে। সাধারণ মানুষ কামনার স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে ভয় পায় বলিয়াই সমাজ-বিধিকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে—মিথ্যা গৌরব দাবী না করিয়া, অন্ততঃ নিজের সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহাকে স্বীকার করে। যেখানে এই কামনার শক্তি অজ্ঞান বা অন্ধ, সেখানে তাহা জড়শক্তির মতই—হিংসা, হানাহানি, ও আত্ম-প্রতিষ্ঠায়—আপনাকে নিঃশেষ করিতে চায়। কিন্তু যাহার কামনা-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর চিৎশক্তিরও বিকাশ হইয়াছে, সে-মানুষ কল্পনায় নিজের বৃহৎ কামনা চরিতার্থ করে। জ্ঞানের কল্পলোকে সে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, কর্ম্মের কল্পলোকে সে মহা-যাজ্ঞিক—পরহিতব্রতী, কামের কল্পলোকে সে কবি। কামনার চরম প্রবৃত্তিতেই কামনার পরম নিবৃত্তি— বিষই অমৃতের নিদান!—ইহাই আদি-রহস্য। যে-কামনায় শক্তির পরিচয় নাই তাহা কামনাই নয়—রক্ত ও পূয এক পদার্থ নয়।

প্রশ্ন উঠিবে, কামনাই যদি প্রকৃত শক্তি হয়, তবে সমাজ তাহাকে শাসন করিবে কেন? অবশ্যই করিবে। ব্যক্তিবিশেষের অহংকে সমাজ শাসন করিতে

বাধ্য,—সমাজ সাধারণের জন্য, ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। ব্যক্তির প্রতিভা সমাজকে সংস্কৃত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, নষ্ট করিতে পারে না। সে ব্যাপারে যেটুকু আপাতসংঘর্ষ ঘটে, তাহা সমাজদ্রোহ নয়। সেটুকু সংঘর্ষ ঘটিবেই, তাহাতে কোন পক্ষেরই অপরাধ নাই। ব্যক্তি যেখানে সত্যই সমাজদ্রোহী, সেখানে তাহার সমাজ ত্যাগ করাই উচিত। যেটা ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র-কামনা—যাহা মূল সমাজনীতিরই বিরোধী, তাহা সকলের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়া, সে যখন আপনার দুরভিসন্ধি সকলের উপর চাপাইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই সমাজতন্ত্র করিয়া তুলিতে চায়, তখন সে দুর্বৃত্ত ঠগ মাত্র। ইহারা নিজের স্বতন্ত্র বাসের উপায় করিতে পারে না, পরের বাড়ীর ভিত জখম করিতে চায়। বৃহত্তর সমাজের চিরন্তন কল্যাণের ভাবনা তাহাদের নাই; তাহারা অতীতের হিসাব রাখে না, বরং তাহাকে অতিশয় অশ্রদ্ধা করে; ভবিষ্যতের জন্যও চিন্তিত নয়—সে দৃষ্টিশক্তি নাই। লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে-স্বাধীনতা চায় তাহাই নিরুপদ্রবে ভোগ করিবার জন্য তাহারা যে ব্যবস্থার দাবী করে, তাহা অসম্ভব বলিয়াই সমাজে উপদ্রবের অন্ত থাকে না। যদি সত্যকার পিপাসা থাকে, অর্থাৎ চাওয়ার সঙ্গে যদি পাইবার ক্ষমতাও থাকে, তবে আপনার বাসনা আপনিই পূর্ণ কর, আপনাকে বলি দাও—তাহারও মহিমা আছে। দুর্ব্বল জনসাধারণের পরিমিত কল্যাণকে এমন করিয়া বিঘ্নিত কর কেন? এ অভিসন্ধি কখনও সিদ্ধ হইবার নয়। সমাজ এত বোকা নয়, সমাজের একটা সামাজিক চেতনা বা সামাজিক আত্মা আছে, আত্মরক্ষার ধর্ম্মও আছে,—তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যাচারী কাপুরুষ ব্যক্তি কখনও জয়ী হয় নাই।

আজকালকার সাহিত্যে যাহারা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে তাহারাও এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবাদী। বিদ্রোহটা মূলে কাম-বিদ্রোহ, কিন্তু ধমক দিলেই করুণ কান্না শোনা যায়—"বড় ব্যথা, বড় দুঃখ—দারিদ্র্য-দুঃখ—অর্থ-সমস্যা।" এই দুঃখের জন্য সমাজ আর থাকিবে না, ইহকাল পরকালও গেল। ইহকাল, পরকাল, সমাজ প্রভৃতি না হয় গেলই, কিন্তু তাহাতে দুঃখ-নিবৃত্তি হইল কেমন করিয়া? স্বেচ্ছাচারে যেটুকু সুখ পাওয়া যায় তাহারই চাটনীর সাহায্যে এই দুঃখকে রুচিকর করিতে হইবে! একটা অকাল পড়িয়াছে বলিয়া অনাচারের অজুহাত পাওয়া গেল, একটু সুখলাভের উপায় হইল। একটা গুরুতর সমাজবিপ্লবের সূচনা হইলে কোন নীতি বা নিয়ম টিকে না,—এক শ্রেণীর ক্ষুধার্ত্ত জীবের সেইটাই

সুসময়; কারণ, তখন সম্পত্তি বলিয়া আর কিছুই থাকে না, চক্ষুলজ্জা করিবার প্রয়োজন হয় না, চুরি করিয়া চোর হইতে হয় না, কামনার বস্তু—উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করিতে হয় না, ধর্ম্মের ভানও করিতে হয় না। সকলেই তখন দুঃখ-নিবৃত্তির সহজ উপায় খুঁজিয়া পায়, হাত বাড়াইলেই দু'-দশটা দুঃখনাশক বস্তু বুকের উপর আপনিই আসিয়া পড়ে। তখন দুঃখটাই একটা বড় বিলাস হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য বরং কিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হয়। দুঃখের নেশাখোর, কল্পনায় আপনাকে ক্রুশবিদ্ধ ভাবিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন ও মহিমা অর্জ্জন করিতে চায়। যক্ষ্মা হয় তাহাদের ক্রুশকাষ্ঠ, এবং নারী ও মদ্যই হয় দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করিবার যন্ত্র। শেষের দুইটা জিনিষ যাহাতে দুষ্প্রাপ্য না হয়, এবং সুপ্রাপ্য হইলেও নিন্দনীয় না হয়—তার জন্য তারস্বরে দুঃখের জয়গান ও সমাজবিদ্রোহ করিতে হইবে।

এই যে দুঃখ-প্রীতি ও দুঃখের আস্ফালন ইহাতে সত্যকার দুঃখ নাই। ইন্দ্রিয়পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য যে দুঃখের দোহাই দিতে হয় তাহা কখনই সত্যকার দুঃখ হইতে পারে না। যে-দুঃখে মানুষ অসহায় জীবের মত রোদন করে—সেই দুঃখকে যখন সে মহিমান্বিত করিতে চায়, তখনই তাহার মিথ্যা ধরা পড়ে। যদি কেহ রোরুদ্যমান অবস্থাতেই বলিতে থাকে, আমার মধ্যে ভগবান্ বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে,—তবে তাহার কি রোগ হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারি। যে এই দুঃখকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে না, অথচ ইহাকেই idealise করিয়া, বাস্তবতার নামে পূজা করিবার ভান করে, সে এইরূপ বাস্তব দুঃখসম্বন্ধে যেমন অজ্ঞান, তেমনই, দুঃখের যে বিরাট্ মূর্ত্তি ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যেও রাজপুত্রকে উদাসীন করিয়াছিল, সে মূর্ত্তি কল্পনা করিবার শক্তিও তাহার নাই। যে সত্যকার দুঃখ পাইয়াছে, বা দেখার মত করিয়া তাহাকে দেখিয়াছে, সে দুঃখকে লইয়া এরূপ তামাসা করিবে না। নিজের জীবনেই হউক, বা সহানুভূতিমূলক কল্পনাতেই হউক—দুঃখের সত্য-স্বরূপ যে একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময়; তাহার কণ্ঠস্বরে আমরা চমকিত হই না, নিস্পন্দ হইয়া যাই।

দুঃখকে যাহারা বড় করিয়া দেখে নাই, কেবল 'বাস্তব অতএব সত্য' বলিয়াই দুঃখের মহিমা গান করে, তাহারা দুঃখেরই অজুহাতে সুখের দাবী করে,—সুখের জন্যই লালায়িত। সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই বলিয়া সক্ষম সুখীকে তাহারা ঈর্ষ্যা করে। সুখ তাহাদের চাইই—সে যেমনই হউক।

সেই সুলভ সুখসন্ধানের লজ্জা দূর করিবার জন্য, তাহারা নীতি, সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বীর সাজিতে চায়। দুঃখীর দুঃখকে আমি পরিহাস করি না; এরূপ দুঃখের কারণ কি, তাহার কতটুকু প্রতিকার সম্ভব, এবং কি হিসাবে তাহা মনুষ্যোচিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু এই সকল তথাকথিত দুঃখ-বাদীর মনস্তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ইহাই আমি যথাসাধ্য বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

চৈত্র, ১৩৩৪

মৃত্যু-দর্শন

মৃত্যুর কথা কেহ ভাবে না, এ কথা সত্য—ভাবিলে মানুষের পক্ষে বাঁচাই কঠিন হইত।

কিন্তু না ভাবিয়া থাকে কেমন করিয়া? জীবনের মোহ-রসে আচ্ছন্ন থাকে—মৃত্যু-বিভীষিকা সে মোহ ভেদ করিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; সে বাঁচা দিন হইতে দিনে, বা বৎসর হইতে বৎসরে নয়—পলে অনুপলে; তাই মৃত্যুকে দেখিলেই সে পাশ কাটায়, বেশিক্ষণ তাহার দিকে তাকাইতে পারে না। মানুষের জীবধর্ম্ম এতই প্রবল, দেহের অণু-পরমাণু এত চঞ্চল যে, থামিবার ভাবিবার অবকাশ তাহার নাই। সে যে মুখে ছুটিতেছে তাহার বিপরীত মুখে মৃত্যু তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, উভয়ে চক্রাকারে ছুটিতেছে—যখনই দেখা হয় শিহরিয়া উঠে; কিন্তু গতির বিরাম নাই, ঘুরণের নেশায় মৃত্যুকে আমরা দেখি না। যখনই সংঘর্ষ ঘটিবে তখনই চুরমার হইয়া যাইবে এ কথা সে জানে, কিন্তু ঘূর্ণনের মুখে তাহা মানে না। ইহারই উল্লেখ করিয়া মহাভারতকার যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্'।

মৃত্যুকে ভাবিতে পারা যায় না; আর সব-কিছু মানুষের জ্ঞানগম্য—পরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, কিন্তু মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিতে না পারিলে তাহার পরিচয় করা হয় না; এবং সাক্ষাৎ করিলে আর কিছু বলিবার থাকে না। অস্তিত্বের বিলয়-মুহূর্ত্তে যে অপরোক্ষ অনুভূতি ঘটে, তাহা বজ্রাঘাতের মত; নিমেষের মধ্যে মহাশূন্য জাগিয়া উঠে—তাহাতে দিক্-কাল নাই, অগ্রপশ্চাৎ নাই, স্মৃতি-বিস্মৃতি নাই; সেই মহানির্ব্বাণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কি অনুভব হয়, তাহা কেহ কাহাকে জানাইতে পারে না। মৃত্যু কি তাহা কেহ জানে না, জানিবার কোনও উপায় নাই; যাহা জীবনের বিপরীত, জীব তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই মৃত্যুর ঘটনাটাই মানুষ দেখে, মৃত্যুকে জানে না; বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় সত্যকার মৃত্যুচিন্তা কেহ করে না।

যে-দ্বার রুদ্ধ, যে-পৈঠার পরে আর পদক্ষেপ নাই—যাহাকে ক্রমাগত চলিতেই হইবে সে সেদিকে চাহিবে কেন? যাহাকে জানা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ—জানার নামই জীবধর্ম্মের নিবৃত্তি, তাহাকে জানিবার প্রবৃত্তিই যে হয় না!

তাই মৃত্যুকে একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনারূপেই সে দেখে—সেই ক্ষণিক বিভীষিকা প্রতি-রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত প্রভাতের আলোকে প্রত্যহ মুছিয়া যায়, জীবনের জাগ্রত যাত্রার অবিরত তাড়নায় মৃত্যুর ফাঁক ভরিয়া উঠে। এ যাত্রায় কিছুই ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ নাই, ইহাতে বর্ত্তমান ছাড়া কাল নাই; পরের মৃত্যু অতীত, নিজের মৃত্যু ভবিষ্যৎ—এ দুইটার কোনটাই বাস্তব নয়।

অতএব মৃত্যু কি তাহা আমরা যেমন জানি না, তেমনই জানিবার কোনও প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু তথাপি মৃত্যুর একটা রূপ আমরা দেখি, সেই পরোক্ষ দেখাও অপরোক্ষ হইয়া উঠে—যখন চোখের সম্মুখে প্রাণসম প্রিয়জনের শেষ নিশ্বাস-ত্যাগের সেই চরম মুহূর্ত্ত গণনা করি। জীবনের সেই অবসান-দৃশ্য, প্রাণবায়ু-ত্যাগের সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তখন একটা বিস্ময় বা বিভীষিকার মত কেবল একটা বিমূঢ় ভাবের উদ্রেক করে না, কেবল মন বা মস্তিষ্কের উপরেই আঘাত করে না—হৃদয় মথিত করে; জীবনের পুষ্প-পতাকাময় তোরণের অন্তরালে যে কঙ্কাল লুকাইয়া আছে, তাহা যেন নির্ল্লজ্জভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সেও মৃত্যুর স্বরূপ নয়—তবু একটা রূপ আমরা দেখি; এই দেখিতে পাওয়ার কারণ আর কিছু নয়, আমাদেরই একটা অংশ—প্রাণবৃক্ষের একটি শাখা—তখন শুকাইয়া খসিয়া যায়। সে যেন আমাদেরই আংশিক মৃত্যু, সে মৃত্যু তখন অনুভব করি প্রাণের মধ্যে; এই প্রাণী-দেহ যে স্নায়ুশিরা-বন্ধনের শতগ্রন্থিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে সেই গ্রন্থিতে চোট লাগে—সে বন্ধন আর তেমন থাকে না, শিথিল হয়; কয়েকটা স্নায়ু হয়তো ছিঁড়িয়া যায়। যাহাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, যাহাকে হৃদয়ের স্নেহরসে পুষ্ট করিয়াছিলাম, যাহার জীবনে আমার জীবন বেগ সঞ্চার করিয়াছে—মৃত্যু যখন তাহাকে গ্রাস করে, তখন আমারই কতকটা তাহার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; না মরিয়াও আমি মৃত্যুর স্পর্শ লাভ করি।

সাধারণে ইহাকে বলে শোক। শোক বাহিরের আক্ষেপমাত্র, সে বেশিদিন থাকে না। জীবন্ত দেহে অস্ত্রোপচার করিলে ক্ষত-অঙ্গে স্নায়ু-পেশীর যে স্পন্দন অবশ্যম্ভাবী, শোক তদতিরিক্ত কিছু নহে। এই শোক বা আক্ষেপ অস্ত্রাঘাতমাত্রেই হয়; কিন্তু সকল অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহানি হয় না—দেহের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয় না।

শোক কালে শান্ত হয়; কিন্তু সেই অঙ্গহানি, প্রাণের সেই আংশিক মৃত্যুর কোন প্রতিকার নাই; বরং বাহিরের আক্ষেপ বা শোক যত প্রবল ততই সান্ত্বনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মীয়-বিয়োগে মৃত্যু যাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার পক্ষে সকল সান্ত্বনা নিরর্থক বলিয়াই বাহিরে কোন আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায় না; সে মূঢ় মূক হতচেতন হইয়া যায়, ভিতরে পক্ষাঘাত হয়—যাবজ্জীবন সে অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে সেই পক্ষাঘাত বহন করে।

ইহারই নাম মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎকার—নিজ-মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষ মৃত্যুকে আর কোনও রূপে দেখিতে পায় না। সাধারণতঃ মৃত্যুকে আমরা জানি না, জানিতে চাই না—জীবিতের পক্ষে অপরের মৃত্যু একটা অর্থহীন দুর্জ্ঞেয় উপদ্রবমাত্র; যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ মৃত্যুকে স্বীকার করা অসম্ভব—মৃত্যুকে স্বীকার করাই মরা। স্বীকার এক রকম করি—যখন বুকের পাঁজর কয়খানার কোনটা খসিয়া যায়; তখন নিজের মনের মুকুরে সেই লাঞ্ছিত হতশ্রী মূর্ত্তি দেখিয়া মুখ লুকাই, সে মুখ কাহাকেও দেখাইতে লজ্জা হয় না; মানুষের সভায় যখন বসি তখন প্রাণপণে নিজের সেই ক্ষতিচিহ্ন লুকাইয়া রাখি। যে শোক করে, সে মানুষের সান্ত্বনা সহানুভূতি চায়, সে জীবনের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে চায়—সে মৃত্যুকে দেখে নাই।

জীবনে যাহার মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় নাই—সে ভাগ্যবান্, যে তাহাকে দেখিয়াও দেখে নাই—সে হৃদয়হীন। যে মৃত্যুর অন্তরালে পরম আত্মাকে আবিষ্কার করে, মৃত্যুকে যে অমৃতের সোপান বলিয়া উপলব্ধি করে, মৃত্যু কোথাও নাই বলিয়া যে ঘোষণা করে, সে—হয়, জানিয়া শুনিয়া মধুর মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়, নয় সে কখনও বাঁচে নাই—দেহ-পরিগ্রহ করিয়াও বিদেহ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ সে প্রেত-পিশাচের সামিল। মানুষ যতক্ষণ মানুষ, ততক্ষণ সে তাহার ব্যক্তিপরিচ্ছিন্ন সত্তা বিস্মৃত হইতে পারে না; সেই সত্তার উপরে যে ব্যক্তিত্বহীন অমৃত-সত্তার আরোপ করিয়া আশ্বস্ত হইতে চায় তাহার আত্মপ্রবঞ্চনা কৃপার উপযুক্ত বটে। কিন্তু যে সেইরূপ আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারে সে মানুষ নয়—যে-বস্তু কবি-বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, সেই হৃদয়নামক যন্ত্রটি তাহার মধ্যে বিকল হইয়া আছে। যাহারা লোক-লোকান্তরের স্বপ্ন দেখে, যাহারা মৃত্যুর পরেও অবিচ্ছেদে জীবনযাপন করার কথায় বিশ্বাস করে, তাহারা শিশুর মত রূপকথার ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর

মধ্যে তফাৎ এই যে, এক দল তত্ত্বজ্ঞানের অভিমানে হৃদয়বৃত্তি নিরোধ করে; অপর দল হৃদয়াবেগের মোহে নির্ব্বিচারে মিথ্যার শরণাপন্ন হয়।

মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই—এ কথা যতই সত্য বলিয়া মনে হউক—স্বীকার করিতে সকলেই ভয় পায়। মৃত্যুর সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই মনের মধ্যে একটা অন্ধকার শূন্য মাত্র অনুভব করি—অথচ, শূন্য বা নাস্তিত্বের কল্পনাও আমাদের সংস্কার-বিরোধী; তাই মন সেই শূন্য বা নাস্তি-চেতনাকে নানা কৌশলে আবৃত করিবার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকার গহ্বরকে কোন কিছু দিয়া ভরাইয়া রাখিতে চায়। মানুষ মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা চায়—তাহার অর্থ, মৃত্যুকে সে মানিতে চায় না, অস্তিত্বের ঐকান্তিক বিলোপ তাহার জীব-সংস্কারের পক্ষে বিষবৎ মারাত্মক, তাই আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মানুষ সাধারণ মৃত্যুঘটনায় বিশেষ বিচলিত হয় না; যে মরিয়া গেল, জীবন-ব্যাপারে তাহার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকে না বলিয়া তাহাকে সে আর গণনার মধ্যেই আনে না। শোকের আক্ষেপ মনের একটা সাময়িক পীড়া মাত্র; যে বাঁচিয়া আছে সে প্রাণবন্ত—প্রাণহীনের সঙ্গে প্রাণীর যে সম্পর্কহীনতা, তাহা ধর্ম্মের মত দুর্লঙ্ঘ্য—যে মৃত সে আর আমাদের কেহ নয়, এই সংস্কার যেন প্রাণের মর্ম্মমূলে জড়িত হইয়া আছে। অতএব শোক মিথ্যা, সান্ত্বনা সুসাধ্য।

মৃত্যু জীবনের উপরে রেখাপাত করিতে পারে না। মৃত্যুর সম্বন্ধে শিশুর যে মনোভাব—নিত্যসঙ্গীরও আকস্মিক তিরোধানে শিশুর যে আচরণ—বয়স্ক ব্যক্তির আচরণও তেমনই মূল জীবন-চেতনার বা সত্যকার জীবন-ধর্ম্মের তাগিদে আমরা মৃতজনকে আমাদের জগৎ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিই; অমৃতের আশ্বাস, ধর্ম্মের সান্ত্বনা, পরলোকের কাহিনী-কল্পনা—এ সকলই তাহার প্রমাণ। মৃতজন আমাদের প্রাণের সন্নিকটে আর বাস করে না; আমাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাহাদের কোনও যোগ নাই। যাহার কায়া নাই তাহার সঙ্গে দেহধারীর কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না—তাই থাকেও না; তথাপি যে সম্পর্কের দাবি করি তাহা ভান মাত্র; তাহা যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র; মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে, মৃতজনের সম্বন্ধে কোনও চেতনা, কোনও সজ্ঞানতা, তাহার মধ্যে কুত্রাপি নাই। শিশুর আচরণ অবিমিশ্র সত্য, তাহাতে ভান নাই; বয়স্ক ব্যক্তির স্মৃতিনামক একটা মানস-ব্যাধি

আছে—হয়তো লজ্জাও আছে, তাই সে মাঝে মাঝে স্মরণ করে, দুঃখ করে, লজ্জা পায়।

মানুষ আপনার চেয়ে কাহাকেও ভালবাসে না; যদি কাহাকেও খুব ভাল বাসে, তবে তাহা আপনার চেয়ে নয়—আপনার মত। তাই স্নেহ যত গভীর হউক, প্রেম যত বড় হউক, তাহার মূলে স্বার্থ থাকে। পরের জন্য আপনাকে হত্যা করা —পরের মৃত্যুতে নিজের জীবন-সঙ্কোচ করা জীবের ধর্ম্ম নহে, মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জীবেরও নহে। যে মরিয়া গেল তাহাকে ভাল বাসিতাম, খুব ভাল বাসিতাম— তাহার অর্থ, আমার প্রীত্যর্থে তাহাকে প্রয়োজন ছিল; তাহার মৃত্যুতে আমার আত্মপ্রীতির বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আত্মপ্রীতির জন্য এই যে পরকে আশ্রয় করা— ইহারই নাম হৃদয়-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের চরম বিকাশে মানুষ শেষে আত্মবিস্মৃত হয়, আত্মরক্ষা শেষে আত্মবিসর্জ্জনে পর্য্যবসিত হয়। এই বিসর্জ্জন বা বিসৃষ্টিও আত্মহত্যা নয়—আপনাকেই ভিতর হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া, বিষয়ান্তরে আপনাকেই সৃষ্টি করা। এতখানি কল্পনা সকলের নাই, কিন্তু মূলে সকলের ধর্ম্মই এক—সকলেই আত্মধর্ম্মী, আত্মব্রতী। যাহাকে ভালবাসি, স্নেহ করি, সে আমার আত্মীয়, আত্ম-সম্পর্কিত, অর্থাৎ আত্মপ্রীতির আশ্রয়। সেই আত্মীয় যখন মরিয়া যায় তখন যে শোক উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণতঃ স্বার্থহানির শোক। কিন্তু তাহাকে আর কোনও প্রয়োজনে পাইব না, এই জীবনের প্রত্যক্ষ লীলামঞ্চে কোনও সূত্রে সে আমার সঙ্গে আর বাঁধা নাই; মৃত্যুর পরে যদি সে থাকে-ও, তবে তাহার জাত্যন্তর ঘটিয়াছে—জীবিত আত্মার সঙ্গে মৃত আত্মার কোনও গুণ-সামান্য নাই, অতএব সে আর আত্মীয় নহে;—প্রাণের গভীরতম চেতনায় মানুষ ইহাই অনুভব করে, তাই অজ্ঞানে প্রাণ-ধর্ম্ম পালন করে; কেবল মানস-ধর্ম্মের তাড়নায় তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। মানুষ কাঁদে, কিন্তু প্রকৃতি হাসে—জীবধর্ম্ম পালন করিতে সে বাধ্য, করে-ও। একদিকে শোক করে, আর একদিকে নিজ-জীবনের প্রয়োজন পুরাপুরি সাধন করে।

আত্মীয়-বিয়োগে আত্মার বিয়োগ হয় না; আমাকেই কেন্দ্র করিয়া যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে, আমারই প্রয়োজনে যাহার অস্তিত্ব, আমারই প্রীত্যর্থে যাহাকে আমি চাই—যতক্ষণ আমি বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধির হিসাবে কোনও স্থায়ী তারতম্য হইতে পারে না। আমি ছাড়া আর সবটাই জগতের অন্তর্গত; এই আত্মপ্রয়োজনাধীন জগতের এক টুকরাও হারাইবে না—যতক্ষণ না

আমি আমাকে এতটুকু হারাইতেছি। সকলই পর, সকলই পর, সকলই পর। এ পরের যেটুকুকে আপন বলিয়া ভাবি, তাহাও জীবনের লীলা-সুখের জন্য নিজ আত্মার অভিমান পরের উপর আরোপ করা; কাজেই তাহা মিথ্যা প্রিয়জনের মৃত্যুতে সেই অভিমান ব্যর্থ হয়—সে যেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দেয়, তাই আঘাত পাই, সেই আঘাতের নাম শোক। তারপর, সে ক্ষতি তখনই অন্য দিক্ দিয়া পূরণ করিয়া লই; কিংবা ব্যয়-সংক্ষেপ করি, অর্থাৎ বৈরাগ্য-সাধনা করি। আত্মীয়ের মৃত্যুতেই প্রমাণ হয়—সে কতদূর অনাত্মীয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত মিথ্যা; মানুষের ভাগ্যবিধাতা মানুষকে কতটা আত্মৈক-শরণ, আত্মপরায়ণ, নিঃসঙ্গ, একক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার জীবনে স্বকর্ম্মনির্দ্ধারিত পথ বা আত্মস্বার্থসাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আত্মীয় অনাত্মীয় যাহার দশা যেমন হউক, যে যখন যেখানে যেরূপ করিয়াই জীবনলীলা শেষ করুক—আসলে তোমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তোমার পথে তুমি চলিতে থাকিবে, তুমি ফিরিয়াও চাহিতে পার না—চাহ না। ফিরিয়া যদি চাহিতে, তবে তুমিও মরিতে,—পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ-কাহিনী স্মরণ কর। তুমি মরিতে চাও না—তাই ফিরিয়া চাহিতেও নারাজ। তাই বিশ্বাস হয়, অপরের মৃত্যু অপরেরই—সে যতই প্রিয়জন হউক; সে মৃত্যু আমাদের নিকট অবাস্তব—নিজের মৃত্যুই একমাত্র বাস্তব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুকে আমরা দেখিয়াও দেখি না; তথাপি সময়ে সময়ে প্রাণসম প্রিয়জনের মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিকে অপলক নিশ্চল করিয়া রাখে। পরের মৃত্যু একটা নিত্যদৃষ্ট ঘটনা মাত্র, সে ঘটনাকে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশও যেন আমরা পাই না—একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হয় মাত্র; সে অনুভূতিকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিই না, মনের দরজা বন্ধ করিয়া দিই। জীবনের বাসগৃহে একটা ভূতের ঘর আছে, সে ঘর খুলিয়া কখনও উঁকি মারি না—সময় সময় যখন আপনি খুলিয়া যায়, তখন তাহাকে বন্ধ করিয়া দিই। ইহাই আমাদের স্বভাব—ইহা না হইলে আমরা বাঁচিতাম না। কিন্তু যাহাকে এমন করিয়া বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যাহার নিশ্বাস-বায়ু আমারই নিশ্বাসবায়ুর প্রতিশ্বাস বলিয়া মনে করিতাম; যাহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া বহু দিন ও বহু রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যাপন করিয়াছি; সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয়, আবার সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত, অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা—যাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতম প্রাণশক্তির গতি নিরীক্ষণ করিয়াছি, নাড়ীর বেগ বা হৃদ্স্পন্দন গণিবার সময় মৃত্যুর আক্রমণ নিজের নাড়ীতে,

নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে অনুভব করিয়াছি ; যাহার মৃত্যুকরনিষ্পেষিত কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শুনিয়া, শুধু আমার নয়, জগতের সকল জীবিত জনের জীবন-শ্বাসকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইয়াছে ;—মৃত্যু যখন তাহাকে কবলিত করিল, বিস্ফারিত অক্ষিতারকা স্থির জ্যোতিহীন হইয়া শেষে জালাবৃত হইয়া গেল ; পরে ক্ষণকাল দেহের আনাভি-কণ্ঠ আন্দোলন, ও শেষে মুখ-গহ্বর হইতে প্রাণবায়ুর শেষ-শ্বাস-নির্গম প্রত্যক্ষ করিলাম—যে-মুহূর্ত্তে সে মরিয়া গেল সেই মুহূর্ত্তকে চাক্ষুষ করিলাম, তখন কি দেখিলাম ? কি অনুভব করিলাম ? দেখিলাম, একটা জীবনের অবসান হইয়া গেল—বুঝিলাম যে ছিল সে আর নাই। সে আর নাই, এই পরম সত্য উপলব্ধি করিলাম—উপলব্ধি করিলাম, আমি বাঁচিয়া আছি। শবদেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলাম ; কারণ, তখন স্পষ্ট বুঝিলাম, অবশিষ্ট যাহা তাহা এই দেহটা, উহার অতিরিক্ত আর কিছু অস্তিত্বের সীমানায় আর নাই। চিরদিনের শিক্ষা-সংস্কার বিস্মৃত হইলাম—যে গেল সে ওই দেহটা নয়, আর কিছু ; সে আর উহার মধ্যে নাই, ত্যক্ত বসনের মত সে উহাকে পরিহার করিয়া গিয়াছে—এ সকল কথা বিশ্বাস হইল না। দেহের দিকে না তাকাইয়া তাহার আত্মার প্রয়াণ-পথ কল্পনা করিতে পারিলাম না ; কারণ মৃত্যু কি, তাহা সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। জীবন ওই দেহেরই ধর্ম্ম—জীবিতের মূর্ত্তি ওই দেহ—ওই মূর্ত্তি মরিয়াছে, সে আর বাঁচিয়া নাই—সে আর নাই। তবু যতক্ষণ ওই দেহটা আছে, প্রাণহীন হইলেও তাহাকেই দেখিতেছি—তাহাকে আর কোনও রূপে কল্পনা করিতে পারি না। যে রহস্যময় প্রাণবায়ু ওই দেহকে ত্যাগ করিয়া গেল, সে মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাণ হইলে শিখা যেমন শূন্যে বিলীন হয়। সে বায়ু ওই দেহকেই সঞ্জীবিত করিয়াছিল—তাই তাহার এত মূল্য ; সেই বায়ু এখন নিঃশেষ হইল, মানুষ মরিল। শব-মুখে যতই চাহিয়া দেখি, ততই মনে হয় সে মুখ যেন কাঙালের মুখ—প্রাণ হারাইয়া সে যেন সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, তার আর কিছু নাই—কিছু নাই ! সে মুখে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম—এই শেষ ! এইখানেই সব শেষ—তাহার অস্তিত্বের শেষ নিদর্শন ওই দেহ। মৃত্যু তাহার মুখে ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন অঙ্কিত করে নাই—অতি দীনদুঃখী ভিখারীর মত সে মুখে একটি বড় করুণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে ; জীবন ও মৃত্যুর সন্ধি-মুহূর্ত্তে যে সত্য তাহার মুখে মুদ্রিত হইতে দেখিলাম তাহাতে সকল মিথ্যা সংস্কার দূর হইল ; যে-অবস্থা ধারণা করিতে পারি না, জীবিতের পক্ষে যাহা অপরোক্ষ

করা অসম্ভব—সেই চিরনির্ব্বাণ, সেই মহাশূন্য বা চরম পরিণাম যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। ওই প্রাণহীন শবদেহও যতক্ষণ ধ্বংস না হয়, ততক্ষণ তাহা সত্য; সৃষ্টির মূল সত্য—যে-মূর্ত্তি বা কায়া, তাহা তখনও সম্মুখে বিদ্যমান। মনে হইল প্রাণ নাই, তবু সে আছে—প্রাণহীন সে; সে-হীন প্রাণ—যাহাকে আত্মা বলে,, তাহা কল্পনা করিতেও পারিলাম না; যাহাকে হারাইলাম তাহার শেষ সত্য ওই দেহটা, তাই সেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম।

ইহাই মৃত্যু—দেহ-বিযুক্ত আত্মার লোকান্তর-প্রাপ্তি নহে। মৃত্যুশোক বিরহ-দুঃখ নয়, কারণ মৃত্যু লোকান্তর-বাস নয়—অতলস্পর্শ শূন্য-গহ্বর। যে আর নাই—তাহার সম্বন্ধে বিরহ-ভাব হয় কেমন করিয়া? কাহারও মৃত্যু যদি গভীরভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে, যদি তাহাকে এমন ভালবাসিয়া থাক যে তাহার অভাবে—তোমার কি হইল না ভাবিয়া—তাহার কি হইল ভাবিতে পার, তবেই মৃত্যুর স্বরূপ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবে। যে মরিল সে যে আর নাই—এ কথা ভাল করিয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করা দুরূহ; আমার জীবন-সংস্কার অর্থাৎ 'আমি আছি'র সংস্কার সে পক্ষে প্রধান বাধা। এই সংস্কার যদি মুহূর্ত্তের জন্য ঘুচিয়া যায় তবে মৃত্যুসম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা-বিলাস আর টিকিতে পারে না। প্রাণসম প্রিয়জনের মৃত্যু-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া যখন মনে হয়—আমি আছি, আর, সে নাই; আমার বাঁচিয়া থাকার তুলনায় তাহার না-বাঁচার অবস্থা যখন তীব্রভাবে অনুভব করি, তখন এই ভাবিয়া মর্ম্মমূল ছিঁড়িয়া যায় যে, আমি যাহা ভোগ করিতেছি সে তাহা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। যে-আয়ু অপেক্ষা পরম ধন আর নাই, যে আয়ু আমি এখনও ভোগ করিতেছি—শোকের আবেগে নিজের সেই আয়ুকে যতই ধিক্কার দিই না কেন, অন্তরের অন্তরে যাহার মূল্যসম্বন্ধে আমি সচেতন—সেই আয়ু—অস্তিত্বের সেই একমাত্র স্বাদ-সুখ হইতে যখন তাহাকে বঞ্চিত হইতে দেখি, তখন কপট বৈরাগীর মত, নিজে গোপন ভোগসুখে আসক্ত থাকিয়া অপরের সম্বন্ধে সুমহান্ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রচার করার মত, নিজে জীবিত থাকিয়া মৃতের জন্য আত্মা বা পরলোকের ব্যবস্থা করার প্রবৃত্তি হয় না। তখনই মৃত্যু কি, তাহা বুঝিতে পারি। যখন জীবন-বঞ্চিত হতভাগ্যের সেই দুঃখ অনুভব করি—আমার অভাব নয়, তাহার সেই সব-শেষ-হওয়ার মহা দৈন্য যখন উপলব্ধি করি, তখন এক দিকে জীবনকে যেমন পরম আশীর্ব্বাদ বলিয়া বুঝি, তেমনই, আর এক দিকে মৃত্যু যে কত বড় অভিশাপ, তাহাও অন্তরের অন্তরে অনুভব করি।

পরক্ষণেই মনে হয়—যে রহিল না, যে আর নাই, তাহার জন্য দুঃখ কি ?—দুঃখ তাহার, না তোমার ? জীবন-বঞ্চিত হইয়াছে কে ? 'হইয়াছে' কথাটা যাহার সম্বন্ধে খাটে তাহার একটা সত্তা মানিতে হয়—কিন্তু সে যে নাই ! মৃত্যু যে মহা-অবসান—চির-সমাপ্তি ! তখন বুঝি, দুঃখটা আমার—আমারই সম্পর্কে, আমারই স্বার্থজড়িত। শোক করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধা পাই। চোখ ফাটিয়া যে অশ্রুর উদ্গম হয়, তাহার হেতুরূপে আমা ছাড়া আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না।

তখন বুঝিতে পারি, যাহার শবদেহ বারবার বক্ষে ধারণ করিতেছি—সে আর নাই বটে, তবু আমার জীবনে তাহার জীবনের রেশ রহিয়াছে—'আমি যে আছি' ! এই যে 'সে নাই' ভাবিতেছি ইহা তো আমারই ভাবনা ; 'না থাকা' যে কি, তাহা যে নাই সে তো আর বুঝে না ; যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণই মৃত্যু আছে—যাহার মৃত্যু ঘটে তাহার আর কিছু নাই—মৃত্যুও নাই ! শবদেহ যেমন চিতার অগ্নিজ্বালা অনুভব করে না, কিন্তু জীবিত-দেহের একটা অঙ্গ যখন অগ্নিদগ্ধ হয় তখনই দহন-জ্বালা যে কি তাহা অনুভব হয়—তেমনই, মৃত্যু-রূপ জ্বালার অনুভূতি জীবিতেরই হইয়া থাকে। আবার, অপরের দেহ দগ্ধ হইলে সে জ্বালা যেমন আমি অনুভব করি না, তেমনই পরের মৃত্যু যতই অনুমানসাপেক্ষ হউক, আমার অনুভূতি-গোচর হয় না। কিন্তু আমারই একটা অঙ্গ দগ্ধ হওয়ার মত যখন আমার জীবনের অংশস্বরূপ কোনও পরম প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, তখনই আমি মৃত্যুকে অনুভব করি—আমি যখন একেবারে মরিব, তখন আমিও তাহা অনুভব করিব না। মৃত্যুকে অপরোক্ষ করার আর কোনও উপায় নাই—আমারই জীবনের অংশরূপে আর একটা জীবন যখন আমার মধ্যে মরিয়া থাকিবে, তখনই মৃত্যুর সহিত আমার পরিচয় ঘটিবে ; যে মরিল, মৃত্যু যেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমারই জীবনের মধ্যে বাসা বাঁধিল। অতএব মৃত্যুর জন্য যে সত্যকার শোক সম্ভব—তাহা মানুষের নিজেরই মৃত্যু-শোক ; মৃত্যুকে আর কোনও অবস্থায় আমরা বুঝি না, অনুভব করি না—আর সকল মৃত্যুই আমাদের নিকট অবাস্তব ; সে সকল মৃত্যুতে যে শোক আমরা করিয়া থাকি তাহা সুখবোধের বিপরীত একটা দুঃখবোধ মাত্র—নানা অন্যবিধ যন্ত্রণার মতই একটা যন্ত্রণা। সে-মৃত্যু বাহিরের আঘাত মাত্র, তাহা জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয় না, প্রাণের মর্ম্মস্থানে ক্ষতচিহ্নরূপে বিরাজ করে না ; করিলে, সে শোক একটা ঝড়ের মত জীবনের শাখাপ্রশাখাগুলিকে কিছুকাল আন্দোলিত করিয়াই

নিবৃত্ত হয় না—মূল হইতে রস-সঞ্চারে বাধা দেয়, পত্রপুষ্প বিবর্ণ হইয়া যায়; সম্পূর্ণ অলক্ষিতে তাহার প্রভাব ক্রমশ ভিতর হইতে বাহিরে প্রকট হইয়া পড়ে।

কিন্তু এমন ভাবে আমরা মৃত্যুকে সচরাচর অপরোক্ষ করি না—পর এমন আত্মীয় হয় কদাচিৎ। অতিবড় শোকও যে কালে আরোগ্য হয়—আমরা যে সান্ত্বনা খুঁজি এবং পাই, তাহার কারণ, মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি আমরা করি না, মৃত্যু যে কি তাহা ভাবিতেও ভয় পাই; যে মরিয়াছে তাহাকে বিস্মৃত হইবার প্রাণপণ চেষ্টা করি—বাঁচিতে চাই। স্ত্রী-বিয়োগে, সন্তান-বিয়োগে, বন্ধু-বিয়োগে আমরা যে ব্যথা পাই তাহা মৃত্যু-চেতনা নয়—জীবনেরই একটা দুঃখবোধ—সুখভোগে একটা বাধার মত। কিন্তু মৃত্যুকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার অবকাশ যদি কখনও ঘটে, তবে জীবনের যত কিছু সংস্কার মুহূর্ত্তে উড়িয়া যায়—শোক ও সান্ত্বনা দুইই অনর্থক বলিয়া মনে হয়। সে অবস্থায়—যাহাদের হৃদয়বৃত্তি অতি গভীর ও প্রবল, তাহারা প্রিয়জনের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ নিজেও মরিয়া যায়; এমন যুগপৎ মৃত্যুর দৃষ্টান্ত বিরল নহে—'মৃতে ম্রিয়তে যা' বলিয়া যে প্রেমিকার বর্ণনা আমরা পাঠ করি, তাহা মিথ্যা নয়। যাহাদের জ্ঞানবৃত্তি প্রবল, তাহারা—শূন্যবাদী, নাস্তিক বা বৈদান্তিক মনোবৃত্তির অনুশীলন করিয়া, কাঠ-পাথরের মত হইয়া—আত্মপ্রসাদ লাভ করে; মৃত্যুকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝে, কেবল তৎপূর্ব্বে অবশিষ্ট জীবনটা কোনও রূপে অতিবাহিত করিবার জন্য কূটতর্কের জালে তাহাকে আবৃত করে। যাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল, তাহারা মৃত্যুকে স্বীকার করিয়াও জীবনের সুযোগটা উত্তমরূপে ভোগ করিতে চায়; সত্যকার শক্তিমান নাস্তিক তাহারাই—জীবনের মদিরাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়া কীর্ত্তির নেশায় মশগুল থাকে; মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করে না—শেষ কোথায়? ইহারাই পরম বিস্ময়ের পাত্র—কারণ, ইহারা সাধারণ নরনারীর মত ক্ষুদ্রমনা বা স্বার্থমোহগ্রস্ত নয়। তথাপি ইহারা মৃত্যুর মত এত বড় একটা ঘটনার সম্বন্ধে উদাসীন—মনের মধ্যে সে প্রশ্নকেই যেন ঠাঁই দিতে নারাজ।

মৃত্যুতে শোক করা, আর মৃত্যুকে দেখা—এই দুইটা এক নয়; এই কথাটাই বারবার বলিয়াও শেষ করিতে পারিতেছি না। শোক সকলেই করে; কিন্তু মৃত্যুকে দেখিতে সকলে চায় না, বা পারে না। মৃত্যুকে যথার্থ দেখিতে পাইলে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা বজ্রালোকের মত—জীবনের সকল তিমির-সংস্কার বিদীর্ণ করিয়া সে আলোকচ্ছটা মানুষের মানস-চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়; সে বজ্র যাহার উপর পতিত হয় সে তন্মুহূর্ত্তেই মহা রহস্য-সাগরে বিলীন হইয়া যায়। যে তাহাকে

দেখিয়াছে মাত্র, সেই বজ্রের আলোক যাহার দুই চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছে, সে অস্তিত্বের ঐকান্তিক অভাব চকিতে অনুভব করিয়াছে ; সে বুঝিয়াছে, সকল জ্ঞানের সীমা কোথায়—মানুষের মানসবৃত্তি মহাশূন্যকে আচ্ছাদন করিয়া জীবন-রঙ্গভূমির জন্য যে মিথ্যা-বিচিত্র যবনিকা রচনা করে তাহার ছিদ্র কোথায়। সে ছিদ্রমুখে দৃষ্টি সংলগ্ন করিলে যে-সত্যের উপলব্ধি হয়, তাহাতে এই প্রতীতি জন্মে যে, জীবনের বাহিরে আর কিছুই নাই—মৃত্যুর পরে আর কোনও রহস্য নাই, মৃত্যু অমৃতের দ্বার নহে। এই জীবনই 'তিক্ত হোক, মিষ্ট হোক—একমাত্র রস'। ইহার হিসাব বা ব্যবস্থা করিবার কালে কোনও অদৃষ্ট-ভবিষ্যৎকে গণনার মধ্যে গ্রহণ করা ভুল ; সে ভরসা ত্যাগ করিয়া বীরের মত জীবন-যাপনের নীতি স্থির কর ; ভগবান্ বা পরলোক, আত্মার অমরতা বা ব্রহ্মণ—এ সকল মরীচিকা মাত্র ; মৃত্যুকে চাক্ষুষ করিবার মত সাহস নাই বলিয়া—জীবনকেও যথার্থরূপে ভোগ করিবার মত হৃদয়-বল নাই বলিয়া, এ পথ্য হজম করিবার মত পরিপাক-শক্তি নাই বলিয়া—সাধারণ জীব আমরা দুধে জল মিশাইয়া, নানা পেটেণ্ট ঔষধের সহযোগে জীবন-পিপাসা-নিবৃত্তির উপায় করিয়া থাকি।

মৃত্যুকে যে যথার্থরূপে দেখিয়াছে, সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে—মিথ্যা হইতে সত্যে নব-জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার মানস-প্রকৃতির একটা পরিবর্ত্তন এই হয় যে, সে কোনও কিছুর পরিণাম বা ভবিষ্যৎ পূর্ণতায় আর বিশ্বাস করে না। সে আর যাচ্ঞা করে না, প্রার্থনা করে না—লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল তাহার নিকটে সম-মূল্য। জীবন-বিধাতার নিয়তি-রূপ সে মানিয়া লয় বটে ; সে-শক্তিকে সে প্রত্যক্ষ করে জীবন-মৃত্যুর বন্ধন-পাশরূপে—সে শক্তি ঈশ্বর নয়, তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই ; এই জগতের অণু-পরমাণু হইতে মানুষের প্রাণ পর্য্যন্ত সৃষ্টির যত কিছু রূপ-বৈচিত্র্য যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন, সেই নিয়ম-বন্ধনের মূলগ্রন্থিরূপেই সে তাহাকে চিনিয়া লয় ; সে গ্রন্থি—আপনাকে আপনি উন্মোচন করা দূরে থাক, একটু শিথিল করিতেও পারে না। ইহাও সে বুঝে—তাহার সেই শক্তির সীমা কতদূর। আমার জীবন-সংস্কারের বাহিরে আমার উপরে তাহার অধিকার কোথায়? জীবনে আমি তাহারই স্ব-বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ আছি ; মৃত্যুতে আমি সকল বন্ধনমুক্ত—অস্তিত্বের বহির্ভূত। অতএব যে মৃত্যুর স্বরূপ-সন্ধান পাইয়াছে—সে আশাহীন, ভয়হীন ; তাহার পরিণাম-চিন্তা নাই, তাহার ভগবান্ নাই। সে হাতযোড় করিয়া কিছুই যাচনা করে না। যে-কেহ এইরূপ দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই

কোনও না কোনও সুযোগ-মূহূর্ত্তে মৃত্যুকে দেখিতে পাইয়াছে—সে দেখা এমন দেখা যে, তাহার পর জীবন-সংস্কারের অনুকূল কোনও রঙিন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। জীবনের নিশীথ-প্রহরের যে লগ্নে সকলে ঘুমাইয়া থাকে, সে তখন সহসা জাগরিত হইয়া প্রকৃতির নেপথ্যগৃহে দৃষ্টিপাত করিয়াছে; সেখানে যে দৃশ্য তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে দুই চক্ষের মায়া-অঞ্জন মুছিয়া গিয়া সর্ব্বমোহের অবসান হইয়াছে—সে চরম সত্যের দীক্ষালাভ করিয়াছে।

মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে—পশুও করে; পশুর জীব-সংস্কার অস্পষ্ট, তাই তাহার ভয়ও অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট সহজাত মৃত্যু-ভয়ের উপরে মানুষ খুব বড় একটা কাল্পনিক ভয়কে খাড়া করিয়াছে—'the dread of something after death'। মানুষ বাঁচিতে চায়—কারণ, বাঁচিয়া থাকার একটা জ্ঞান তাহার আছে—দেহগত জীব-সংস্কার ছাড়া একটা মানস-সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে; এই সংস্কারবশে সে ইহজীবনকে পরজীবনে প্রসারিত না করিয়া পারে না। এই অন্ধ প্রাণগত বিশ্বাসের বশে সে মৃত্যুকে একটা জীবনান্তর সেতু বলিয়া মনে করে—এই সেতুই বৈতরণী, এক পার হইতে আর এক পারে পঁহুছিবার অগ্নিময় খেয়া-পার। পার হওয়ার পর সে থাকিবে; কিন্তু কি অবস্থায় থাকিবে তাহা জানে না। মৃত্যুর সঙ্গেই যদি জীবন-শেষ না হয়, তবে জীবনের শেষ কোথায়? সেই অনন্ত জীবন এক দিকে যেমন তাহাকে আশ্বস্ত করে, অপর দিকে অবস্থান্তরের অনিশ্চয়তা তাহাকে অধিকতর শঙ্কাকুল করিয়া তোলে। মনুষ্য-সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস অতীত কালে যতদূর আমাদের দৃষ্টিরোধ না করে, তাহাতে—খুব আধুনিক যুগ ছাড়া আর আর সকল যুগে—মানুষের মৃত্যুসম্বন্ধীয় এই ধারণাই তাহার জীবনকে সমধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষ তাহার জীবনের অর্দ্ধেক—কি তাহারও বেশি—ভগবান্ ও দেবতাকুলকে বাঁটিয়া দিয়াছে, জীবনের সূর্য্যালোক মৃত্যুপারের রহস্যময় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া দেখিয়াছে, জীবনের উপরে মৃত্যু-চিন্তাকে নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে প্রশ্রয় দিয়াছে। এই ভয়-সংশয়, আশা-বিশ্বাস তাহার সর্ব্ববিধ ভাবনা-ধারণায়—হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিতে পর্য্যন্ত—জড়াইয়া আছে; সে এই নশ্বর দেহের ক্ষুৎপিপাসাকে অমৃত-পিপাসায় শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ভোগের মধ্যে ত্যাগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্য-চরিত্রকে একটা বিরাট্ বীর-মহিমার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এ সকলের মূলে ওই এক সংস্কার—মৃত্যুই শেষ নয়, আত্মা অমর, তাহার গতি লোকলোকান্তরে

অপ্রতিহত, এ জীবন তাহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। এইরূপ ভাবনার দ্বারা জীবনকে শোধন করিয়া মানুষ যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—তাহাতে জীবনের অনেকখানি মৃত্যুর নামে উৎসর্গ করিয়া একটা আপোষ করিতে চাহিয়াছে; নিরতিশয় শূন্য যাহা তাহাকে কল্পনায় পূর্ণ করিয়া সেই বিভীষিকা হইতে যতটা সম্ভব বাঁচিবার প্রয়াস পাইয়াছে। জীবন একটা প্রকাণ্ড আত্মপ্রবঞ্চনা—মানুষের যত কিছু ভাবনা সাধনা এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস।

অতি আধুনিক কালে মানুষের এ বিশ্বাস টলিতে সুরু করিয়াছে, মানুষ ভগবান্ পরলোক প্রভৃতিতে আর তেমন আস্থাবান হইতে পারিতেছে না, আত্ম-প্রবঞ্চনার শক্তি, অর্থাৎ নিছক ভাব-চিন্তা বা কল্পনার শক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। জীবন ও জগৎ এখন বে-আবরু হইয়া পড়িয়াছে, প্রত্যক্ষের তাড়নায় অপ্রত্যক্ষের রহস্য বা ভয়-বিস্ময় এখন ফিকা হইয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, তাহার ফলে মানুষের আত্ম-প্রত্যয় যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মানুষ যেন আত্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মৃত্যুকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখার যে কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—স্বাভাবিক কারণেই তাহা হইতে পারে না; অথচ মানুষ অপ্রত্যক্ষের ভয় বা আশ্বাস হারাইতেছে। প্রত্যক্ষ জীবনের কোনও মহত্ব সে উপলব্ধি করে না—ক্ষুদ্র আয়ুষ্কালের যতকিছু সুখ-দুঃখ, কেবলমাত্র ভোগ করিতে পারা বা না-পারার মূল্যে সে গ্রহণ করিতেছে; জীবনকে সে পণ্য-স্ত্রীর মত ভোগ করিতে চায়, মৃত্যুসম্বন্ধে সে উদাসীন।

মৃত্যুসম্বন্ধে মানুষের মনোভাবের এই দুই দিক্ তুলনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, মৃত্যুসম্বন্ধে সত্য-ধারণা জীবনের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনই প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু মৃত্যুসম্বন্ধে মিথ্যা কল্পনার প্রয়োজন আছে; সেই মিথ্যাই মানুষের জীবনকে যে রঙে রঙিন করিয়া তোলে, তাহার রক্তে যে অবসাদ বা উন্মাদনা জাগায়, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ হয়—কামনার শক্তি বাড়ে। দেহযন্ত্রে রক্ত-সঞ্চালনই জীবন নহে—সেটা জীবন-ক্রিয়া মাত্র, কামই জীবনীশক্তির মূল। এই কাম যদি কল্পনাহীন হইয়া পড়ে—যদি জীবন-ক্রিয়ার বাহিরে তাহার কোনও স্ফূর্ত্তির অবকাশ না থাকে, তবে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার ভোগ-ক্ষমতাও কমিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত মানুষ যেখানে যত শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহার মূলে আছে প্রবল কামনা। তাহাকে জয় করা, অথবা জয়ী করা—এই উভয়ের শক্তি এক; এ শক্তির মূলে আছে মরণান্তরিত মহাজীবনের স্বপ্ন,

অমরতার আশ্বাস। তাহার ভরসায় মানুষ যেমন ইহজীবনের সর্ব্বস্ব হাসিমুখে ত্যাগ করিতে পারে, তেমনই ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভোগের পথে নিঃশেষে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারে; কারণ উভয়ত্র এ বিশ্বাস আছে যে, ইহাই শেষ নয়—আমার মৃত্যু নাই, শেষ পর্য্যন্ত কোনখানে ক্ষয় বা আশঙ্কা নাই; যে অসীম অনন্ত জীবন সম্মুখে নিত্যকাল প্রসারিত হইয়া থাকিবে, তাহাতে কত অবস্থান্তর, কত জয়-পরাজয়, কত লাভ-ক্ষতির অবকাশ আছে। দুঃখ কিসের? কার্পণ্যের প্রয়োজন কি? ভোগেই হোক আর ত্যাগেই হোক, মানুষের অন্তরের অন্তরে সেই বিশ্বাস থাকে—সেই কল্পনার শক্তিই মানুষকে এত শক্তিশালী করিয়া তোলে।

অতএব, মানুষের পক্ষে এই কল্পনাই ভাল—সত্য ভাল নয়; সত্য বিষ, সত্য মারাত্মক। মানুষের সমগ্র জীবনাদর্শের মূলে আছে এই প্রকাণ্ড ছলনা, এই মহতী মিথ্যা। যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, দার্শনিক কেহই এই মিথ্যার সেবা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই; নাস্তিক বা আস্তিক, ভক্ত বা জ্ঞানী, সকলেই—কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূলভাবে—এই মিথ্যার আরাধনা করিয়া থাকে। মৃত্যুর অন্তর্নিহিত যে সহজ প্রত্যক্ষ সত্য তাহাতে আস্থাবান না হইবার একমাত্র কারণ—মানুষ মরিতে চায় না; এমন কথা স্পষ্টই বলে—যেহেতু আমি মরিতে চাই না, অতএব আমি মরিব না। মৃত্যুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই দার্শনিক যে সকল তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাতে সে-প্রশ্নের কোনও সরাসরি জবাব মেলে না। সচ্চিদানন্দ-ব্যবসায়ী বৈদান্তিক অস্তি-ভাতি-নাম-রূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যার দ্বারা, ক্ষুদ্র আস্তিক্যবুদ্ধি লোপ করিয়া, মহা আস্তিক্যবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হইয়া উঠেন। বেশ বুঝিতে পারিবে, থাকা অর্থে তুমি যাহা অনুভব কর, তোমার যে একমাত্র সহজ ব্যক্তি-চেতনা ব্যতীত আর সকলই তোমার সংস্কার-বিরোধী—যাহাকে ছাড়িয়া আর কিছুরই ভাবনা তোমার সত্যকার ভাবনা হইতে পারে না—তাহা যে মিথ্যা, অর্থাৎ তুমি থাকিবে না, তোমার সে অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইবে—এ কথা দার্শনিকমাত্রেই স্বীকার করিবে; কিন্তু তাহার স্থানে একটি অতি বিশুদ্ধ অস্তিত্ব, একটি নামগোত্রহীন সত্তার আশ্বাসে তোমাকে আশ্বস্ত হইতে হইবে—ইহারই নাম আস্তিকতা। যাহারা নাস্তিক্যবাদী তাহাদের মতের সঙ্গে এই মতের বিশেষ পার্থক্য নাই; যাহা কিছু পার্থক্য—সে কেবল চিন্তাপ্রণালীর সূক্ষ্ম কৌশল-ভেদ। ইহাদের নিকট মৃত্যুসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই দেখিবে, ইহারা সহজভাবে তাহার

উত্তর দিবে না—যেন প্রশ্নটা নিতান্তই স্থূল। তাহার কারণ, তাহারাও মৃত্যুকে দেখিবার সাহস করে না, প্রাণের অনুভূতিকে জ্ঞানের দ্বারা রোধ করিয়া মনস্বিতার নামে অন্যমনস্ক হইতে চায়। আসল কথা, তাহারাও মানুষ—জীবধর্ম্মী ; মৃত্যুর স্বরূপ-চিন্তা তাহাদেরও সংস্কার-বিরোধী।

মনে কর, কোনও বড় কর্ম্মী বা জ্ঞান-বীরের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। মৃত্যুর আক্রমণে দেহ বিবশ, মুহুর্মুহু আক্ষেপ হইতেছে—মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত, চেতনা আচ্ছন্ন, চক্ষুতারকা দৃষ্টিহীন। সে সময়ে, সে ব্যক্তির মহত্ত্ব, তাহার কীর্ত্তি বা তপস্যা-গৌরব স্মরণ করিয়া—তাহার সেই মৃত্যুমলিন দীন কাতর মূর্ত্তির প্রতি করুণা অনুভব না করিয়া পার? ভাল করিয়া তাহার সেই মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট নিশ্বাস, দেহের সেই অন্তিম মিনতি-পূর্ণ-আবেদন যদি বুঝিয়া থাক, তবে মহান্ আত্মা বা মহতী কীর্ত্তির এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নিরীক্ষণ করিয়া, এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইবে না যে, সে ব্যক্তির জীবন ধন্য হইয়াছে—তাহার মৃত্যু মৃত্যুই নয় ; বরং, মনে হইবে, ওই ব্যক্তি সর্ব্বজীবের মতই আজ মৃত্যুর অধীন হইল—এ মুহূর্ত্তে তাহার নিজের পক্ষে সর্ব্ব কীর্ত্তি, সর্ব্ব গৌরব বৃথা ; তাহার কীর্ত্তির জন্য জীবিতেরা জয়ধ্বনি করিবে, কারণ সে কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী তাহারা ; কিন্তু ঐ যে প্রাণ-বুদ্বুদ অসীম শূন্যে বিলীন হইতেছে, উহার রহিল কি? নশ্বরতার হাত হইতে কোন্ কীর্ত্তি তাহাকে রক্ষা করিবে? সকল মিথ্যা অভিমান, মনোগত সংস্কার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুর পানে চাহিয়া দেখ—তাহার মরজীবনের চরম লাঞ্ছনা, তাঁহার ক্ষণ-অস্তিত্বের চির-অবসান, নিয়তির নির্ম্মম অট্টহাস চাক্ষুষ করিতে পারিবে। জীবনের চেয়ে বড় কি আছে?—সেই জীবন হইতে বঞ্চিত হওয়ার যে নিদারুণ নিঃস্বতা,' তাহা কি ওই ব্যক্তির পক্ষে সত্য নয়? সে কি কাহারও চেয়ে কম হতভাগ্য? মৃত্যুর আঘাতে তাহার মুখ কি কালিমালিপ্ত হয় নাই—তাহার মহাপ্রাণী কি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিবার চেষ্টা করিবে না? চাহিয়া দেখ—মহামনীষী, মহাপুরুষ বা মহাবীরের মৃত্যুও মৃত্যু ; তাহার সেই মৃত্যুকালীন মুখচ্ছবি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে, মৃত্যুই চরম অভিশাপ, কোনও কীর্ত্তি কোনও গৌরব সে ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না—যাইবার সময় তাহাকেও ভিখারীর মত যাইতে হইবে!

মৃত্যুকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়—মস্তিষ্কের সাহয্যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নয়। যাহার প্রেম যত বড়, যাহার হৃদয়-বৃত্তি যত গভীর—সেই মৃত্যুকে তত সুস্পষ্ট দেখিতে পায় ; সে সহজেই আত্ম-সংস্কার

বিসর্জ্জন দিতে পারে বলিয়াই মৃত্যু তাহাকে ফাঁকি দিতে পারে না। মহাপ্রেমিক নহিলে নাস্তিক হইতে পারে না। মৃত্যু যে কত বড় পরিসমাপ্তি, কত বড় শূন্য, তাহা আত্মাভিমানী জ্ঞানী বুঝিবে কেমন করিয়া? যে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে না, যে নিজে মরিতে ভয় পায়, সে আপনার জন্য একটা অবিনশ্বরতার স্বপ্ন দেখে—যেমন অর্থেই হোক, একটা অস্তিত্বের অভিমান সে শেষ পর্য্যন্ত ধরিয়া থাকিবে। তাই যে গেল সে যে একেবারেই গেল, এমন বিশ্বাস সে প্রাণ থাকিতে করিবে না। কিন্তু যে পরের মৃত্যুতে আপনার ভাবনা না ভাবিয়া পরের ভাবনাই ভাবে; যে মরিল তাহার আত্যন্তিক অভাব অনুভব করার পক্ষে যাহার নিজ পরিণাম-ভাবনা বাধা হইতে পারে না, সে-ই অন্তরের অন্তরে বুঝিতে পারে—মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না; কারণ, সে যে মৃত প্রিয়জনের সম্পর্কে সত্যকেই চায়, মিথ্যা দিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে তাহার হৃদয় একান্ত বিমুখ। এজন্য প্রেমই মানুষকে মৃত্যুর স্বরূপ দেখায়, প্রেমিক ভিন্ন আর কেহ নাস্তিক হইতে পারে না। জগতের আদি মহাপ্রেমিক বুদ্ধ-ভগবান্ এই জন্যই নাস্তিক ছিলেন; তিনি আত্মার গল্পে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—তিনি মৃত্যুকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই জন্মস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য নির্ব্বাণ-মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

মৃত্যু-দর্শনসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা তত্ত্বালোচনা বা চিন্তাবিলাস নয়। মৃত্যুর তত্ত্বালোচনা করিতে হইলে সমগ্র মানব-চিন্তার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে হয়, তাহাতেও মৃত্যুসম্বন্ধে কোনও সংশয়রহিত জ্ঞান-লাভ হইবে না; তাহার প্রমাণ, মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা এ পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে। যত যুক্তি, যত পাণ্ডিত্য, যত সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্করীতিই এ বিষয়ে নিয়োজিত কর, কিছুতেই কিছু হইবে না। এই মহা রহস্য-নিকেতনের দ্বারে স্বয়ং মহাকাল ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কোনও জিজ্ঞাসার অবসর সেখানে নাই। সে উপায় নাই বলিয়া মানুষ দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়াছে, অর্থাৎ এক-তরফা আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে—কিন্তু মহাকাল তেমনই নীরব। যে কলস শূন্য তাহাকে উল্টাইয়া নিঃশেষ করা যেমন অসম্ভব, তেমনই যে তত্ত্ব মূলেই নাস্তি, তাহার সন্ধান শেষ হইতে পারে না। তাই, সন্ধানের বস্তুটার চেয়ে নেশাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার কারণ, সত্য মানেই ধ্বংস, প্রলয়, শেষ,—নেশাই জীবন। এ নেশা ভাঙিতে চাহিবে কে? অর্থোপার্জ্জন যেমন নেশা, ধর্ম্মোপার্জ্জন যেমন নেশা—বিদ্যা-উপার্জ্জন বা তত্ত্ব-চর্চ্চাও সেইরূপ নেশা। যে সত্যের পিছনে মানুষ যুগ

যুগ ধরিয়া ছুটিতেছে তাহাকে পাইতে হইলে সকল নেশা ত্যাগ করিতে হয়; চক্ষুর দৃষ্টি—দূরে নয়—নিকটে সংলগ্ন করিতে হয়; জ্ঞানের অভিমান নয়—প্রাণের ঐকান্তিকতা অর্জ্জন করিতে হয়। যাহাকে শিকার করিয়া ধরিতে চাও সে শিকারের বস্তু নয়, জ্ঞান-বুদ্ধির নিশিত শরও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না; সে ধরা দেয় স্বেচ্ছায়—সে বাস করে হৃদয়ের অতি সন্নিকটে। সমস্যার সে গ্রন্থি অতি সরল; তাহাকে খুলিতে হইলে অতি লঘুস্পর্শ অঙ্গুলির চকিত প্রয়োগই যথেষ্ট, বল প্রয়োগ করিলেই সে বন্ধন বজ্রকঠিন হইয়া উঠে। মৃত্যু আমাদের প্রাণের অতি সন্নিকটে বাস করিতেছে, তাহাকে আমরা অহরহ দেখিতেছি তথাপি তাহাকে চিনি না কেন? চিনিলে যে আমাদের নেশা ছুটিয়া যায়! আমরা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি বাঁধিয়া নেশা বজায় রাখিয়াছি, পাছে সকল রহস্যের মূল এই মৃত্যু অতি সরল হইয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে—তৎক্ষণাৎ সকল আশা সকল সংশয় ছুটিয়া যায়। যাহা চরম সত্য, তাহাই পরম সরল—যাহা যত জটিল তাহা ততই মিথ্যা। জগতে যেখানে যে সত্যকে লাভ করিয়াছে সে এইরূপ সরল অকুতোভয় দৃষ্টির সাহায্যেই তাহাকে লাভ করিয়াছে—তাহাতে তর্ক নাই, চিন্তা-বিলাস বা যুক্তি-তর্কের আস্ফালন নাই। মৃত্যুসম্বন্ধে যে সত্য, তাহাকেও তেমনই ভাবে লাভ করা যায়—অন্য উপায় নাই। সে সত্য প্রবেশ করে হৃদয়ে, অথচ হৃদয়কেই বিদীর্ণ করে। যখন সেই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন শোক করিতে গিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হয়—কোনও অজুহাত, কোনও আশ্রয় পায় না; উচ্ছ্বসিত রোদন যখন সেই মহাশূন্যের অট্টহাস্যে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন বুঝিতে পারি, এ সত্যের সাক্ষাৎকারে কতখানি শক্তির প্রয়োজন। যে নিমেষে মিথ্যার মোহপাপ মোচন করিয়াছে তাহার শাস্তি কি ভীষণ! তাই মৃত্যু-দর্শনের কথা যাহা লিখিয়াছি, তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যু যত বড় অভিশাপ, মৃত্যু-দর্শন তাহার চেয়ে বেশি। মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা দার্শনিক চিন্তা-বিলাস লইয়াই থাকুক—মৃত্যুর সত্যকে উপলব্ধি করার মত দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়।

শ্রাবণ, ১৩৩৯

অভয়ের কথা

(গ্রন্থ-পরিচয়)

গ্রন্থের নাম "অভয়ের কথা"। শুনিলেই মনে হইবে, 'অভয়'-নামক কোন ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী ইহাতে আছে। এমন ত' কত কথা ও কাহিনী সাহিত্যের আকারে শ্রুতিরোচক হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'অভয়' একজন ব্যক্তি না হইলেও এমন একটি বস্তু—যাহা মনুষ্য-মাত্রের অতি পরিচিত ও প্রিয়; একটি পরম-তত্ত্বকে গ্রন্থকার ঐ নামে সকলের হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; সেই বেদান্তের জিজ্ঞাসাকে মানুষের প্রাণের—তাহার জীব-জীবনের—উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন; এইজন্যই, মূলে বেদান্ত-প্রসঙ্গ হইলেও, ইহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে আমরা মানুষের জীবন ও মানুষের নিয়তিকে নানারূপে প্রতিলিখিত হইতে দেখি; যে-সাহিত্য মানুষের প্রাণের গভীরতম আকুতিকে যত নিঃসংশয় অথচ মহিমান্বিত করিয়া তোলে সেই সাহিত্যই তত বড়। আধুনিক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিদ্‌গণের মতে—

"মানব-হৃদয়-বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—Mind ও Soul, উভয়ই ষ্টাইলকে পুষ্ট করিয়াছে; যে-রচনায় অতিশয় জটিল বিষয়-বস্তু যেমন সুসম্বদ্ধ আকারে পরিণত হইয়াছে, তেমনি colour ও mystic perfume বাদ পড়ে নাই, এবং যাহার মধ্যে 'soul of humanity'—বিশ্বমানবের হৃদয়-স্পন্দন—অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই Great Art, অতএব তাহাই শ্রেষ্ঠ ষ্টাইল।"

ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই গ্রন্থখানি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত; ইহাতেও Mind এবং Soul অর্থাৎ, জ্ঞান এবং প্রেম—দুইই আছে। ইহার বিষয়বস্তুও এক অর্থে অতিশয় জটিল—ভারতের বিভিন্ন যুগের বিরাট্‌ বহুমুখী চিন্তাধারাকে একটি সুসম্বদ্ধ রূপে পরিণত করা হইয়াছে; colour ও mystic perfume, অর্থাৎ নেত্রসুখকর বর্ণমাধুরী (রূপ-রস) এবং অজানা জগতের পুষ্প-সৌরভ (অরূপ-রস) ইহাতেও আছে; এবং সবচেয়ে বড় যাহা—সেই

নিখিল মানব-প্রেমের চিরন্তন আকুতি ইহাতেও এক গভীর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে।

তথাপি 'অভয়ের কথা' বেদান্ত-কথা হইয়াও এমন হৃদয়গ্রাহী হয় কেন? তাহার কারণ, এই গ্রন্থের মূল প্রেরণা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞান নয়—প্রেম। গ্রন্থকার নিজে জ্ঞানমার্গ নহেন, তিনি প্রেমিক। যে-অমৃত তিনি নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রাণের তীব্র পিপাসা শান্ত হইয়াছে, তিনি অপরকেও তাহা পান করাইতে চান। একটা উচ্চ আসন হইতে মানুষকে জ্ঞান-বিতরণ করা নয়—এ যেন তাহাদিগকে বুকে জড়াইয়া, পায়ে ধরিয়া সেই রস পান করাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষা; তিনি যেন নিজের সেই বেদনা অপরের মধ্যেও অনুভব করিয়াছেন। অতএব এখানে শুধু রস নয়, সেই রস-পরিবেষণের ভঙ্গিটিও ইহার সাহিত্যিক ষ্টাইলকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

ইহার বিষয়ও মানুষের সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা,—যে-জিজ্ঞাসা হইতে বেদান্তের জন্ম হইয়াছে, যে-জিজ্ঞাসা মানুষমাত্রের হৃদয়-শোণিতে বাসা বাঁধিয়াছে। সেই এক জিজ্ঞাসার বশে মানুষ যেমন বেদান্ত রচনা করে, তেমনই, কাব্য-নাটক, চিত্র-সঙ্গীত, মূর্ত্তি-প্রতিমূর্ত্তি, স্তম্ভ ও দেউল—কত কি সৃষ্টি করিয়াছে! লেখক বেদান্ত-আলোচনায় মনুষ্যহৃদয়ের সেই মর্ম্মস্থলটির প্রতি প্রথম হইতেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। মানুষ যত বড় বীর হোক, যত বড় জ্ঞানী ও নাস্তিক হোক, তাহার প্রাণের সেই একটি ক্রন্দনকে সে রুদ্ধ করিতে পারে,—স্তব্ধ করিতে পারে না। সেই যে দুঃখ, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি-লাভের কত চেষ্টা ও কত পরাজয়—সুখলাভের জন্য কত কৌশল, শক্তি ও প্রতিভার কত প্রাণান্ত প্রয়াস! তবু সে যে ক্ষণিক বিস্মৃতি-সুখ মাত্র, সে সুখ আত্ম-প্রবঞ্চনার সুখ, এমন কি সে একপ্রকার নেশা, ইহা কোন্ মানুষ অস্বীকার করিবে? পৃথিবী বৃদ্ধ হইয়াছে, মানুষের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার অন্ত নাই; তবু ঐ নেশার ঘোর একটু কাটিলে মানুষ একদণ্ড বাঁচে না। এক বিদেশী কবি সেই যে বলিয়াছেন, "Be drunk, always drunk and with anything—money, wine, women, poetry; কিন্তু দেখিও, যেন একবারও চোখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে না হয়—কয়টা বাজিল?"—ইহাই সত্য, সুখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। গ্রন্থকারও যেন তাহা বুঝিয়াছেন, সেই নেশার বস্তুই তিনিও খুঁজিয়াছেন। সুখ তিনিও চান, কিন্তু সুখের মূল্য যেমন বেশী, তেমনই তাহা যে দুঃখেরই ছদ্মরূপ! ঐ দুঃখ-

নিবৃত্তির জন্যই মানুষ আদিকাল হইতে চেষ্টিত আছে, ইহাই মানুষের চিরন্তন ব্যবসায়। তাই আড়াই হাজার বা দুই হাজার বৎসর আগেও যেমন, আজিও তেমনই—মানুষ সেই এক বাণী শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, তার চেয়ে বড় আশ্বাস যে আর নাই! সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এমন মধুর কথা কি আর আছে?—"Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest."

আহা, এমন কথা কি সত্য? গ্রন্থকারও তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনিও আমাদের সকলের হইয়া সেই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সুখই চাই, কিন্তু আছে কি? কেহ তাহা দিতে পারে? যদি না পারে, তবে কোন তত্ত্ব-কথায় আমার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে এই তত্ত্বকথার চূড়ান্ত হইয়া গেছে, তিনি সেই কথার প্রায় সবগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও দেখাইয়াছেন। তাহাতে দেখা গেল, শেষ পর্য্যন্ত 'সুখ' বলিয়া কোন বস্তুরই সন্ধান মেলে না, বড় জোর দুঃখনিবৃত্তিই হইতে পারে; বেদান্তও তাহার অধিক কিছুর আশ্বাস দেয় না। সাক্ষাৎ সুখ বলিয়া কিছুই নাই।

এই বেদান্ত-ব্যাখ্যা যে এমন রসরূপত্ব লাভ করিয়াছে তাহার কারণ, ইহার বক্তা একজন পরম বৈষ্ণব, অথচ বেদান্তের সেই বিশুদ্ধ, অতিশয় অ-বৈষ্ণব তত্ত্বটির প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত নাই। একজন বিশ্বাসী ও ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের পক্ষে এইরূপ মুক্তপ্রাণে বেদান্তের ওকালতি করা অসম্ভব বলিলেই হয়; লেখক যে মাঝে মাঝে তাঁহার বৈষ্ণব-মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন নাই এমন নহে, তথাপি তিনি সেই 'অদ্বয়-ব্রহ্ম'কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাকেও ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। 'অভয়ের কথা' শেষ করিয়া 'ঠাকুরাণীর কথা'র আরম্ভে তিনি এমন কথা বলিয়াছেন বটে যে—

"আমি'-নামধেয় সচ্চিদানন্দ অভয়-ব্রহ্মের ওকালতি করিয়াছি। ব্রহ্ম মহাশয় নির্গুণ বলিয়া কিছুই পারিশ্রমিক দেন নাই, পারিতোষিক ত' দূরের কথা।"

রহস্যচ্ছলে হইলেও ইহার একটা শ্লেষ-অর্থ আছে, তাহা এই যে—অদ্বৈত-ব্রহ্মের উপাসনায় শেষ পর্য্যন্ত শূন্যই লাভ হইয়া থাকে—অথবা লাভালাভের কোন প্রশ্নই নাই। কোন বৈদান্তিক অবশ্য এমন কথা বলিলেন না, গ্রন্থকারও বৈদান্তিক হিসাবে এ কথা বলেন নাই।

(২)

আমি এইবার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

(১) "শিবের গলে সর্প—নিকটে সর্পভুক্ ময়ুর; মস্তকে গঙ্গা—ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি; জীবনস্বরূপ সুশুভ্র রজত-কান্তি—কণ্ঠে মরণ-চিহ্ন বিষ-নীলিমা। খাদ্য বলদসহ খাদক সিংহ; বোকা লক্ষ্মী, সেয়ানা সরস্বতী; ধনপতি কুবের ভৃত্য, অথচ দিগ্বসন; দগ্ধ মদন, অথচ ঔরসপুত্র কার্ত্তিকেয়; অন্নপূর্ণা গৃহিণী, উপজীবিকা ভিক্ষা।"

(২) "কঠিন পাষাণেও চিৎ আছে; পাষাণ হইতে অপূর্ব্ব-সুন্দরী অহল্যা, ও স্তম্ভ হইতে মহারাজ নরসিংহ আপনাদিগকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখনও পটে-পাষাণে অঙ্কিত নর-নারীর নীরব-মুখর মূর্ত্তি আমাদের সঙ্গে যেন কথা কহিয়াই নানা বিচিত্র ভাব জাগাইয়া পাগল করিয়া তোলে।"

(৩) "ঈশ্বরের রসাস্বাদ উদ্দেশে, ইচ্ছাশক্তি নানা নট-নটীরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বরসমক্ষে নানা কৌতুককর বিচিত্র লীলা প্রকট করে। কখনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সাজিয়া, নিজে স্বল্পায়ুঃ হইয়াও, দণ্ড, পল, বৎসর বা শতাব্দীকে তুচ্ছ করিয়া, সময়ের বৃহৎ মাপকাঠি সাহসপূর্ব্বক প্রস্তুত করে—ভূপৃষ্ঠের স্তরনির্ম্মাণ-দীর্ঘকালকে পরিমাণদণ্ড লইয়া দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মাণ্ডের বয়ঃক্রম স্থির করিবার উদ্যম করে।...কখন বা সূচীছিদ্রে সংখ্যাতীত প্রাণীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়া বিস্ময়রসের অবতারণা করে। কোথাও বা অলস আলাদিন সাজিয়া নিরতিশয় অনলসে আশ্চর্য্য-দীপানুসন্ধানে জীবন কাটাইয়া দেয়। কোথাও বা সর্ব্বধ্বংসকারী মহাবল অগ্নিকে ক্ষুদ্র শীতল দীপ-শলাকা-কৌটায় নিরাপদে বাঁধিয়া রাখে।... অভিনয়ে ঈশ্বরের সুখই হয়, দুঃখ হয় না; দুঃখ অভিনয়ের বলিয়া রসপোষক, সুতরাং রসরূপই।"

(৪) "কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন; সোনার পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন, তাহা বসন নহে—তাহা শ্রীরাধা, হ্লাদিনী ভালবাসা ঠাকুরাণী।..."

"ঠাকুরাণী বলেন যে, পরাণ-বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি।... আমি নন্দ মহারাজ হইয়া তোমার জন্য হাটবাজার করিব, এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালনপালন ও শাসন করিব।...ধেনু হইয়া তোমার সাথে ফিরিব, বনে ঘন-দুগ্ধ তোমাকে পান করাইব; বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধা-নাম

গাহিব; তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিব; আমি তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার বনমালা হইব, কদম্বতরু হইয়া গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব; মলয়পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিব; অঙ্গ-পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব।...নানা ঋতুর বৈচিত্র্য স্বীকার করিব; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান—লতাবিতানে আমাদের সুখশয্যা, শারদচন্দ্র, রাসস্থলী, মরালের নৃত্য, কোকিলের সঙ্গীতাদি—কলাবিদ্যা সকলই হইব; তুমি সকল রকম রসের মধ্যে কোনটিতেই বঞ্চিত হইবে না।"

গ্রন্থখানিতে যে তত্ত্বের প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহার সমালোচনা করি এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি সাধারণ পাঠক-পাঠিকারই একজন। সেই সাধারণ মানব-মনের যে জিজ্ঞাসা ও আকুতি, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতি আমাকে অতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আমরা গ্রন্থকারের মত পণ্ডিত নহি, কিংবা তাঁহার মত কোন আধ্যাত্মিক প্রত্যয় বা ধর্ম্মোপলব্ধির অধিকারীও নহি। গ্রন্থকার তাহা জানেন। তিনিও আমাদিগকে কোন শাস্ত্রমতে বিশ্বাসী হইতে বলেন নাই; সেই উদারতা—খাঁটি হিন্দুত্বের যাহা লক্ষণ—তাহা যদি গ্রন্থকারের না থাকিত, তবে তিনিও বেদান্ত-আলোচনার অধিকারী হইতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগকে কেবল ভাবিতে বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, এবং ইহাই আশা করিয়াছেন যে, এইরূপ আলোচনা-শ্রবণে, আর কিছু না হইলেও, আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইবে। হইবারই কথা; কারণ এই গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার মত মহিমা যে আর কিছুরই নাই।

কিন্তু গ্রন্থকার অতিশয় নম্রতা সহকারে কেবল ইহাই দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহার এই বেদান্ত-ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমাদের অন্ততঃ চিত্তশুদ্ধি হইবে। এটুকুও যে তিনি আশা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ; কারণ আমাদের একালের শিক্ষা-দীক্ষা ও মনোভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; আমরা শুধুই নাস্তিক নই—আমরা অশিক্ষিত, এবং আমাদের হৃদয়বৃত্তিও অতিশয় দুর্ব্বল।

তথাপি তারাস্তৃত নিশীথ-আকাশের সুন্দর-গম্ভীর মহিমা আমাদের চিত্তকে যেমন শান্ত ও নির্ম্মল করে—অনন্তের সেই জ্যোতির্ম্ময় বিস্তার-দর্শনে আমরা যেমন অন্তরে একটি মহিমা বোধ করি—এই গ্রন্থের বিষয়টিকে চিন্তা করিয়া, আত্মার বিরাটত্বকে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া—আমাদের চিত্তের কিঞ্চিৎ সমুন্নতি

অসম্ভব নয়। আমরা যদি কোন জ্ঞানলাভ নাও করি—আমাদের বিশ্বাস বা আস্তিক্য-বুদ্ধি যদি দৃঢ়তর নাও হয়, তথাপি এই গ্রন্থপাঠের ফলে আমাদের মনের স্বাস্থ্য যে কিছু বৃদ্ধি পাইবে, একটা বায়ু-পরিবর্ত্তনের ফললাভও যে হইবে, আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ সে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন।

তৎসত্ত্বেও যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমার মত পাঠক ইহার ঐ তত্ত্বালোচনা হইতেও কি কোন উপকার পায় নাই? তাহার উত্তরে আমি এস্থলে বিস্তারিত-ভাবে কিছু বলিব না—সে সমালোচনার স্থান এ নহে। আমি জানি, আজিকার দিনে তত্ত্বের কোন পৃথক্ মূল্য নাই; কোন চিন্তা কোন সত্যই এখন ব্যক্তি বা দীক্ষিত-শিষ্যের উপাদেয় হইলেই চলিবে না; পাণ্ডিত্যের কথা স্বতন্ত্র। কেবল ইহাই বলিব যে, প্রথম-যৌবনে এই গ্রন্থের সহিত যখন আমার পরিচয় হয় তখন ইহার মধ্যে আমি যে এক নূতন চিন্তা ও ভাবের জগৎ উদ্ঘাটিত হইতে দেখি, আমার ভাব-জীবনে তাহা চিরদিন আধিপত্য করিয়াছে। ঐ তত্ত্ব যেমনই হৌক, উহা গৌণভাবেও আমার চিন্তাকে কোন একটা দিকে চালিত করিয়া থাকিবে—আমার নিজস্ব ভাব-চিন্তাকে বাধাহীন ও স্বচ্ছন্দ করিয়া থাকিবে। সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থের—বিশেষতঃ সাহিত্য-গ্রন্থের ইহাই প্রধান কাজ; এইজন্যই তাহাকে 'Literature of Knowledge' না বলিয়া 'Literature of Power' বলাই সঙ্গত। 'অভয়ের কথা' আমার নিকটে মুখ্যতঃ ঐরূপ সাহিত্য-গ্রন্থই বটে, উহার ভাষা এবং রচনাভঙ্গিও আমাকে অল্প মুগ্ধ করে নাই—সেদিক দিয়াও উহার নিকটে আমি ঋণী। যৌবনে ইহার অধিক প্রয়োজন ছিল না, আজ বৃদ্ধ হইয়াছি, তাই তত্ত্বের দিকটাও বড় হইয়া উঠিয়াছে। 'অভয়ের কথা' বা অদ্বয়-বেদান্তের শেষ-সিদ্ধান্তে গ্রন্থকারও যাহা পান নাই, আমিও তাহা পাই নাই—কিন্তু অন্য কারণে। এইবার সেই কথাই বলিব।

(৩)

গ্রন্থকার যাহার নাম দিয়াছেন 'অভয়', তাহা সেই বেদান্তের 'আত্মা' বা 'ব্রহ্মপদ'—জীবের মুক্তি বা স্বরূপে পুনরবস্থিতি। এই 'আত্মা'কে লাভ করিলে আর কোন ভয় থাকে না, উহাই প্রকৃত অভয়ের অবস্থা। মানুষ যে অভয় হইতে পারে না, তাহার কারণ, সে একটা মিথ্যা সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, ঐ সুখ দুঃখেরই অপর পিঠ মাত্র; তবু মানুষ দুঃখটাকে কৌশলে ত্যাগ করিয়া সুখটাকেই পাইতে

চায়, যতই তাহা অসম্ভব হউক না কেন, কিছুতেই বিশ্বাস করে না যে, সুখ একটা মরীচিকা। ঐ দুঃখ-ভয় থাকিবেই ; একটু জ্ঞান হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সুখও নয়, দুঃখও নয়,—আসল সমস্যা, ঐ সুখ-দুঃখের গোলকধাঁধাটি পার হওয়া ; সুখ পাওয়া নয়, অভয় হইতে পারা। ঐ অভয় কথাটি সুখ নয়, আনন্দের অবস্থা—সুখ তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতিশয় হেয়। সেটি যে কি বস্তু তাহা বাক্যের দ্বারা বুঝানো যায় না ; তাহা 'বুঝিতে' হইলে—'পাইতে' হয় ; যে পাইয়াছে সেই বুঝে—যেমন মৃত্যু কি, তাহা যে মরিয়াছে সেই জানে ; যাহার মৃত্যু এখনও হয় নাই, সে জানে না, জানিতে পারে না। গ্রন্থকার এই তত্ত্বটি অতি উত্তমরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুখ-সাধনের নানা পন্থার দোষ এবং অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া তিনি অবশেষে দুঃখনিবৃত্তির বৈদান্তিক সাধনাও আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, বেদান্তের সেই পরম অভয়কে পাইতে হইলে এত বড় শক্তি চাই, যাহা দ্বারা শুধুই দেহটাকে বশীভূত করাই নয়—দেহ-সংস্কারই বর্জ্জন করা যায়। বলহীন হইলে সেই আত্মাকে লাভ করা যাইবে না। আধ্যাত্মিক সাধনামাত্রেরই সম্বন্ধে বেদান্তের এই কথাটাই সার-সত্য—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। আত্মাকে আত্মার দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে—আর কেহ উদ্ধার করিবে না ; কারণ ঐ আত্মা ভিন্ন আর কেহ ত' নাই। এই অদ্বৈতের যত প্রকার রকম-ফেরই কর—শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, বা দ্বৈতাদ্বৈত—কথা সেই একই ; বেদান্ত যাহা স্পষ্ট করিয়া বলে, অন্যান্য আখড়াধারীরা তাহাই ঘুরাইয়া, একটু রঙ অথবা রস তাহাতে যোগ করিয়া, মানুষকে আরও সহজ পথের আশ্বাস দেয়। একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, 'আমি' ছাড়া আর কেহ নাই—'আমি'টাকেই ঘুরাইয়া 'তুমি' করিতে হয়। জ্ঞানই হৌক, আর প্রেমই হৌক—নির্গুণ ব্রহ্মই হৌক আর সগুণ ভগবানই হৌক—'এক'-এর সমাধিই হৌক, বা 'দুই'-এর রস-লীলাই হৌক—মূলে এক বই দুই নাই ; অর্থাৎ, সবই ঐ 'আমি'টার উপরে নির্ভর করে। মানুষ যেমন পাপ-পুণ্যে, ভোগে-ত্যাগে, সব কিছুতেই স্বার্থপর না হইয়া পারে না—সবই সেই স্ব-অর্থে ; সেই বন্ধন যেমন তাহার নিজেরই বন্ধন, আর কাহারও নয় ;—তেমনই, মুক্তি তাহার একান্ত নিজেরই, আর কাহারও নয়, তাহাতেও সে অনন্য-সহায়। সেখানেও তাহাকে 'স্বার্থপর' হইতে হইবে। যে স্বার্থপরতাকে আমরা ঘৃণা করি, তাহা স্থূল ; তাহাই যখন

সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই মুক্তিলাভের উপায়। ইহাই বড় রহস্য। বেদান্ত এই তত্ত্বটিকে একেবারে মূল পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছে। ইহাই পরম তত্ত্ব, আর সকল তত্ত্বই ঐ তত্ত্বের সুলভ বা জনগণ-বিনোদন সংস্করণ মাত্র।

ঐ সঙ্গে যে আর একটি কথা বেদান্তের হেথা-হোথা উঁকি দেয়, এবং তাহাতেই একরূপ দ্বৈত-উপাসনা—ভক্তি, কৃপাবাদ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও মূলে সেই একই তত্ত্ব। ঐ যে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—'আত্মা যাহাকে নিজে বরণ করেন সে-ই আত্মাকে লাভ করে'—উহার এমন অর্থ করিতে হইবে না যে, এক আত্মাকে আর একটা বড় কোন আত্মা বরণ করেন, বা কৃপা করেন; শুধু ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই একই আত্মার, সেই একই 'আমি'র 'বলহীন' অবস্থাটা যে কখন ঘুচিয়া যাইবে—কখন সেই আত্মার পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইবে—তাহার কিছুই ঠিক নাই; সেই সময়টি না আসিলে হাজার সাধ্য-সাধনা কর না কেন, বলহীনতা ত্যাগ করিয়া সেই আত্মাকে—তোমার সেই পূর্ণ স্বরূপকে লাভ করিতে পারিবে না। এ কথা আরও ভয়ানক। বেদান্তী বলেন, ইহার জন্য তপশ্চরণও যেমন করিতে হইবে, তেমনই সেই সময়টির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। বৈষ্ণব বলেন, ইহার জন্য প্রাণপণে কাঁদিতে হইবে—সে কান্না সত্যকার কান্না হওয়া চাই। সে কান্নাও একপ্রকার শক্তির কান্না, তাহাতেও আত্মাকে একরূপ বলিষ্ঠ হইতে হইবে। অতএব সারকথা এই যে, দুঃখনিবৃত্তি বা লীলারসের আস্বাদনে পরম-সুখলাভ—কোনটাই আত্মশক্তিহীনের সাধ্য নয়; অর্থাৎ আর কেহ তোমাকে উদ্ধার করিবে না; নিজেকে নিজেই একটা এমন শক্তির সাহায্যে উদ্ধার করিতে হইবে, যে-শক্তি সাধারণ মানুষের আয়ত্ত নয়, বরং সাধারণ মানবীয় সংস্কারের বিপরীত। সেই সংস্কার—যাহাকে প্রবৃত্তি বলে, সেই প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিমুখী করিতে হইবে; অর্থাৎ যে খোঁড়া তাহার খঞ্জতা মোচন করিবার জন্য, দৌড় অভ্যাস করিতে হইবে; পা-খানা না থাকিলেও, ভুলিতে হইবে যে—তাহা নাই।

আমার এই কথাগুলি ভক্তের কথা নয়, জ্ঞানীর কথাও নয়; আমি সাধারণ মানুষ, কোটী মানুষেরই একজন; যে-মানুষ অতি দুর্ব্বল, অতি অসহায়, যে-মানুষের বাস্তব-সত্তার নাম Humanity—যে-মানুষ এই পৃথিবীতে চিরদিন দুঃখভোগ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে, আমি তাহাই। যে সৌভাগ্যবান কয়েকজন মাঝে মাঝে এই জগৎ ও জীবনকে কদলী-প্রদর্শন করিয়া, ঐ অভয় বা লীলারস, দু'য়ের একটাতে আরোহণ করে, আমি তাহাদের সমকক্ষ নহি। ভক্ত ও বৈদান্তিক

উভয়েই বলিবেন—'আরে! মুক্তি ত' সকলেরই হইবে, সকলেই সেই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে; একজন্মে না হউক শত জন্মেও ত' হইবে!' কি মধুর সান্ত্বনা! ততদিন ঐ মানুষজাতি, ঐ 'Humanity'—আর্ত্তনাদ করিতে থাকুক তোমার তাহাতে কি? যাহার যেমন সে ত' তাহাই করিবে; বিশাল মানবগোষ্ঠী একত্রে যে কর্ম্মজাল বয়ন করিয়াছে, তাহার সমষ্টিগত বন্ধন-মোচন হইবে না; মুক্তি একারই হয়, প্রত্যেকে নিজের ভাবনা ভাবিবে।

বেদান্ত ইহার বড় চমৎকার উত্তর দিয়াছে, সে বলে, 'এক'ই ত আছে, 'তুমি'মাত্রেই ত' 'আমি'; আমি ছাড়া ত' কেহ নাই! তোমার মুক্তিই ত' সকলের মুক্তি। আরও বলে, মুক্তিলাভ ত' 'প্রাপ্ত-প্রাপ্তি'; সেই আমি ত' কখনও বদ্ধ হয় নাই, 'বদ্ধ হইয়াছি'—এই সংস্কারটাই একটা মহাভ্রম। যাহারা এতখানি যাইতে প্রস্তুত নয়, তাহারা ফল-লাভের আশা না করিয়া, সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠান করিতে বলে; শেষ পর্য্যন্ত ঐ বহুর—ঐ মানবকুলের—হিত হউক বা না হউক, কেবল হিতসাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিয়া গেলেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইল; অর্থাৎ ঐ পরহিতৈষণার দ্বারা তোমার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি বা আত্মার কল্যাণ হইবে, তাহাই ত' পরম পুরুষার্থ। সেই স্বার্থপরতারই কি চমৎকার শোধন-মন্ত্র।

(৪)

আমার প্রাণ ইহাতে তৃপ্ত হয় নাই। তার কারণ বোধ হয় এই যে, আমি একালের মানুষ, আমি মানুষকে—মানুষের দেহবদ্ধ জীবনটাকে, জীবনেরই দিক্ দিয়া না দেখিয়া, দেহবর্জ্জিত কোন অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে পারি না; একালের মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আবার জীবনকে স্বীকার করিয়া, তাহার অন্তর্গত নানা দ্বন্দ্ব-সংশয় ও সমস্যার সমাধানমূলক আর একটা কোন তত্ত্বকে—ব্যক্তির মস্তিষ্ক-প্রসূত একটা নূতনতর পেটেণ্ট-আবিষ্কারকেও আমি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা করি না, সেও মানুষকে আর একপ্রকার প্রবঞ্চনা। ঐরূপ কোন 'সত্য'-আবিষ্কারের দ্বারা আবিষ্কারকের আত্মাভিমান বা আত্মপ্রসাদ বৃদ্ধি পায় মাত্র—ঐরূপ 'সত্যে'র প্রচারক যাহারা তাহারাও মানুষকে, মানুষের জীবনকে, একটা তত্ত্বের অধীন করে। জীবনের তত্ত্ব জীবনের মধ্যেই আছে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া বাক্যগোচর করা যায় না। যাহারা জীবনের সেই বাস্তব-রূপ প্রাণের ভিতরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহারা কেবল স্তম্ভিত হইয়াছে। যে তাহা হয় নাই,

সে জীবনকে দেখে নাই, অথবা সে সাধারণ মানুষ নয়—যে-সাধারণ-মানুষকেই আমি জীবনের মূল রহস্যের পূর্ণ-প্রতীক বা বিগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস করি।

তাহা হইলে, সেই সাধারণ মানুষের উপায় কি? মানুষ, মানুষ বলিয়াই দুর্ব্বল; এই দুর্ব্বলতাই তাহার মনুষ্যত্বের নিদান। ঐ মুক্তিই যদি পরম-পুরুষার্থ হয়, তবে আত্মবলে সেই মানুষ মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না; অতএব দুঃখ-নিবৃত্তির কোন আশাই নেই। আখড়ায় আখড়ায় কত কাল ধরিয়া কত ঘণ্টাই বাজিয়াছে, তাহা শুনিয়া যাহাদের মুক্তি হইয়াছে, এবং এখনও হইতে পারে বা হইবে, আমি তাহাদের জন্য আদৌ চিন্তিত নহি। ঐ ঘণ্টা যাহারা শুনিতে পায় না, বা শুনিতে চায় না, তাহাদের উপায় কি? শুনিতে না চাওয়াই ত' স্বাভাবিক।

মানুষ যে কত দুর্ব্বল, কত অসহায় তাহা মানুষই ত জানে। পৃথিবীতে আজিও যেমন, চিরদিনই তেমনি, মানুষ যূপবদ্ধ পশুর মত, কখনো সরবে কখনো নীরবে আর্ত্তনাদ করিয়াছে ও করিতেছে। মানুষের এই দুর্ব্বলতা ও বিমূঢ়তা—শুধুই রিপুপারবশ্য নয়—স্নেহ-প্রেম-প্রীতির নিষ্ফল কাতরতা, ক্ষুধা ও ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর নিত্য-নির্য্যাতনের কোন প্রতিকার আছে? মানুষ কি আদিকাল হইতে সেই একই দুঃখ বিভিন্ন প্রকারে ভোগ করিতেছে না? এবং যুগের পর যুগে, নূতন নূতন আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে না? কোন ধর্ম্ম, কোন তত্ত্ব, কোন গুরু, কোন অবতার তাহার সেই দুঃখ দূর করিতে পারিয়াছে? মানুষ আপনার পথেই চিরদিন চলিয়াছে ও চলিবে; মরীচিকা বা আলেয়া তাহাকে দিক্‌ভ্রান্ত করিবে; পিপাসার বারি মিলিবে না; অন্ধকারে সে পথ খুঁজিবে কিন্তু পাইবে না। তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণের মত ঐ জ্বালাই তাহার সুখকর হইবে; গণ্ডবাহী অশ্রু-ধারাই তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে পানীয় সিঞ্চন করিবে; নিজবক্ষে নিজেই আমূল ছুরিকা-বিদ্ধ করিয়া সে বেদনার হাহা-স্বরে হাসিয়া উঠিবে। জগৎকে যদি নাট্যশালার সহিত উপমিত করা হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সেই নাট্যশালার এক অংশে কয়েকজন রস-চতুর দর্শক বসিয়া সেই নাট্যরস উপভোগ করিবে, বাকি অগণিত মানব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে থাকিবে; সে অভিনয় অভিনেতার পক্ষে মর্ম্মান্তিক। কিন্তু কবিমনীষিগণের, শক্তিমান মহাপুরুষগণের পক্ষে তাহাই অমৃত-সমান। বেদান্ত ও রস, সেও একরূপ নেশা; কেবল সে নেশা কিছু উগ্র ও নীরস; বৈষ্ণবের সাধনতত্ত্বও একটা বড় নেশা—সে নেশা বড় তরল, বড় মধুর; শেষ পর্য্যন্ত ঐ নেশা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই—"Be drunk, always drunk

and with anything"—উহাই সার কথা। গ্রন্থকার 'ঠাকুরাণীর কথা'য় সেই নেশাকেই আরও গাঢ় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এমন নেশার উপকরণও যেমন সুলভ নয়, তেমনই, নেশায় বেহুঁশ হইবার সামর্থ্যও সকলের নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক কথা—শক্তি; এবং তাহা আর কাহারও নয়, তোমার নিজের। বেদান্ত বড় সত্যবাদী, এমন নির্ভীক-নির্ম্মম সত্য আর কেহ বলে নাই।

তাই বলিয়াছি, এ-সকল তত্ত্ব, তত্ত্বহিসাবে অতিশয় উচ্চ এবং মহান্ হইলেও, মানুষ-আমাকে আশ্বস্ত করে না। মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে—প্রেম; সেই প্রেমের নাম অপার কারুণ্য, ইহাই বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহা পৃথিবীতে এখনও অবতীর্ণ হয় নাই। সে-প্রেম "Come unto me" বলিবে না, আপনি নিকটে আসিয়া বুকে তুলিয়া লইবে; সে কৃপা কেবল অহৈতুকী হইলে চলিবে না —তাহার কোন পাত্রাপাত্র-ভেদ থাকিবে না, না ডাকিতে আসিবে, না চাহিতে দিবে। যে-প্রেম সকলের জন্য কাঁদে, কিন্তু সকলকে উদ্ধার করিতে পারে না— সে-প্রেম আমরা দেখিয়াছি, সেই প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিলেই মানুষের দুঃখ ঘুচিবে না। খৃষ্ট বা চৈতন্যের সেই প্রেম আমরা জানি, কিন্তু তাহাতে মানব-সাধারণের কি উপকার হইয়াছে? সেই প্রেমের বিরাটত্ব স্বীকার করি, কিন্তু সে প্রেম ত' জগতের এই বিরাট্ দুঃখের ভার তুলিতে পারে নাই, আমরা কেবল সেই প্রেমের মহিমা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হই মাত্র—মানুষমাত্রেরই তাহাতে কোন উপকার হইয়াছে কি? আমি নিখিল মানবগোষ্ঠীর কথাই বলিতেছি। জন্ম-জন্মান্তরের কথা, কর্ম্মফলের কথা এখানে তুলিয়া লাভ নাই; তাহাতে প্রত্যক্ষ-বাস্তবের মীমাংসা হয় না। আমি মানুষের প্রত্যক্ষ নিয়তির কথাই বলিতেছি। এযুগে তাহাই মানুষকে চাপিয়া ধরিয়াছে, মানুষ আরও দুর্ব্বল আরও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। আজ মানুষের কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট নাই; জ্ঞান বা প্রেম কোনটারই দাবী তাহার নিকটে আর চলিবে না। ভগবান্‌কে ডাকো, আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করো, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করো—আজিকার মানবকে একথা যে বলে, সে হয় অ-মানুষ, নয় অতিমানুষ; অ-মানুষ এই অর্থে যে, সে হৃদয়হীন পিশাচ; অতিমানুষ এই অর্থে যে, সে দেহ-সংস্কার বা মানবীয় সংস্কার অতিক্রম করিয়াছে। যে মনুষ্যত্ব—যে দুর্ব্বলতা মানুষের নিয়তি, আমি সেই মনুষ্যত্বকেই সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করি। মানুষের সেই মনুষ্যত্ব সত্ত্বেও তাহার দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি? আর কোন উপায় দেখি না—সেই

অপার কারুণ্য, সেই সমর্থ ও সর্ব্বনিরপেক্ষ প্রেম ছাড়া। সে-প্রেম পৃথিবীতে আজিও অবতীর্ণ হয় নাই—ব্যক্তির পক্ষে হইলেও মানবজাতির পক্ষে হয় নাই।

(৫)

এখানে সাহিত্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব। ঠিক এই ভাবনা ভাবিয়াছিলেন এক রুশ-সাহিত্যিক; মানুষের দুঃখকে এমন শ্রদ্ধা, এমন পূজা—এবং সেই দুঃখের হেতু ও তাহার নিবারণ-চিন্তা এমন আর কোন ভাবুক, কবি বা মনীষী এ যুগে করেন নাই; তার কারণ, মানুষকে এমন চক্ষে আর কেহ দেখেন নাই। ইনি সেই বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক ফেডর ডষ্টয়এফ্‌স্কি (Fedor Dostoieffsky)। মনুষ্যজীবন ও মনুষ্যভাগ্যের গভীরতম তলদেশে ইনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন—সে দৃষ্টিই অন্যরূপ। একজন ইংরেজ সমালোচকের মতে, ইহার মূলে ছিল 'loyalty to humanity'—মানুষহিসাবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা; কিছুতেই—কোন উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা—মানুষের সেই দুঃখকে নস্যাৎ বা তাহার নিবারণ সুসাধ্য বলিয়া বিশ্বাস না করা। তিনি মনুষ্যজীবনের বাস্তবকে মানিয়াছিলেন, এবং মানুষের সর্ব্ববিধ পাপকে যেমন স্বীকার করিয়াছিলেন—তেমনই, সেই পাপের যাতনাকেই পাপ অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের আত্মা বড় বলিয়াই, ঐ পাপ ও তাহার শাস্তিকে ঘৃণা করা দূরে থাক, করুণার পাদ্যার্ঘ্য দিয়া তিনি তাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে, সুখলালসা সত্ত্বেও কোন পাপীই সুখী নয়—যে যত বড় পাপী, তাহার দুঃখ তত গভীর; সেই গভীর দুঃখের ভাষা নাই, তাই সে নিজেও তাহা বোঝে না। ডষ্টয়এফ্‌স্কি এই পাপ ও শাস্তির কোন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই—কেবল ইহাই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ঐ পাপে পাপীর দুঃখই আছে, সুখ নাই; মানুষের যদি শক্তি থাকিত তবে এ পাপ সে করিত না। পাপকে এইভাবে স্বীকার করা এবং তাহার জন্য মানুষকে দায়ী না করা, এবং উহার মূলে কোন ঐশ্বরিক বিধানের তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত না হওয়া—ইহাই সেই 'loyalty to humanity'। তিনি ইহার একমাত্র যে প্রতিকার কল্পনা করিয়াছেন, তাহা ঐ কারুণ্য—সেও মানবীয়; মানুষের ভিতরেই তেমন প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে; সে ব্যথার ব্যথী মানুষই হইতে পারে, কারণ, বিষও যাহার—বিষঘ্ন ঔষধও তাহার মধ্যেই থাকিবে। এই প্রেমের একটি মূর্ত্তি তিনি তাঁহার Idiot-নামক উপন্যাসে গড়িয়া লইয়াছিলেন—তাহার নাম Prince Muishkin। আর দুইটি চরিত্র Nastasia ও Rogojin—যথাক্রমে মানুষের জীবন ও মানুষের পাপ বা

উদগ্র কামনার প্রতীক। Prince Muishkin অপার কারুণ্যের বিগ্রহই বটে, কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না; খৃষ্টের অপার করুণাও এমনই ব্যর্থ হইয়াছিল। এই উপন্যাসে ডষ্টয়এফ্‌স্কির ভাবনা ও ভাবুকতা চরমে উঠিয়াছে; তিনি তাঁহার সমগ্র কল্পনাশক্তি, ভাবুকতা ও সহানুভূতিকে ভ্রূমধ্যবিন্দুতে একাগ্র করিয়া ইহার অধিক কোন আশ্বাস পান নাই। মানুষের নিয়তি এমনই কঠিন। তথাপি ঐ যে কারুণ্যের মূর্ত্তি তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, উহার অন্তর্গত তত্ত্বটা সত্য বলিয়া মনে হয়। কেবল উহা মানবীয় বলিয়াই শক্তিহীন। ঐ কারুণ্যের সঙ্গে যদি অনন্ত শক্তি যুক্ত হয়, তবেই মানুষের দুঃখ ঘুচিতে পারে—কিন্তু কারুণ্যের সেই শক্তি, বা শক্তির সেই কারুণ্য কোথায়? এ পর্য্যন্ত ত' তাহা পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। হয় ত' উহা কোনকালে সম্ভব নয়—অন্ততঃ যতদিন সৃষ্টি থাকিবে।

আমার নিজের কথা এইখানেই শেষ করিলাম। অবশেষে কবির ভাষায় বলি—

জানি না কেন এ সব, কোন ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্মশৃঙ্খলার,—
জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি-অন্ত এ সংসারে; নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা—পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে।
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুসম্বন্ধে আমার নিজের কথা উহাই; কিন্তু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাও আমি বিস্মৃত হই নাই, পাঠক-পাঠিকাগণও যেন বিস্মৃত না হন।

* * * *

এই গ্রন্থ জ্ঞানীর জ্ঞান বা ভক্তের ভক্তির যেটুকু যেমনই বৃদ্ধি করুক, সাধারণ পাঠকও যে ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারও বেশি কিছু আশা করেন না, কেবল এইটুকু মাত্র করেন যে ইহার দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। সে অধিকার তাঁহার আছে। তত্ত্বহিসাবে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর

মূল্য যেমনই হোক, উহার দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তিলাভ না হোক, এই গ্রন্থের নিজস্ব গৌরব আছে। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা যাহার উর্দ্ধে এ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই—জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন—গ্রন্থকার সেই সুদূর ও দুরধিগম্যকে এই গ্রন্থের বাতায়ন-পথে আমাদের একেবারে সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন। উহার মধ্য দিয়া আমরা মানব-মানসের সেই উত্তুঙ্গ শিখর—অরুণা-লোকরঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখিতে পাই; অথবা আরও দুরধিগম্য সেই স্বর্ণ-কমলশোভিত মানস-সরোবরকে প্রত্যক্ষ করি—যাহার সন্নিহিত আকাশমার্গে, ধ্রুবতারাকে বেষ্টন করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল বিচরণ করিতেছে। সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদের দৃষ্টির প্রসার হয়, হৃদয় বিস্ফারিত হয়, হয় ত' বা অমৃতের পিপাসাও জাগে। এত লাঞ্ছনা ও নৈরাশ্যের মধ্যে, মানুষ আমরা, ক্ষণিকের জন্যও অনুভব করি যে, যাহা দেখিতেছি তাহাই সব নয়, সৃষ্টির নেপথ্যে বৃহত্তর, বিরাটতর কিছু আছে, এবং মানুষই তাহার সংবাদ পায়। এ দৃশ্য ঠিক এমন করিয়া বাঙালীকে কেহ দেখাইতে পারে নাই; যে পরলোকগত মহাত্মা নিজে এমন করিয়া দেখিয়া-ছিলেন, এবং অতি গভীর প্রেম ও হিতৈষণার বশে, আমাদিগকেও সেই দৃষ্টির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে বারবার প্রণাম করি।

মহালয়া, ১৩৫৪

পুঁথির প্রতাপ

সেকালে ছাপাখানা ছিল না, বই ছিল বড় কম, তাই পড়ুয়াদের অসুবিধা হইত; জ্ঞান-বিস্তারের অনেক বাধার মধ্যে এইটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু কেবল ছাপাখানা কেন, এত কাগজই বা ছিল কোথায়? পুঁথি লিখিবার উপকরণ কত কষ্টে, কত ফন্দিফিকির করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত, তাহাও আমরা জানি। এইজন্য তখনকার কালে গ্রন্থকার বা লেখক হওয়া সহজ ছিল না। আর আজ! এত রকমের এত কাগজ ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এত পরিমাণে নির্গত হইতেছে যে, পড়ুয়ারা হাঁপাইয়া উঠিতেছে; ছাপা-কাগজ ওজনদরে বিক্রয় করিয়া নিঃশেষ করা যায় না! এখন লেখা মানেই ছাপা; এবং ছাপার দৌলতে খাতা মাত্রেই গ্রন্থ; লেখক মাত্রেই গ্রন্থকার। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করিলে এই একটি বিষয়েই কি আশ্চর্য্য উন্নতি আমরা দেখিতে পাই! বিদ্যা কত সুলভ, সভ্যতার কি প্রসার!

তখনকার কালে লিখিবার উপকরণ পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল—ছাপাখানা তো স্বপ্নেরও অগোচর। পুস্তকের সংখ্যা অতিশয় অল্প হওয়ায় পাঠার্থীর সময় বা সুযোগ আবশ্যকমত ঘটিয়া উঠিত না—আজ পথে-ঘাটে, দেওয়ালের কাগজগুলাতেও যাহা পড়িয়া লওয়া যায়, সেকালে বহু অনুসন্ধানেও তাহা মিলিত না। এককালে ক্ষুধার অন্নই জুটিত না; আজ অক্ষুধা ও দুষ্ট ক্ষুধার খাদ্যও বিনা আয়াসে লভ্য হইয়াছে, ছাপা-কাগজ ও বহির স্তূপ চারিদিকে জঞ্জালের মত বাড়িয়া উঠিয়াছে—পড়িবার অবকাশ নাই, নিশ্বাস রোধ হইয়া উঠে।

পুস্তকের এই প্রাচুর্য্যে সমাজের কতখানি লাভ হইয়াছে? বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা—ছাপাখানারই সৃষ্টি, পুস্তকে প্রচারিত মতবাদ ও তাহারই শততম প্রতিধ্বনির বিকৃত প্রেরণাই আজ ইতর-ভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই অনুপ্রাণিত করিতেছে। আজিকার শিক্ষা একান্তই পুঁথিগত শিক্ষা; প্রকৃতিগত প্রেরণা বা জীবন-সত্য আজ সাক্ষাৎভাবে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনে লাগে না;—ভগবৎ-প্রণীত গ্রন্থ হইতে বিদায় লইয়া আজ মানুষের মন ছাপা-কাগজের মধ্যে আশ্রয়

লইয়াছে। এই শিক্ষার বিস্তারে আধুনিক সমাজ মদগর্ব্বে অধীর; সেকালের নিরক্ষরতা বা পুস্তকসম্পর্কহীন জীবনের সঙ্গে আজিকার এই ছাপা-কাগজে-মোড়া জীবন তুলনা করিতেও তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন। অথচ শিক্ষার যে ধারণা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কতকগুলি পুঁথির বচন আবৃত্তি করিতে পারার নামই শিক্ষা; এই বচন যাহার যত বেশি পরিমাণে আয়ত্ত হইয়াছে—যত বেশি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, ও সেই সঙ্গে, তাহাদের সম্পর্কিত বিচিত্র তথ্য যে যত অবলীলাক্রমে ও তাচ্ছিল্যভরে উদ্ধৃত করিতে পারে, সেই তত শিক্ষিত। এমন শিক্ষা দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িবে না কেন? ছাপাখানার অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধনের অভাব নাই, রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিয়া দিক্‌দিগন্ত ভরিয়া

কিন্তু শিক্ষার এই অবারিত প্রচার সত্ত্বেও, কাল্‌চার ও সভ্যতার তুঙ্গতম শিখরে উঠিয়াও, আজ মনুষ্য-সমাজ মহাবিনাশের আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া আছে। বিদ্যাবিস্তারের এত যন্ত্র, এত কারখানা, এবং সে বিষয়ে এতখানি সাফল্য সত্ত্বেও মানুষ জ্ঞানের দ্বারা অভয় লাভ করিল না! এ শিক্ষা এখনও আপামর সাধারণের আয়ত্ত হয় নাই—ছাপা-পুঁথি ও ছাপা-কাগজের নেশা এখনও সমগ্র জাতিকে পাইয়া বসে নাই, তাহার জন্য কত খেদ, কত দুঃখ! কিন্তু সমাজের যে স্তরে এই শিক্ষা সংক্রামিত হইয়াছে, তাহারা কোন্ অমৃত আস্বাদন করিয়াছে? প্রাণে-মনে, আত্মায় বা দেহে, তাহারা কোন্ শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহা আর সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই বলিয়া শোক করিতে হইবে? মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ দূর করাই অবশ্য জ্ঞানের চরম লক্ষ্য নয়; বরং জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়াই মানুষ স্বর্গচ্যুত হইয়াছে—এই পুরাণ-কাহিনী এক অর্থে সত্য। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-দম্ভী মহাজনেরা বলিয়া থাকেন, শিক্ষাই চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র উপায়—স্বর্গে ফিরিয়া যাইবার একমাত্র পথ। সে কি এই শিক্ষা? হয়তো বা তাই-ই। কারণ এ শিক্ষা মানুষকে স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান করে, "অয়ং নিজঃ পরোবেতি"—এই সংস্কার দৃঢ় করিয়া দেয়। জীবন একটা যুদ্ধ, সেই যুদ্ধে অপর সকলকে বঞ্চিত বা পরাজিত করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে—ইহাই ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মজ্ঞান পাকা করিবার জন্যই এ শিক্ষার প্রয়োজন, এবং এই শিক্ষা আপামর-সাধারণে ব্যাপ্ত হউক, তাহা হইলেই পৃথিবী স্বর্গোদ্যানে পরিণত হইবে। যাহারা যে পরিমাণে 'শিক্ষিত', তাহারা সেই পরিমাণে জীবন-যুদ্ধে জয়ী—অর্থাৎ, আর সকলকে

শত্রুরূপে জয় করিয়া বৈষয়িক সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অশিক্ষার ফলেই সকলে তাহা পারিয়া উঠিতেছে না, শিক্ষার গুণে সকলের স্বার্থবোধ পাকা হইয়া উঠে নাই! এইজন্য শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন; যাঁহারা শিক্ষিত মহাপুরুষ, তাঁহারা অশিক্ষিত জনগণের জন্য বেদনা অনুভব করেন। এই বেদনা অনুভব করা, এবং তাহার তাড়সে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন—শিক্ষিত সভ্যজনের অবশ্য কর্ত্তব্য; জনহিতকর কর্ম্মে উৎসাহ দেখাইলে সমাজে প্রতিপত্তি বাড়ে, সেও আত্মপ্রতিষ্ঠার আর একটি উপায়। যাহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বার্থই যাহাদের পরমার্থ—মানব-প্রেম বা বিশ্বহিত যাহাদের মনের একটা আইডিয়া মাত্র—তাহারা এই শিক্ষারই বিস্তার কামনা করে কেন? তাহারা কি সত্যই কামনা করে—আপামর সাধারণ সকলেই শিক্ষিত হইয়া আপন আপন পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লউক, স্বার্থ-সংঘাত আরও বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযুদ্ধে একটা মহামারীর সৃষ্টি হউক? শিক্ষার অর্থ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য একালে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শিক্ষিতগণের এই আগ্রহ—নিজের বিপদ্ ডাকিয়া আনিবার এই চেষ্টা—কি কখনও আন্তরিক হইতে পারে? যদি হয়, তবে এই বুদ্ধি যাহাদের, তাহারা কোন্ শ্রেণীর বুদ্ধিমান? রহস্য ইহাকেই বলে।

আসল কথা এই যে, এহেন শিক্ষা—এই ছাপাখানা-প্রসূত সুলভ বিদ্যা—সভ্যতার বাহন হইতে পারে, মানুষের পক্ষে ইহা জীবনপ্রদ নহে। জীবন ভগবানের দান, সভ্যতা মানুষের সৃষ্টি। যে-শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, যাহার ফলে দেহে স্বাস্থ্য ও চিত্তে প্রসন্নতা জন্মে, যাহা মানুষকে আত্মার বলে বলীয়ান করে—দেহ-ধারণের জন্য অনিবার্য্য যে দুঃখ সেই দুঃখকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা নয়, তাহাকে স্বীকার করিয়াই তদূর্দ্ধে নিজেকে স্থাপনা করিবার শক্তি যে-শিক্ষায় সম্ভব—সে শিক্ষার উপায় কেবল পুঁথির সংখ্যাবৃদ্ধি নয়; ভূরি পরিমাণে ছাপার অক্ষর উদরস্থ করাইলেই মানুষকে মানুষ করা যায় না।

পুঁথির সংখ্যা যত অল্প হয় ততই ভাল, কারণ, ভাল পুঁথি কখনও সংখ্যায় বেশি হইতে পারে না। আবার, সকলেরই মানস-প্রকৃতি সমান নয়, সকলেই পুঁথির সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। লিখিতে ও পড়িতে পারার যাদুবিদ্যাটি কাহাকেও ধরাইয়া দিলেই, সেই যাদুবলে পুস্তক হইতে পুস্তকান্তরে ভ্রমণ করিয়া, এবং এক ধরণের চিন্তাপদ্ধতি অভ্যাস করিয়া, সে যে জ্ঞানের শিখর হইতে শিখরে উপনীত হইবে—এইরূপ ধারণা আজকালকার শিক্ষাতত্ত্বের মূলে

বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ, মানুষকে মানুষভাবে না দেখিয়া তাহাকে কতকগুলা বৃত্তিসম্পন্ন যন্ত্ররূপে দেখাই আজকালকার বৈজ্ঞানিক সত্য-দর্শন; কারণ, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মন ছাড়া আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করাই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার। এই মনোবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ-সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য; এবং ইহাদের সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম গবেষণার ফলে যে কতকগুলি নিয়মের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে মানুষমাত্রকে একটা সাধারণ শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া জ্ঞানবান করিয়া তোলা যায়—প্রাকৃতিক অন্যান্য ফসলের মত মানুষের মনটাকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতিতে উৎকর্ষিত করা সম্ভব ও একান্ত আবশ্যক—এইরূপ মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতিতেও খুব ঘটা করিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্বমূলক নয়; সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যক্তিভেদে মানুষের যে আধ্যাত্মিক অধিকার-বৃদ্ধি—আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য তাহা নহে। দেহ-মন-প্রাণের মিলিত উপলব্ধির দ্বারাই যে সত্যকে পাওয়া সম্ভব, যাহা দুই ব্যক্তির পক্ষে কখনও এক হইতে পারে না, অথচ যাহার সাহায্যে ব্যক্তি-মানুষ বহুর মধ্যে নিজের স্থানটি নির্ব্বিরোধে ও নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইতে পারে, এবং আপনার বিশিষ্ট অধিকার বা দাবির সীমানা স্বীকার করিয়াই—যাহা উদার ও বৃহৎ, মহৎ ও সীমাহীন, তাহার মধ্যে অনায়াসে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে—এই অতিরিক্ত অহংজ্ঞান বা মানস-ব্যক্তিত্বের বিকাশে, মানুষ সেই সত্য হইতে ক্রমেই দূরে গিয়া পড়িতেছে। এইরূপ মানসিক উৎকর্ষের অভিমানেই পুঁথিগত বিদ্যার এত আদর; কেবল জানা—আর কিছু নয়, মানাও নয়; কর্ম্ম-প্রেরণার মধ্যে, অথবা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, সেই বিদ্যাকে জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায়, ইহা মুখস্থ করিলেই হইল, আত্মস্থ করিতে হয় না।

যদি আত্মস্থ করিবার প্রয়োজন থাকিত, অথবা বিদ্যাকে যদি সত্য-সাধনায় প্রয়োগ করিতে হইত, তবে মানুষ এত পুঁথি লিখিত না, এত বিদ্যা গলাধঃকরণ করিতে পারিত না। যদি এ শিক্ষা সত্যকার শিক্ষা হইত, ইহা যদি মানুষের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সহায় হইত, তবে এমন আগাগোড়া যান্ত্রিক প্রণালীতে বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না। যাহাকে আমরা উচ্চশিক্ষা বলি—পর্ব্বতপ্রমাণ পুস্তকরাশি বা বিরাট্ পাঠাগার যাহার আশ্রয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য কুঠুরি যাহার কারখানা—সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কাহারও আত্মজাগৃতি ঘটিয়াছে?

কয়জনের মনীষা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছে? কয়জন পুঁথির বাহিরে আপন কথা খুঁজিয়া পাইয়াছে? পুঁথিবিদ্যাহীন অশিক্ষিত জনের তুলনায় কোন্ সত্যকার অর্থে তাহারা শিক্ষিত? না—তাহারা আরও আত্মভ্রষ্ট, আরও জড়তাগ্রস্ত? পুঁথিগত বিদ্যার অনর্গল আবৃত্তি ছাড়া, চর্ব্বিতচর্ব্বণমূলক গবেষণার কৃতিত্ব ছাড়া—শক্তি ও স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও প্রেমে তাহাদের কয়জন, ঐ শিক্ষার ফলেই, উন্নতি লাভ করিয়াছে? একটি বিষয়ে তাহারা লাভবান হয়—অশিক্ষিতকে হঠাইয়া দিয়া স্বার্থসাধনে সিদ্ধিলাভ করে; সমাজে অমনুষ্যত্ব ও অসত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। এই পুঁথিসর্ব্বস্ব বিদ্যা মানুষকে চতুর করিয়া তোলে; বিদ্যার যে সারতত্ত্ব গহন-গভীরে নিহিত থাকে, যাহাকে আত্মার দ্বারা আত্মসাৎ করিতে হয়, যাহা সংক্ষিপ্ত মন্ত্রের আকারে কয়েকখানি পুঁথি হইতেই শিক্ষার্থীর হৃদ্‌গত হইয়া থাকে, এবং সেই মন্ত্রের সাহায্যে স্বকীয় সাধনায় মানুষের অন্তরে যাহার উন্মেষ হয়—ইহা সেই বিদ্যা নহে। এ শিক্ষা আত্মপরিচয়মূলক নয়—বস্তুপরিচয়মূলক; ইহাকেই বলে materialistic। ইহা আয়ত্ত করিতে পারিলে চালাক হওয়া যায়, স্বার্থসাধনে সফল-মনোরথ হইয়া দশজনের একজন হওয়া যায়; প্রেমধর্ম্ম, ন্যায়ধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলিয়া অহংধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

আমি পুঁথির কথাই বলিতেছিলাম, প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার কথা আসিয়া পড়িল। আধুনিক কালে পুঁথির শ্বাসরোধকারী সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলে কাহার মনে ভীতির সঞ্চার না হয়? মনে হয়, সভ্য-সমাজে বৎসরে যতগুলি মানুষ জন্মিতেছে, মুদ্রাযন্ত্র তাহার অনেক বেশি পুস্তক প্রসব করিতেছে। এ যেন পুঁথির মহামারী! মানুষের আহার্য্যের পরিমাণ অপেক্ষা ছাপা-কাগজের পরিমাণই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে! এই সকল ছাপা-জঞ্জাল যদি অধিকাংশ নষ্ট না হইয়া স্তূপাকার হইয়া উঠিত, তাহা হইলে গ্রন্থাগারের স্থান সংকুলান করিতে মানুষের বাসস্থান সংকীর্ণ হইয়া পড়িত। তথাপি এই গ্রন্থারণ্য চারিদিক্ ঢাকিয়া ফেলিতেছে, মানুষের মনের জানালায় আর মুক্ত আকাশ নাই; আপনি ভাবিবার অবকাশ নাই—পুস্তকই তাহার জন্য সকল ভাবনা ভাবে। পয়সা খরচ করিলেই বড় বড় কথা, ভাল ভাল ভাব, নানা তথ্য এবং তাহার সঙ্গে পরিপাটী যুক্তি ও চিন্তার পসরা অলস মনের দুয়ারে আসিয়া হাজির হয়; সেইগুলিকে মস্তিষ্কের কোটরে সাজাইয়া রাখিতে পারিলেই হইল। কোটরের সংখ্যা যদি একটু বেশি হয়, এবং সাজাইবার

যদি একটু কৌশল থাকে, তাহা হইলেই মহাবিদ্বান্ হওয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার কি মহিমা!—কল টিপিলেই জল পাই, বোতাম টিপিলেই আলো পাই, বুকশেল্‌ফের চাবি ঘুরাইলেই বিদ্যা পাই! পুরাকালে ছাপাখানা ছিল না, তাই কেতাব এত সস্তা ছিল না; দুই চারিখানি পুঁথি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইত, তাই বিদ্বানের সংখ্যা এত কম ছিল; এখন যত বই তত বিদ্বান্! তাই আজ মানুষের কত উন্নতি, কত সুখবৃদ্ধি হইয়াছে! জ্ঞানবৃদ্ধির তো কথাই নাই, বালকের মুখেও স্বাধীন-চিন্তার বুলি; ধর্ম্মে অবিশ্বাস, সত্যে সংশয়, হৃদয়-বৃত্তিকে পরিহাস, ভূত ভগবান্ ও প্রেমকে একই কুসংস্কারের কোঠায় ঠেলিয়া ফেলা—এ সকলের মূলে আছে ছাপা-বহির ছাপা-কথা। আধুনিক মানুষের জীবিত-সংস্কার ঐ পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, পুঁথির বুলি ছাড়া তাহার প্রাণমূলে আর কিছুর প্রেরণা নাই।

তবু বলে—আমরা মুক্ত, আমরা স্বাধীন! আমরা শাস্ত্র অর্থাৎ পুঁথির অধীন নই; জীবন! জীবন!—আমরা একান্তই জীবনের ভজনা করি। ইহাও পুঁথির বুলি, পুঁথি ছাড়া ইহারা স্বপনেও বাঁচিতে পারে না। ইহারা কথায় জীবন যাপন করে, তাই আজকাল এত পুঁথি, এত পত্রিকা। জীবন নয়—বচন, জীবনীশক্তি ঐ বচন-রচনেই নিঃশেষ হইয়া যায়; মানুষ কেহ নয়—সকলেই লেখক। লেখক ও পাঠকে বিশেষ প্রভেদ নাই; কারণ, জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, নিজস্ব ভাব-চিন্তা কাহারও নাই; যে লেখে সেও পড়া-পুঁথির পরস্ব বুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, নানান ছাঁদে সাজাইয়া, মানস-বিলাস করিয়া থাকে; যে পড়ে সেও তাহাই করিয়া থাকে; তবে সেটা কাগজে-কলমে না করিয়া মনে মনে করিয়া থাকে। তাই লেখকের প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা নাই—আছে একপ্রকার গোষ্ঠী-প্রীতি; কারণ, সকলেই এক জাত, একই বড় আড্ডার ইয়ার। যাহারা আজকালকার সাহিত্যিক—অর্থাৎ সেই ধরণের জীবনরসরসিক, তাহাদের কথাই বলিতেছি; ইহারা পুঁথি মানিয়া চলে না, জীবনকেই মানে—তাই দিবারাত্রি কেবল পুঁথিই লিখিতেছে! জীবনের সম্বন্ধে যাহাই হউক, পুঁথিকে ইহারা জাতিচ্যুত করিয়াছে—পুঁথি এখন কাপড়-জামা-জুতার সামিল হইয়াছে।

পুঁথিই যাহাদের জীবন—জীবনের সাধনার ফল পুঁথি নয়, ছাপাখানাকেই তাহারা জন্মগৃহ করিয়াছে। জীবন যে একটা পৃথক্ বস্তু, এই হতভাগ্যদের সে ধারণা নাই। পুস্তক হইতে পুস্তকান্তরে ইহারা ক্রমাগত জন্মগ্রহণ করিতেছে—

পুস্তকেই জন্ম এবং পুস্তকেই বংশবৃদ্ধি। তাই যতই "জীবন! জীবন!" করিয়া চীৎকার করে, ততই রাশি রাশি পুঁথি রচনা করে। মানুষের যেমন নখ-চুল গজায়, ছাঁটে আবার গজায়—ইহাদের পুঁথিগুলাও সেইরূপ গজায়। উহাই জীবন-বৃদ্ধির একমাত্র লক্ষণ—তাহাও নখ-চুল ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি, এবং সে বস্তু নিতান্তই বাহিরের উপসর্গ—অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক তাহাতে নাই।

সেকালে জীবনের সঙ্গে পুঁথির সম্বন্ধ ছিল অন্যরূপ। যে প্রতিভাবান মানুষ, জাতি, সমাজ ও বিশ্বের সঙ্গে গভীর অনুভূতিযোগে যুক্ত হইয়া জীবনের কোনও এক রূপ প্রত্যক্ষ করিত, সেই ছিল কবি, ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা। সে ব্যক্তি, যে একটি বাণীকে দেহ-মন-প্রাণের অন্তরতম ঐকতত্ত্বে উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যুরূপী মহাকালের বদ্ধমুষ্টি হইতে অমৃতখণ্ডিকার মত ছিনাইয়া লইতে পারিত—যাবজ্জীবন তপস্যায় সে তাহাকেই, মানুষের শাশ্বত উত্তরাধিকার-স্বরূপ, পুঁথির পাতার অক্ষর-সঙ্কেতে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। তাহারা জীবনে সত্যের সাধনা করিত; নিমেষের খেয়াল-খুশি বা মনোবিলাস নয়—মানুষের সমগ্র জীবন, জন্ম ও মৃত্যু, আদি ও শেষ, ব্যক্তি ও বহু, আত্ম ও পর তাহাদের ধ্যানের বস্তু ছিল। সে-সত্য কেবলমাত্র "আধুনিক" হইতে পারে না; যুগে-যুগে বংশ-পরম্পরাগত মানব-মনীষা যাহাকে আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে, অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের তপস্যায় যাহার উপলব্ধি পূর্ণতর হইয়া উঠিবে—কোনও যুগের একজন মানুষের পক্ষে তাহার আদি ও অন্ত নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়, কণামাত্র আহরণ করাই এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। সারা জীবন ধরিয়া তেমনই একখানি পুঁথি সে লিখিতে পারে, তাহাই তাহার চরম কীর্ত্তি। বিষয়বিশেষে সে পুঁথি ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু তাহার বাণী যদি সত্য হয়, তবে সে পুঁথির বড়-ছোট ভেদ নাই। জগতে তেমন পুঁথি বেশি নাই; কারণ তেমন মানুষ বেশি জন্মে নাই, এবং সে মানুষও, তাহার যতখানি বলিবার, তাহার বেশি বলে নাই। মিছা কথাই পরিমাণে বেশি হয়—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'। বিস্তর যাহা, অর্থাৎ লেখার বাহুল্য অংশ যাহা, তাহা আপনিই ঝরিয়া পড়ে—এমনই পড়িয়াছে, তাই উৎকৃষ্ট পুঁথির সংখ্যা আজও অধিক হইতে পারে নাই। আজ যে মহা-মহা গ্রন্থাবলী—পুস্তকাধার ভারাক্রান্ত করিতেছে, তাহার মূলে আছে ছাপাখানার পাপ। পুস্তকের পরিমাণ ও কলেবর-বৃদ্ধি—আজকাল যেমন বড় লেখকদেরও প্রলোভন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

সেকালের অবস্থায় তাহা হইতে পারিত না; অসার রচনাও এমন ভাবে রক্ষিত হইবার উপায় তখন ছিল না; তাই লেখক অসংযমী হইলেও, অনাচার আপনি রুদ্ধ হইত।

সেকালের পুঁথির দুর্ভিক্ষ কি কল্যাণকর ছিল! আধুনিক কালে ছাপাখানা ও পুস্তকের ব্যবসায় মানুষের মনোজীবনের স্বাস্থ্যনাশ করিয়াছে। একজন মানুষের মানসিক পুষ্টির জন্য কয়খানা পুঁথির প্রয়োজন? হজম করিবার শক্তি থাকিলেও কেবল পুস্তকের সংখ্যার উপরে মনের উৎকর্ষ নির্ভর করে না। যাহার যেটুকু শক্তি, তাহার সেই শক্তি বাড়িয়া উঠিবার পক্ষে পুঁথি কেবল অবলম্বনের কাজ করিতে পারে; কিন্তু পুঁথির দেওয়াল দিয়া সকল দিক্ ঘেরিয়া রাখিলে, তাহার নিজ-জীবনের সত্য—জ্ঞানে কর্ম্মে পল্লবিত হইতে পারে না। এ কথা মানি যে, যাহার মধ্যে কিছু আত্ম-পদার্থ আছে, সে এই পুস্তকারণ্যে প্রবেশ করিলেও দিশাহারা হয় না; কিন্তু এ-কথাও না মানিয়া পারি না যে, এই বিরাট্ পুস্তক-প্রাচীরবদ্ধ দূষিত হাওয়ায় সুস্থ মনও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সেকালে পুঁথি মানুষের মনোজীবন খর্ব্ব করিত না,—তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, তখন জীবনের পথ রোধ করিয়া এমন পুঁথির পর্ব্বত খাড়া হইয়া উঠে নাই। ইহা ছাড়া আরও কারণ আছে। তখন বিষয় ও অভিপ্রায়ভেদে, সেই অল্পসংখ্যক পুঁথিরও বিদ্যাহিসাবে পৃথক্ প্রয়োজন সুস্পষ্ট ছিল; এজন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধিভেদ ঘটিত না। লৌকিক ও পারমার্থিক—দ্বিবিধ বিদ্যার দ্বিবিধ অধিকার বিদ্যার্থী বুঝিয়া লইত, একের তত্ত্ব অন্যের উপরে চাপাইত না; বিজ্ঞানের বস্তুতত্ত্ব, দর্শনের যুক্তিতত্ত্ব, ভজন-সাধনের দেহতত্ত্ব, কলাশিল্পের রসতত্ত্ব এবং পরাবিদ্যার আত্মতত্ত্ব—জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়ভেদে, সকলেরই পৃথক্ মূল্য ছিল। এখন সকল বিদ্যাই মহাবিদ্যা, যে যাহা জানে তাহার অধিক সত্য আর কিছুই নাই—জীবনকে দেখিবার পদ্ধতি অন্ধের হস্তী-দর্শনের মত। কেবল তাহাই নয়—সমগ্র-দৃষ্টির প্রয়োজনই নাই, কারণ তাহা সম্ভব নয়। মানস-বুদ্ধির অতিরিক্ত চালনায়, প্রত্যেক বিদ্যার অনুশীলনে যে অহংজ্ঞান বা ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সর্ব্ববিদ্যার অতিরিক্ত যে বিদ্যা—জীবন-জিজ্ঞাসা বা আত্মজ্ঞান—তাহার অবকাশ আর থাকে না, বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ অন্তর্হিত হয়। যাহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুইয়েরই সাধনা করিয়াছিল, অথচ উভয়ের অধিকারসম্বন্ধে সজ্ঞান ছিল; যাহাদের মতে, 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'—তাহারা কোনও বিদ্যারই অনুশীলনে সত্যভ্রষ্ট হইত না;

জীবন ও সৃষ্টির মূলে যে পরম রস-রহস্য নিত্য বিরাজমান, তাহার উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইত না।

আরও এক কারণ এই যে, সেকালের সেই সকল সংখ্যাবিরল দুর্লভ পুঁথি যাহারা রচনা করিত, তাহারা আজিকার মত পেশাদার লেখক ছিল না; ছাপাখানার বিরাট্ জঠরের বিরাট্ ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অথবা জীবদ্দশায় যেটুকু সম্ভব আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য—তাহারা লেখনী ধারণ করিত না। সে সকল পুঁথির দুইটি শ্লোকের মধ্যেও যাহা গ্রথিত হইত, তাহা জীবনব্যাপী সাধনার ফল—লেখনীকণ্ডূয়ন তাহার কারণ নয়। সেরূপ একখানা পুঁথির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে একটা নূতন দৃষ্টিলাভ হইতে পারে; তাহার ফলে পাঠকেরও আত্মজাগরণ হয়, কারণ, "The touch of Truth is the touch of Life"। আজকালকার অধিকাংশ পুস্তকে আছে কি? অতি পুরাতন সত্যের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ—তাহাতে পানীয় অপেক্ষা ফেনারই ভাগ বেশি; অথবা, কে একজন একটা অর্দ্ধসত্য উচ্চারণ করিয়াছে—তাহারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় চীৎকার ছাপার হরফে সহস্র ভঙ্গিমায়, শততম অনুকরণের বিকৃত আকারে, পৃথিবীর অযুত সাহিত্য-পণ্যশালা প্লাবিত করিতেছে। এই ধ্বনির প্রতিধ্বনিও মৌলিকতার দাবি করে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, উহার ধ্বনিটাই যখন আসল বস্তু—মূলে বাক্-ব্রহ্মের লেশ মাত্র নাই—তখন প্রতিধ্বনিই বা মৌলিক হইবে না কেন? অনুকৃতির মধ্যেও স্বর-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে।

বিষয়টির নাম দিয়াছি—'পুঁথির' প্রতাপ, সে প্রতাপ যে কতখানি বাড়িয়াছে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; তাহার কারণ এই পুঁথি-ব্যাধি আমাদের দেশেও মহামারীর আকার ধারণ করিতেছে। যাঁহাদের সত্য-চৈতন্য এখনও লোপ পায় নাই, আধুনিক জীবনের আর এক মিথ্যা—এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারঘটিত ব্যাপার—তাঁহাদের অগোচর নাই। এ কালে মানুষের জীবন যে কত দিকে কতপ্রকারে পীড়িত ও হতশ্রী হইয়া উঠিতেছে—প্রাণের স্বাস্থ্য, মনের শুচিতা, ও দেহের বল যে কেমন করিয়া লোপ পাইতেছে, অথচ অহঙ্কারের অন্ত নাই—তথাকথিত শিক্ষার বিস্তার ও পুঁথির প্রাচুর্য্য তাহারই আর এক নিদর্শন। এ সভ্যতা বর্ব্বরতার বিপরীত হইতে পারে; কিন্তু বর্ব্বরতার মধ্যেও সত্য আছে—সেই সত্যকে সুন্দর করিয়া তোলার যে সাধনা, এ সভ্যতায় তাহা নাই। ইহা সত্যকে সুন্দর করে নাই, মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরাইয়াছে—তাই সুন্দরের অভিনয় করাই

ইহার কৃতিত্ব; কিন্তু সেই অভিনয়-নৈপুণ্য সত্ত্বেও আদিম বর্ব্বরতা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়ে—মিথ্যার প্রলেপে তাহা আরও কুৎসিত, আরও বীভৎস হইয়া উঠে। এ যুগের বিদ্যানুশীলন ও সাহিত্য-সেবাও তদ্রূপ; তাহাতে চালাকি আছে, নৈপুণ্য আছে, চমক লাগাইবার কৃতিত্ব আছে; কিন্তু সত্যসন্ধান নাই, আত্ম-জিজ্ঞাসা নাই, জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিবার সৎসাহস নাই, মৃত্যুকে জয় করিবার দুর্ম্মদ প্রতিভা নাই। তাই একালের এই গ্রন্থ-প্লাবন একটা ভয়াবহ মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে, রোগ-বীজাণুর মতই ইহার বৃদ্ধি দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে।

বৈশাখ, ১৩৪১

অতি পুরাতন কথা

(১)

অনেক দিন যাবৎ একটি কথা মনের ভিতর উঁকি দিতেছে। কথাটি কি, তাহা আগেভাগে না বলাই ভাল; বলিবার উপায়ও নাই, কারণ, এ পর্য্যন্ত আমি তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই; সেইজন্য আজ কথার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছি।

কথাটা আর যাহাই হউক, ইতিহাস, বিজ্ঞান বা অর্থনীতি-ঘটিত নয়,—ভূমিও নয়, ভূমাও নয়। তাই আজিকার এই অতিপ্রবল প্রগতির যুগে বলিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

কিন্তু কথাটা আদৌ নূতন নহে, বরং বড় পুরাতন—উত্থাপনমাত্রেই আপনারা বক্তার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজিকার দিনে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, মানুষের মন যে এত 'প্রিমিটিভ' হইতে পারে, তাহা দেখিয়া আপনারা অনেকেই বিস্মিত হইবেন। যে-প্রশ্ন বা সমস্যাকে মানুষ এতদিনে চিত্তপ্রকর্ষরূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত করিয়াছে—সাবালক হইয়া ভূত-ভগবান্ প্রভৃতির শান্তি করিয়াছে, সেই প্রশ্ন আজও কাহারও চিত্তে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায়, ইহা ভাবিয়া "মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি"—স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু প্রাণ যে অবুঝ, তাহাকে নিবারণ করা দুরূহ। জানি সব, তবু জন্মগত ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার নাই। যে প্রবৃত্তি অস্থিমজ্জাগত সেই প্রবৃত্তিই প্রভু; প্রবৃত্তি সকলের এক নয়। প্রবৃত্তির বশেই মানুষ যতরকম কর্ম্মভোগ করে। প্রবৃত্তি বহুরূপী; তাই মানুষের অভিজ্ঞতাও বহুরূপ। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাই বলিব—যত বড় পণ্ডিত হউন, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই মানুষের স্বকীয়; যত বড় তত্ত্বকথাই হউক, কোনটাই আত্ম-নিরপেক্ষ নয়। আমার কথা আমারই, তবু পরকে বলিতে চাই কেন? না বলিতে পারিলে অস্বস্তি হয়—যাহারা বেশি কথা বলে, তাহাদেরই এই দশা। তবে মনকে চোখ ঠারিবার যুক্তির অভাব নাই। আমার যুক্তিও আছে। আমার মনে হয়, যে-প্রবৃত্তি সার্ব্বজনীন, যাহার হাত

হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, তাহারই তাড়নায় জীবনের যে অভিজ্ঞতা আমার ঘটিয়াছে, স্থূলভাবে সকলেরই তাহা ঘটে ও ঘটিবে। সেই স্থূল দিক্‌টা সকলেরই সমান। আমি সকলের সঙ্গে সেই সমভূমিতে অবস্থান করিতেছি। অতএব আমার মধ্যে সেই সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে যে বিশেষ ভাবনার উদ্ভব হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত হইলেও, সহানুভূতিযোগে সকলেরই বোধগম্য। ইহা তো অতিশয় সহজ কথা—এমনই করিয়া ব্যক্তি-সমবায়ে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমানুভূতি বা বোধ-সামান্যের উপরে যে আলাপ নির্ভর করে তাহার বিষয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে—এমন কি, সেই সকল ভাবনাকে দুই চারিটি সূত্ররূপে বাঁধিয়া দেওয়াও হইয়াছে; তথ্যের অন্ত নাই, কিন্তু তত্ত্ব আর কয়টি? আমার কথাও নূতন নয়, অতিশয় পুরাতন; এবং পুরাতন বলিয়াই স্বজাতি মানবসমাজে তাহার আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জালিকাযন্ত্রে পরিস্রুত হইয়া তাহাতে একটু নূতন রং ধরিয়াছে মাত্র; সেই নূতন রঙের সাহায্যে পুরাতন হয়তো একটু চিত্তাকর্ষক হইবে, পুরাতনের প্রতি নূতন করিয়া দৃষ্টি পড়িবে—এই মাত্র ভরসা।

আজিকার দিনে মানুষের মনে—শিক্ষিত, অর্থাৎ চতুর মানুষের মনে—জীবনের একমাত্র সত্য দাঁড়াইয়াছে, 'good living'। আর যাহা কিছু মতবাদ বা তত্ত্ববাদ—হয় তাহারই সৌকর্য্যার্থে, নয় উদ্বৃত্ত মনন-শক্তির তৃপ্তি-সাধনার্থে। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রকারভেদে, অথবা তদনুরূপ শক্তির অভাবে, মানুষের অভিজ্ঞতা যখন বিপরীত পথে আকৃষ্ট হয়—মানুষ যখন good living-এ সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া no-living-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, কিংবা গোড়া হইতে good, bad যত প্রকার living আছে, তাহাকে নির্ব্বিকারভাবে ভোগ করিয়া, অথবা কেবলমাত্র কৌতূহল সহকারে দূর হইতে দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হয়, তখন অবস্থাভেদে ব্যক্তিবিশেষের সম্মুখে যে প্রশ্ন উদিত হয়, এবং ভাবুক চিন্তাশীল হইলে তাহার সমাধানে যে শক্তি নিয়োজিত হয়, তাহা নিষ্ফল হইতে পারে; তথাপি তাহার সেই সিদ্ধান্ত মানুষের প্রতিভারই পরিচয় দেয়। সে সকল সিদ্ধান্ত good living-সংহিতার মত খুব ধ্রুব বা কার্য্যকরী সিদ্ধান্ত নয় বটে, কিন্তু সেইজন্য তাহার মূল্য কম নহে। আমার যে কথাটি বলি-বলি করিয়াও এখনও বলিতে পারিলাম না, সে কথা আমার মুখে খুব বড় শুনাইতে না পারে, কিন্তু সেই ধরণের কথাই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার প্রেরণা হইয়াছে—

জগৎময়, যুগ-যুগান্তময় মানুষ সেই কথাই কতরূপে ভাবিয়াছে; স্বপ্নে-জাগরণে, আশায়-নিরাশায়, জয়ে-পরাজয়ে, হর্ষে-বেদনায় মানুষ নিজ-জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহারই ভাষ্য রচনা করিয়াছে। আমিও মানুষ, তাই আমিও আমার মতে একটু ভাবিয়াছি।

সে কথা কি? আমিও নিজেকে তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ ভাবনাটা এখনও কথার রূপে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—প্রাণের ভিতরে বসিয়া যিনি প্ররোচনা করিতেছেন, তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু—"সে কথা এখনও নহে, কহিলা সুন্দরী"। অতএব অপেক্ষা করিতে হইবে, হয়তো জবাব মিলিবে, নয়তো শেষ পর্য্যন্ত হাহাকারেই সকল প্রশ্ন অন্তর্দ্ধান করিবে। ইতিমধ্যে good living-সংহিতার প্রবক্তা যাহা বলিতেছেন, তাহাই শুনিতেছি ও বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি যে নব-জীবনবেদ উদ্ধার করিয়াছেন, প্রলয়পয়োধিমগ্ন এই পৃথিবীকে যে দংষ্ট্রার সাহায্যে উদ্ধার করিবার কৌশল জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে মানুষকে বরাহধর্ম্মী হইতে হয়—আমার সেই প্রশ্ন নিতান্ত হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি, আচার্য্যকল্প মহাপুরুষ না হইলেও, আমি মানুষ; আমি জীবনপথে অনেকদূর আসিয়াছি; মানুষের বলবুদ্ধির আস্ফালন, তাহার হাসি-কান্না, বিত্ত ও পাণ্ডিত্যের দম্ভ—ও তাহার পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছি। দিনের পর দিন, পলে পলে, তিলে তিলে, দেহ-মনের সর্ব্বপ্রকার নিপীড়নে মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌পিণ্ডের যতপ্রকার অবস্থা হইতে পারে—জরা ও মৃত্যুর দুর্লঙ্ঘ্য শাসন, রোগ ও শোকের নিরবচ্ছিন্ন দাহন—সকলই নির্ব্বিকার নিরুপায় ভাবে সহ্য করিয়াছি; দিনের আলোকেই ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে অবশে ধরা দিয়াছি, নিশীথের অন্ধকারে ইন্দ্রিয়াতীতের স্বপ্ন-বিভীষিকা ভোগ করিয়াছি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনের অনেক কথাই শুনিয়াছি—শুনিয়া বিমূঢ়ের মত অবস্থান করিয়াছি, ইন্দ্রজাল বা বিভীষিকা নিরস্ত হয় নাই। কেবল প্রশ্নই জাগিয়াছে, এক উত্তর হইতে আর এক উত্তরে ঠেকিয়াছি, কথার কারিগরিতে মুগ্ধ হইয়াছি, প্রশ্নের ইতি হয় নাই। প্রাচীনকালের মহা-মনীষী ঋষির বাণী 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌' বারবার কানের কাছে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই; আধুনিক শুক্রাচার্য্যগণের সঞ্জীবন-মন্ত্রও শুনিতেছি—সেই দেহাত্মবাদের বংশীধ্বনি বারবার প্রলুব্ধ করিলেও অভিসারে প্রবৃত্তি হয় নাই। এক দিকে জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিতে আত্মাই যেমন কুণ্ঠিত হইয়াছে, তেমনই, অপর দিকে মর্ত্ত্যের অসীম ঐশ্বর্য্য অতিশয় বাস্তব মনে

হইলেও 'ততঃ কিম্' ভাবিয়া প্রাণ তাহাতে মুগ্ধ হয় নাই। জীবনকে আদৌ অস্বীকার করিলে তাহার আর কোন অর্থই থাকে না, সকল প্রশ্নই অবান্তর হইয়া পড়ে; আত্মাকে অস্বীকার করিলে একটা গোঁজামিল-দেওয়া অর্থ হয় বটে, কিন্তু সদর্থ হয় না। প্রাণকে বুঝাই কিসে?

প্রশ্ন-সমাধানের এই দুই দিক্ মাত্র আছে—তৃতীয় কোন তত্ত্ববাদ নাই। এক দিকে মায়াবাদী নাস্তিক, অপর দিকে ভোগবাদী চার্ব্বাক। মায়াবাদীর দিন গিয়াছে, চার্ব্বাক আজিও আছে এবং জয়ী হইয়াছে। সেই চার্ব্বাক-নীতি—good living-এর প্রণালী—আরও পাকা হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদী নির্ব্বোধের দল প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়া ঋণ মেলা ভার হইয়াছে—ঘৃতপানের উপায় আর সহজ নহে। তথাপি, যেহেতু ঘৃতপান সকলকেই করিতে হইবে, তাই আজ পৃথিবীময় শৃগাল-সারমেয়গণ গগনভেদী কোলাহল তুলিয়াছে। এ কোলাহলের নিবৃত্তি নাই, ইহার একমাত্র পরিণাম এক জগৎব্যাপী নরমেধ-যজ্ঞ; মহাকাল যথা-সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

কিন্তু আমার উপায় কি? আমি মায়াবাদীও নই, চার্ব্বাকপন্থীও নই; জগৎ ও জীবনের বাহিরে কোন সত্যের আশ্বাস আমার নাই; অথচ আধুনিক বৃহস্পতি মহামুনি চার্ব্বাকের বিশুদ্ধ কাম-বুদ্ধির ভোগবাদেও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তাহার কারণ, মানুষের দেহাভিমানকেই আমি মানবীয় সত্তার সবটুকু বলিয়া বিশ্বাস করিতে অক্ষম—ভিতর হইতে আর একটা কি 'খবরদার' বলিয়া উঠে, বাক্য ও তর্কের গোঁজামিল দিয়া তাহাকে থামাইয়া রাখা আমার পক্ষে দুষ্কর। চার্ব্বাকপন্থীর আত্মপ্রসাদ কি কারণে সম্ভব তাহাও জানি; সে আত্মপ্রসাদের মূলে আছে একপ্রকার মত্ততা; নিরন্তর good living-এর সুখান্বেষণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার মত তীব্র সুরার উন্মাদনা যাহার রক্তে নাই, তাহার পক্ষে ওই ভোগবাদ নিষ্ফল। আবার মানবের ইতিহাস যতখানি স্মরণ করিতে পারি—কালস্রোতে আমারই মত কোটি কোটি মানবসন্তানের উত্থান-নিমজ্জনের যে চিত্রাবলী মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে, এবং আমারই চারিপাশে, কাল ও আজিকার ব্যবধানে, মনুষ্যচরিত্র ও মানব-ভাগ্য যে নিদারুণ নিষ্ফলতার রঙে কালো হইয়া উঠিতে দেখি, তাহাতে জীবনের কোনও অর্থ বুদ্ধিগোচর হয় না; এবং যাহার কোন আধিভৌতিক প্রতিষ্ঠা নাই, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ আদৌ মনঃপূত হয় না। তখন মায়াবাদ-

বিদ্রোহী মনও মহাশূন্যের ঘোর নৈরাশ্যে অভিভূত হয়, আমার পরম আস্তিক্য-লোভী প্রাণকেও নাস্তিক্যের দিকে ঠেলিয়া দেয়।)

তখন যে-ভাবনার উদয় হয়—সেই ভাবনা হইতে জীবনের যে একটা নূতন অর্থসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগে, আমার কথার মূলে আছে সেই প্রবৃত্তি। অর্থ করিবার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই, কিন্তু প্রবৃত্তি আছে এবং তাহা অনিবার্য্য। জীবনের দিক্ দিয়াই জীবনের ব্যাখ্যা যাহা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহাতে আদি-সমস্যার পূরণ হয় নাই—জটিলতা বাড়িয়াছে মাত্র। স্বীকার করিতে হইবে—এ সমস্যার সম্যক্ সমাধান হয় নাই, হয়তো তাহা সম্ভব নয়। গত কয় শতাব্দীর ইতিহাসে প্রাচ্য-জাতির ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া আছে। দেহ ও আত্মা, এই দুইয়ের সংগ্রামে এককালে তাহারা যে আধ্যাত্মিকতার বিরাম-দুন্দুভি তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা বহুদিন হাত হইতে খসিয়া গিয়াছে। মনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া তাহারা যে নিষ্ক্রমণ-পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাও পরলোক নামক এক ছায়াপুরীর বহির্দ্বারে শেষ হইয়াছে—জাগর-লোক হইতে স্বপ্নলোকে, আলোক হইতে অন্ধকারে প্রস্থান করিয়া যাহারা ভব-ভয় হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, তাহাদের প্রাণমন বিকল হইয়াছিল মাত্র, আলোক-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের মানুষ অতি সহজেই এই পন্থা পরিত্যাগ করিল—ঠিক উল্টা পথে, অন্তর্লোক হইতে বহির্লোকে যাত্রা করিয়া তাহারা প্রখর দিবালোকেই জীবনের সীমা সন্ধান করিয়াছিল। আজ সেই সীমা তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির বিরাটত্ব তাহাকে অভিভূত করিয়াছে—তাহাতে তাহার জ্ঞানাভিমানের দম্ভ মাত্র চরিতার্থ হইয়াছে, মানুষেব মনুষ্যত্ব অতিশয় ক্ষুদ্র তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। একদিকে দেহকে উপেক্ষা করিয়া আত্মার পক্ষাঘাত, আর এক দিকে আত্মাকে অস্বীকার করিয়া দেহের অপঘাত। মানুষের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত তাহার যে নিয়তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে জীবনকে, তথা জগৎকে, মানুষের পক্ষে শ্রদ্ধা করিবার কি আছে?

আমি জানি, মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির যে উপায় আজ উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহাতে সেই ক্ষুধা বিকৃত হইবে মাত্র কখনও মিটিবে না; বরং ক্ষুধার যে বস্তুকে চূড়ান্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, অন্নকেই যে ব্রহ্ম-নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষের বুকের উপরে যে বেদীনির্ম্মাণ হইতেছে, তাহাতে মনুষ্যত্বের শ্বাসরোধ অনিবার্য্য। অন্ন-ব্রহ্মের—good living-এর—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যাঁহারা তাঁহাদের মতে, গাছ-পাথর,

গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু-জল প্রভৃতির যে নিয়তি, মানুষেরও তাহাই—মানুষের মধ্যে তাহা চেতনাযুক্ত হইয়াছে মাত্র। এই চেতনাও জড়ধর্ম্ম, তদতিরিক্ত কিছু নহে। যে নিয়তিনিয়মে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরিতেছে, শীতাতপের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, অণু মহাকায় হইতেছে—মানুষের চিৎসত্তাও তাহারই একটা বিবর্ত্তবিলাস মাত্র। জন্ম-মৃত্যুর শাসন-মুক্ত ক্ষয়োদয়রহিত কোনও পৃথক্ সত্তা নাই—সে একটা অভিমান, একটা ব্যাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব, "আত্মানং বিদ্ধি" অর্থে—নিজেকে সেই জড়শক্তিরই একটা ক্ষুদ্র বিকাশযন্ত্র-রূপে জানিয়া লও; দেহ ছাড়া আর কিছুই নাই; মন ও বুদ্ধি এই দেহ হইতেই উৎপন্ন একটা সূক্ষ্মতর পদার্থ। বুদ্ধিরও ক্রমাভিব্যক্তি আছে—আজ এই বিংশ-শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সেই বুদ্ধিমান যন্ত্র কতখানি উন্নত হইয়াছে তাহার নিদর্শন—good living-এর অতি সূক্ষ্ম নিশ্ছিদ্র বার্হস্পত্য-নীতি। সেই চিৎ-যন্ত্র জীবনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা অতিশয় 'অথেন্টিক', কারণ তাহার মূলে দেহবিজ্ঞান ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই—দেহই দেহের ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে, আত্মার কুপরামর্শ তাহাতে নাই। ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে যে এক মহামন্বন্তর আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বুদ্ধিজীবীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কারণ, জড়শক্তির বিনাশ নাই, অভিব্যক্তির শেষ নাই, ধ্বংস নবসৃষ্টিরই সূচনামাত্র। সকলেই মরিবে, মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই, কেবল জীবদ্দশায় সেই জড়শক্তির অবমাননা না হয়। মৃত্যুভয় নাই, একমাত্র ভয়, পাছে ভোগ না করিয়া মরিতে হয়—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।

বুঝিলাম—সবই বুঝি, কারণ বুদ্ধি আমারও কিছু আছে। বুঝি যে, জীবনের বাহিরে কোনও অর্থ নাই, বাঁচিয়া থাকার মত সৌভাগ্য আর নাই। তাই এখন বাঁচাটাই যেমন দুরূহ হইয়াছে, তেমনই 'আপ্‌না-বাঁচা'র তাগিদও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কোন দিকে চাহিও না—আপনাকে বাঁচাও। জাতিহিসাবে অপর জাতিকে কবলিত কর, সমাজ বা সম্প্রদায়হিসাবে অন্য সমাজ বা সম্প্রদায়ের ধ্বংসসাধনে মন দাও, পরিবারহিসাবে আপনার স্ত্রীপুত্র ভিন্ন আর সকল আত্মীয়কে দূর করিয়া দাও, ব্যক্তিহিসাবে আবশ্যক হইলে আপনার স্ত্রী-পুত্রকেও বর্জ্জন কর, নহিলে বাঁচিবে না। কারণ good living-এর যে কাম-সংহিতা, তাহার বীজমন্ত্র—আত্মসুখসাধন। আরও বুঝিতেছি, এই মন্ত্র সভ্য ও সবল পিশাচের ইষ্টমন্ত্র; মমতাদুর্ব্বল, বুদ্ধিহীন, অসভ্য মানুষের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য। তাহারাও ইহার সাধনে তৎপর হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সুখসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতেছে না—

নাস্তানাবুদ হইতেছে, শেষে আত্মহত্যা করিতেছে। ইহা যেমন সবলের ধর্ম্ম, তেমনই সবল ও নির্ম্মম নর-দানবেরাই জীবনযাত্রার নব বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেছে—গণতন্ত্র, দলতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসংঘ-চালিত পীড়ন-যন্ত্র, তাহার বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কঠোরতা ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে; সেই যন্ত্রের চাপে মানুষের প্রাণ কোথায়ও ফাটিয়া বাহির হইবার রন্ধ্র পাইতেছে না। ব্যাঘ্রের পরিচালনায় মেষদলকেও রক্তলোলুপ হইতে হইবে—পুরস্কারস্বরূপ আমিষখণ্ড মাত্র পাইবার আশা, তাহার ভাগ নাকি সমান হইবে। এ-যুগের পণ্ডিত যাঁহারা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারতত্ত্বটুকু যাঁহারা নিঃশেষে সেবন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকলের মধ্যে জড়া-প্রকৃতির অমোঘ শক্তির লীলা দেখিয়া মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইতেছেন; কার্য্যকারণশৃঙ্খলের জটিলতম রহস্য বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিয়া লইয়া নিরাশার আশাকে বিদ্রূপ করিতেছেন, অজ্ঞান মানুষের আত্মবিশ্বাসজনিত দুর্দ্দশা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছেন। কারণ, মরিবে—মর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু বুদ্ধিহীন হইও না। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তাহার বিবেক, তাহাই তাহার মূঢ়তার নিদান। অতএব অন্তরের সেই বুদ্ধিবৃত্তিহীন অজ্ঞান অসম্মতি, যাহা মানুষকে সুখে থাকিতে দেয় না, যাহাকে বারবার লঙ্ঘন করিয়াও স্তব্ধ করা যায় না, যাহার উৎপাতে মানুষ বুদ্ধিমান হইয়াও নির্ব্বোধ হইয়া থাকে, তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ কর; নহিলে বাঁচিবে কেমন করিয়া?—শূন্য হৃদয়ে ও শূন্য জঠরে good living-এর ধ্যান করিয়াও বাঁচা যায়, যদি গর্ব্ব করিবার মত জ্ঞানবুদ্ধি থাকে।

আধুনিক ঋষি-প্রোক্ত জীবন-বেদ মোটামুটি ইহাই। স্বীকার করিতেই হইবে, আজ জগতের অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহাতে গত্যন্তর নাই। কিন্তু প্রাচীনের মায়াবাদ, বৈরাগ্য প্রভৃতির সঙ্গে এই জীবনদর্শন মিলাইয়া দেখিলে কি বুঝি? প্রাচীনের দৃষ্টি ছিল পরপারে, সে একটা মহত্তর জীবনের আশা রাখিত, স্বপ্ন দেখিত—ইহজীবনকেই সে নিরর্থক মনে করিত। আধুনিকের দৃষ্টি এপারে আবদ্ধ, পরপারকে সে খেদাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আশা বা স্বপ্ন কোন-টাকেই সে এপারেও স্থান দেয় না। জীবনকেও সে কোনও নূতন অর্থে অর্থবান করে নাই, মানুষকে সে একটা সুগঠিত জীব-যন্ত্ররূপে কল্পিত করিয়াছে। অর্থবান করে নাই বলিতেছি এইজন্য যে, সে ইহার আদি ও অন্ত সম্বন্ধে কোন ভাবনা বা থিওরির ধার ধারে না; বরং সেরূপ কোনও অর্থ ইহার নাই, হইতে পারে না—

ইহাই সদম্ভে ঘোষণা করে। তবেই দেখা যায়, জীবনসম্বন্ধে সে আরেকভাবে প্রাচীনের সেই মায়াবাদ বা শূন্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে। তফাৎ এই যে—প্রাচীন একেবারে নাস্তিক হইতে পারেন নাই, সে সাহস তাঁহাদের ছিল না; তথ্যকে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও একটা তত্ত্ব গড়িয়া লইয়া এবং তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিরাট্ শূন্যতলে নিমজ্জমান 'আত্ম'-কে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক শূন্যবাদী যাহারা, তাহারা কোনও আশ্রয়ের প্রয়োজনবোধও করে না—'আত্মা'-কে সম্পূর্ণরূপে জড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া, মন-বুদ্ধি নামক জড়শক্তির অধীন হইয়া, তাহারা অতিশয় নির্ভীক ও উদ্দাম শূন্যপথযাত্রী হইয়াছে। জীবন ও জগৎ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক্ দিয়া অর্থহীন, নীতিহীন, ধর্ম্মহীন। গাছের যেমন সার্থকতা—মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া তাহার শাখাপ্রশাখার সম্যক্ বিস্তারসাধন, এবং ফুল বা ফলের পরিণতিতেই তাহার জীবনের সমাপ্তি—তার পরে আর কিছুই নাই; তেমনই, দেহমনের চূড়ান্ত পরিণতি ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই; এবং মানুষের বুদ্ধি বা দেহচেতনা যতই উন্নত ও প্রখর হইবে, ততই ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা বা আত্মসুখসাধন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। আধুনিক সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা, যাঁহারা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মনস্বী কর্ম্মবীর, good living-এ যাঁহারা সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছেন।

তাহা হইলে দাঁড়াইল কি? জগৎ মিথ্যাই। মানুষের স্বকীয় কল্পনার আত্মা ভগবান্ প্রেম, সত্য প্রভৃতির—কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই, সে পক্ষে জগৎ সত্যই উদাসীন। কত শতাব্দী ধরিয়া মানুষ জগতের সঙ্গে বিরোধ ও সন্ধি দুইই করিয়াছে—কিছুতেই তাহাকে বশ বা আত্মীয় করিতে পারে নাই। কখনও রাগ করিয়া তাহাকে অস্বীকার করিয়াছে—কাষায়-চীবর ধারণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে; কখনও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে—ক্রুশকাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে; কখনও বা কৌশলে তাহার নিকট যতটুকু সম্ভব আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছে; কিছুতেই কিছু হয় নাই। 'ভূমা' বা 'আত্মন্' নামক বটিকার সাহায্যে তাহাকে হজম করিতে গিয়া আপনি হজম হইয়া গিয়াছে; ভগবৎ-প্রেম নামক অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া তাহারই নেশায় সর্ব্ব দুঃখ ভুলিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। আজ এতকাল পরে মানুষ সত্যই হাল ছাড়িয়াছে, সে আপনাকে হত্যা করিয়া এই দ্বন্দ্বের অবসান করিতে চাহিতেছে। জগতের সঙ্গে সে পারিয়া

উঠিল না। জগৎকে জানিতে গিয়া সে আপনাকে জানিতে ভুলিয়াছে—সে আর এক মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছে। ইহাও অন্ধতা। কিন্তু ভোলা কি যায়? দেহের জন্য যাহা করিতেছি, তাহা আসলে আত্মারই জন্য—আমি আছি বলিয়াই জগৎ আছে। জগৎ আমারই দেহ—জগতের মধ্যে যদি আমাকেই না দেখিলাম তবে দেখিলাম কি? কিন্তু দেহকে বা জগৎকে সেভাবে সে স্বীকার করিবে না—ইহাই তাহার সঙ্কল্প। মনে করিয়াছে, এমনই করিয়া সে মহাকালকে ফাঁকি দিবে! সেই ফাঁকির ফাঁকটি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং সেই ফাঁকে মন্বন্তরের প্রলয়-শ্বাস গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। তিন সহস্রাধিক বৎসরের মানব-সভ্যতা ও জীবন-সাধনার পরিণাম এই! এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ যুক্তি—অতি ক্ষুরধার বুদ্ধির অন্তিম সিদ্ধান্ত হইল—যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ! কারণ এই সুখ-জীবনের কৌশলই এতকাল পরে জানা গিয়াছে। মানুষ এতকাল সুখসাধন-রূপ নিঃশ্রেয়সের সাধনা করিতে পারে নাই—জানে নাই, অজ্ঞান ও কুসংস্কার তাহাকে ভীরু করিয়াছিল। জীবনের জড়তত্ত্ব আজ পরমতত্ত্বরূপে দেখা দিয়াছে, মানুষের বিবেক-ভয় ঘুচিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, আজ যে-মুনিগণ জীবন-সমুদ্রের দিক্-দেশ নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহারা উপরকার তরঙ্গ-গণনাই করিয়াছেন—নিম্নতলের বিরাট্ গহ্বর, অতি-গভীর, শুদ্ধ অথচ অতি প্রবল অন্তঃস্রোত তাঁহাদের গণনার বহির্ভূত বলিয়াই তাঁহাদের এত সাহস, এত দম্ভ! মানুষ যুগে-যুগে কোন্ দ্বন্দ্বে অবসন্ন হইয়াছে—আত্মসুখসাধনের জন্যই যে সে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, সে যে কোনও কালে কম বুদ্ধিমান ছিল না—এ-কথা আজ আর কেহ ভাবিয়া দেখে না। সেই বুদ্ধি বাড়িয়াছে বলিয়া মানুষের দুঃখ কখনও ঘুচে নাই, সমস্যা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গিয়াছে, এবং থাকিবে। তোমার বিজ্ঞানও থাকিবে, তন্ত্র-মন্ত্রের কুসংস্কারও থাকিবে; গাঁজাখোর উদাসীনও থাকিবে, পক্কবুদ্ধি D. Sc., F. R. S.-ও থাকিবে। তথাপি মানুষের দুঃখ ঘুচিবে না। দশজন ভোগ করিবে, কোটিজন চাহিয়া থাকিবে; বুদ্ধিমান নির্ব্বোধের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইবে, শক্তিমান দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে—জড়া-প্রকৃতির যে নীতি—Survival of the Fittest—তাহাই জয়যুক্ত হইবে। কথা সেই এক—অতি পুরাতন।

কিছুদিন হইতে এই পুরাতন কথাটাই মনে মনে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। আমি দার্শনিক নই, বৈজ্ঞানিক নই, অর্থনীতি বা ইতিহাসবেত্তাও নই; আমি রোগশোকজর্জ্জরিত সামান্য মানুষ—আমি বনস্পতি নই, অতি ক্ষুদ্র তৃণ। যাহারা

প্রায় সর্ব্বত্র সুলভ, উন্নত বা দীর্ঘ না হইলেও যাহারা ধূসরকে শ্যামল করিয়া রাখে, সামান্য ধারাবর্ষণে প্রফুল্ল হয়, দীর্ঘকাল আতপ সহ্য করিয়াও মরে না, বিবর্ণ হয় মাত্র —আমি সেই অতি-সাধারণের একজন। তথাপি, দর্শন-বিজ্ঞানের অত্যুচ্চ তত্ত্বরাজির অনুশীলন বা বুদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ লাভ না করিলেও আমি জীবনকে আর এক দিক্ দিয়া দেখিয়াছি; যাঁহারা জীবনের ব্যাখ্যাতা নন—দ্রষ্টা, মানুষের প্রাণকেই যাঁহারা পরম বিস্ময় ও সশ্রদ্ধ কৌতূহলে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কণ্ঠে মানুষের ব্যথা বাণী হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহাদের সহবাসে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি। তাই আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞান-দর্শন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির যতই সহায় হউক, এবং আধুনিক কালে বিজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হউক, ক্ষুধার্ত্তের ভিক্ষাভাণ্ডে ভস্ম-মুষ্টিই মিলিয়াছে। বরং যে-কবিই মানব সভ্যতার আদি-গুরু, যাঁহার দিব্যদৃষ্টি তমসার পারে মহান্ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—আজ এই অতিবুদ্ধির যুগেও তাঁহারই বংশধর মানুষের পরম পিপাসার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি-সাধন করিতেছেন। সেই বাণী আজ আর কেবল অবসর-বিনোদনের সামগ্রী নয়; এক এক-কবির কণ্ঠে এক-এক ঋক্ উচ্চারিত হইতেছে, জীবনরূপ মহারহস্যের ঘনান্ধকারে বিদ্যুৎবিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্শন বা বিজ্ঞানের মত এই কবি মনীষিগণের কোনও মতবাদ নাই—তাঁহাদের বাণীতে জীবনের কোনও তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎকার আছে। সেখানে—"deep calls unto deep"; যাহার চৈতন্যের গভীরতা বা স্ফূর্ত্তি আছে, যাহার সত্যকার পিপাসা আছে, সেই তাহাতে সাড়া দেয়, এবং জীবনের দুর্ভেদ্য রহস্যই তাহাকে এক অপূর্ব্ব উপায়ে আশ্বস্ত করে। ইহাকে ভাবসর্ব্বস্ব অজ্ঞতা-বিলাসীর 'মিষ্টিসিজ্‌ম' বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবার কারণ নাই; যাহার ব্যাখ্যা হয় না—কেহ দিতে পারে নাই,—পারে নাই বলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিয়া, অথবা তাহার বিষয়ে একরূপ মানসিক ব্যায়ামের বাহাদুরি করিয়া, নিজেকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া লাভ কি? বরং ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া অনুভূতি ও প্রতীতির পথে তাহাকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইবার যে অপরা শক্তি মানুষের প্রতিভায় প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান নয়—নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় ক্ষতি কি? "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো"—প্রাচীন ঋষির কথা তো আজও মিথ্যা হয় নাই। মানুষের মধ্যে যতটুকু মনুষ্যত্ব আছে, এবং কখনও একেবারে লোপ পাইবে না—সেই মনুষ্যত্ব বিত্তের দ্বারা তর্পণীয় নহে। তাই এই বিত্ত বা

'মেটিরিয়াল' সম্পদ্ আজ মানুষকে যে পরিমাণে লোভাতুর করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই তাহাকে দিক্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। সুখ নাই—নেশার মত্ততা আছে; যতক্ষণ সেই মত্ততা আছে ততক্ষণ ছুটাছুটি, তার পরেই শেষ। মানুষের অন্তরতম অন্তরের সেই আর্ত্তনাদ আমি আমার মধ্যে শুনিতেছি, তাই বিজ্ঞানের শূন্যগর্ভ পটহ-নিনাদ অগ্রাহ্য করিয়া আমি সেই কবি-ঋষিগণের ঋক্-মন্ত্র হইতে যে আশ্বাস পাইয়াছি তাহারই কথা কিঞ্চিৎ বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু পারিব কি?

(২)

নিষ্পাপ শিশু দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় দিবারাত্র ছটফট করে, তাহার নাভিশ্বাসের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই যাতনা নিরুপায়ভাবে দেখিয়া থাকি। যখন সব শেষ হইয়া যায়, তখন শোক করিব, কি তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির নিশ্বাস ছাড়িব, ভাবিয়া পাই না। এমন কোনও বিজ্ঞান আছে, যাহার দ্বারা দেহের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুরতা নিবারণ করা যায়? যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে মানুষ এই পৈশাচিক ব্যবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া কেমন করিয়া সুখ-জীবন যাপন করিবে? অবশ্য আদি-অন্তের ভাবনা রোধ করিয়া কেবল বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই বাঁচিবার চেষ্টা করিবে—জীবন-পথে কেবল অগ্রসর হইতেই থাকিবে, পথ যেখানেই শেষ হউক। এই যে নিরুপায়ের উপায়, এই বাঁচিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকার সঙ্কল্প—ইহাকেই নানা নীতিকথায় মণ্ডিত করিয়া, মানুষ আসল কথাটাকে চাপা দিয়াছে। কিন্তু তবু মন যে মানে না, কেবল অসাড় হইয়া থাকে মাত্র—তাহা সকলেই জানে। জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাই না, শেষে তাহা নিরর্থক, এমন কি অনাবশ্যক বলিয়া, ফাঁসিকাষ্ঠের সম্মুখে গীতা-পাঠের মত মনকে দৃঢ় করিয়া থাকি। তথাপি মৃত্যুই সবচেয়ে বড় ভয় নয়; মৃত্যুকে ভয় করে না এমন মানুষের অভাব নাই—অবস্থাবিশেষে মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যুকে মানুষ বহু প্রকারে জয় করিয়াছে, কিন্তু জীবনকে জয় করা দুঃসাধ্য। জীবনেরই কারা-প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য, কারণ নিজেরই হৃদ্-দেশে সেই কারারক্ষী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে—মানুষ প্রতিপদে সেই অতি-দম্ভী আত্মাভিমানীর বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। মৃত্যুকে আমরা যে ভয় করি, তার কারণ—"Conscience doth make cowards of us all"; কারাপ্রাচীর একবার লঙ্ঘন করিতে পারিলে ভয় আর থাকে না। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই ভয়—জীবনকে বুঝিতে পারি না বলিয়াই মৃত্যুকে ভয়

করি। রহস্যময়ী যদি একবার তাহার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিত, তাহা হইলে দুঃখ থাকিত না—তাহার সেই আবৃত-চক্ষুর ক্রূর কটাক্ষ অধরের হাসির ধারায় নির্ম্মল নিরাময় হইয়া উঠিত।

আজ এক ভিখারী আসিয়াছিল। আগে প্রতি মাসের শেষে তাহার অনশনক্লিষ্ট মুখ আমার গৃহদ্বারে দেখা দিত। অতি মলিন, শতচ্ছিন্ন অথচ ভদ্রবেশ—দীনতার প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও হয়। দেখিলে কেমন ভয় হয়—সে যেন মনুষ্য-জীবনের আর এক অতি সাধারণ লাঞ্ছনার প্রতীক। এতদিন তাহাকে দেখি নাই, ভাবিয়াছিলাম বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ভালই হইয়াছে—বাঁচিয়াছে; মনুষ্যজীবনের ধিক্কার-লজ্জা-লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত যত দূর হয় ততই ভাল। আজ আবার সেই বিভীষিকা! এ যেন মরিবার নয়, দীনহীন অসহায় মনুষ্যত্বের ধ্বজারূপে তাহাকে দীর্ঘকাল লোকালয়ে বিচরণ করিতেই হইবে! বলিল, বড় অসুখ হইয়াছিল তাই সাত-আট মাস আসিতে পারে নাই। কথাটা মিথ্যা নয় নিশ্চয়। কিন্তু সেই অনশনক্লিষ্ট দেহ, সেই ক্ষীণ কণ্ঠ, সেই দুর্ব্বল পদক্ষেপ, কোনটাই একটু বেশি বা কম নয়! সম্ভবতঃ তাহার দুঃখে জোয়ার-ভাঁটা নাই—সুখেরই আছে, দুঃখের থাকে না; দিব্য এক ভাবেই আছে! মন সহসা বিরূপ হইয়া উঠিল, বলিলাম—তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চাই না, তুমি আর আসিও না। হতভাগ্য অবাক হইয়া গেল, অতিশয় আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি বড় দুঃখী, আপনি গরীবের মা-বাপ, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না। কি দোষ করিয়াছে? সে মানুষের মুখ হাসাইয়াছে, সে মনুষ্যকুলের কলঙ্ক! সে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি বা শক্তির অভাবে, good-living-এর ভদ্র-স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে—উত্তর তো অতিশয় সহজ! কিন্তু সে-উত্তর আমার মুখে যোগাইল না। আমার চক্ষে সে একটি বিভীষিকা—নিয়তির ক্রূর পরিহাসের আর একটি মর্ম্মভেদী অট্টরব। তাহার মধ্যে আমি মনুষ্যত্বের যে পরাজয় দেখিতেছি, তাহার কারণ আরও গভীর। জগতের মূল বিধির সঙ্গে তাহা জড়িত হইয়া আছে, তাহাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। সে আমারই দশান্তরের প্রতিচ্ছবি; তাহার মধ্যে আমি আমারই, বা আমার পুত্র-পৌত্রের, অতি সম্ভব ও অনিবার্য্য নিয়তির প্রকাশ দেখিতেছি। সেই সহানুভূতিই আমাকে বিকল করিয়াছে—আমারই প্রতি আমার নিদারুণ বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিয়াছে। বিমূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, আর কিছু বলিলাম না। পাপিষ্ঠকে বড়ই অবসন্ন দেখিলাম; সে বসিয়া পড়িল, বলিল, এক

মুঠা চাল ও একটু জল দিন, আর পারিতেছি না, কাল সমস্ত দিন উপবাস করিয়াছি।

এই তো মানুষ। মনুষ্য-জীবনের তলদেশে যে পঙ্ক রহিয়াছে তাহার দুই অঞ্জলি তুলিয়া দেখাইলাম, এই দুই-ই মানুষের আদি দুঃখ। যাহাদের মতে দেহ ও মনই সর্ব্বস্ব, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত ওই পঙ্কোদ্ধার করিতেই হইবে, কিন্তু এ পঙ্ক কখনও ধৌত হইবে না। চিত্ত-প্রকর্ষ বা মানস-রসায়নের যত প্রক্রিয়াই আবিষ্কৃত হউক, এ পঙ্কের পঙ্কত্ব ঘুচিবে না। কিন্তু বিশ্বাস করি, পঙ্কের উপর জল আছে, এবং পঙ্কে যে মৃণাল জন্মে তাহা হইতেই জলতল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধমুখী লতা-দণ্ডে, মুক্ত বায়ু ও আলোকের দেশে, পঙ্কজ ফুটিয়া উঠে। ইহা কেবল উপমা নয়, বাস্তব অর্থেও সত্য। সেই পদ্মের শোভা যাহারা দেখিয়াছে, তাহার গন্ধ-মধু আস্বাদন করিয়াছে, তাহারাই পঙ্ককে ঘৃণা না করিয়া—মানস-রসায়ন প্রয়োগে তাহাকে শোধন না করিয়া, তাহাকে সহ্য ও স্বীকার করে; আমি সে সৌভাগ্য অর্জ্জন করি নাই, তাই দুর্ব্বল প্রশ্নকাতর প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে।

সেই পদ্মের কথা শুনিয়াছি, তাহার গন্ধ-মধু পরোক্ষে উপভোগ করিয়াছি—ভোগ করি নাই; তাহা যদি করিতাম, তবে আজ এই কথার মালা গাঁথিতে বসিতাম না। ঋষি তাহাকে ধ্যানে অনুভব করিয়াছেন, কবি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। যিনি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন—তিনি কে? তাঁহাকে জানিব কেমন করিয়া? যে তাহা করে, সেও বোধ হয় না জানিয়াই করে—আপনাকে আপনি জানে না, পরিচয় দিবে কে?

এই মানুষকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কবি। ঋষি তাহাকে দেখিয়াছেন অতি দূরে—নিকটে চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারেন নাই। কবি তাহাকে অতি নিকটে বুকের কাছে ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি যেটুকু দূরে থাকা উচিত—না থাকিলে দেখার অসুবিধা হয়—সেটুকু দূরত্ব-রক্ষার চেষ্টার নাম আর্ট। এই আর্টের কত ভঙ্গিই দেখা গিয়াছে—গান, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস—কাব্যের কত রূপ-বিবর্ত্তনই হইয়াছে! আজও তাহার শেষ নাই। ঋষি ও কবি, দুইজনেই এই পরম বস্তুর সন্ধান করিয়াছেন। একজন দৃষ্টিমুগ্ধ, আর একজন সৃষ্টিলুব্ধ। ঋষির চক্ষে সে একটি জ্যোতি, সৃষ্টির মুকুর-ফলকে তাহা উদ্ভাসিত হয় মাত্র; সে সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র,—সৃষ্টি তাহারই প্রপঞ্চ। সে অনির্ব্বচনীয়—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। তাই তাহাকে বাণীতে

ধরা অসম্ভব; তাহাকে দেখা যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। কবিও দেখেন, কিন্তু সে দেখার ভঙ্গি স্বতন্ত্র। তিনি তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করেন, এবং রূপই তাহার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বাণীরূপ বাহু প্রসারিত করেন। রূপ এমনই যে, তাহা দেখিলেই দেখাইতে হয়; যে দেখাইতে পারে না, সে দেখেও নাই। এই রূপ—মানুষেরই প্রাণের রূপ—কবির ভাষায় যুগে যুগে প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে। ঋষি তাহাকে তমসার পারে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন, কবি সেই ক্ষণ-জ্যোতিকে উর্ব্বশীরূপে এই পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন—বিরহী পুরূরবার অশ্রুজলে সে স্থিরবিম্বিত হইয়া উঠে। কিন্তু কবি ও ঋষির মধ্যে এই ব্যবধান সত্ত্বেও, উভয়ের আদিম সগোত্রতা কখনও ঘুচে নাই। কতকাল ধরিয়া উর্ব্বশী পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তিনীরূপে বিরাজ করিয়া, কবি-ও-ঋষি পুরূরবাকে দিশে দিশে ছুটাইয়া দিশেহারা করিয়াছে—অন্তরে ধরা দিয়াও অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়াছে। মানুষ তাহার জন্য সপ্তলোক সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্টির সীমার বাহিরে সৃষ্টিলক্ষ্মীর আসন রচিয়াছে; নিজ নাভিগন্ধের কারণ-স্থল নির্ণয় না করিয়া কান্তারে-গহনে তাহার সন্ধান করিয়াছে। সৃষ্টির এই আনন্দরূপিণীকে ঘটে ও পটে ধরিবার জন্য কবি আকুল, ঋষি তাহার একটা সার্ব্বভৌমিক সত্তার আশ্বাসেই মুগ্ধ। কবির পক্ষে যাহা বস্তু, ঋষির পক্ষে তাহা তত্ত্ব; এবং বস্তু ও তত্ত্বের এই লুকাচুরি—ঋষিভাব ও কবিভাবের এই দ্বন্দ্ব—সাহিত্যে আজিও ঘুচে নাই। সেই যে বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি—মানুষের আত্মা তাহার জন্যই চিরদিন ক্ষুধাতুর; এবং কবিও যেহেতু মানুষ, অতএব রূপের মধ্যে অরূপের, বস্তুর মধ্যে তত্ত্বের, ভূমির মধ্যে ভূমার ভাবনা তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকল ধর্ম্ম, সকল নীতি, সকল আদর্শবাদের মূলে মানুষের এই আদি আত্মিক সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋষির ধ্যান ও কবির কল্পনা ভিন্নমুখী হইল বটে—উর্ব্বশী অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া ভূমিতেই আসন পাতিল বটে-—কিন্তু মানবের জীবনে, মানবের চরিত্রে, কবি যাহার লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার বহুত্বে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; একটা একের আদর্শ তাঁহাকেও পাইয়া বসিল—জীবনের মৃৎবিগ্রহ, মানুষের মনুষ্যত্বই, তাঁহার কল্পনাকে চরিতার্থ করিল না। একদিকে ঋষির ধ্যান, অপরদিকে কবির প্রেম, এই দুইয়ের কোনটাই স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারিল না—সৃষ্টির রসরূপ বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যায়, বস্তুর বস্তুরূপ রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়। তাই কবিও নিশ্চিন্ত হইতে

পারেন না, জীবনের একটা অর্থ সন্ধান করিতে হয়। দেহের যে আধি-ব্যাধি, প্রাণের যে সান্ত্বনাহীন শোক অতঃপর কবিচিত্ত মথিত করিল, তাহার সহিত সন্ধি করিবার—তাহাকে সহ্য করিবার—একটা উপায় কবিই আবিষ্কার করিলেন। ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হত্যা করিয়াছে, তাহার শোকে ক্রৌঞ্চীর আর্ত্ত-চীৎকার শুনিয়া যাঁহার কণ্ঠে আদি-শ্লোক উদীরিত হইয়াছিল; সেই একান্ত ব্যক্তিগত অবিষহ্য ব্যথা যে কবির হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিল—তিনি কতকাল তাহার ধ্যান করিয়া, অবশেষে সেই ব্যথাকে জয় করিবার ছলে, রামায়ণ রচনা করিলেন। ব্যক্তি ছোট হইয়া গেল, মানুষ মহামানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল—জীবন হইল একটা তপস্যা, চরিত্রই হইল একমাত্র সাধনার বস্তু। প্রিয়া-বিরহে একদা যে-পুরুষ বিলাপ-ধ্বনিতে কানন-কান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল, লোক-হিতের জন্য সে-ই অতঃপর প্রাণসমা পত্নীকে বিসর্জন করিল—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড অনায়াসে উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। মানুষ আর মানুষ রহিল না; দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কবি যে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাতে ব্যক্তির সুখ-দুঃখ মিথ্যা হইয়া গেল। সে মানুষের কথা নয়—মনুষ্যত্বের কথা, একটা মনঃকল্পিত সর্ব্বমানবীয় ব্যক্তির কথা। কবি এখানে ঋষি, ইহাও কবিত্বের আর্ষ-যুগ।

আমাদের দেশে ইহাই কাব্যের আদি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহাভারত মহাকাব্য হইলেও তাহা পুরাণ, কাব্য নহে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাহাতে ঘটনা, তথ্য ও তত্ত্ব এমনভাবে স্তূপীকৃত যে, তাহা কাব্যোচিত রস-পরিণতি লাভ করে নাই; অথবা, তাহার ঘটনা ও চরিত্র কল্পনাপ্রসূত নয়—তাহা ইতিহাস, তাহা বাস্তববিবৃতিমূলক রচনা। কিন্তু সেই বিরাট্ বিবৃতির মধ্যেই মানব-চরিত্রের যে অসংখ্য আলেখ্য এবং মানব-ভাগ্যের যে বাস্তব-রহস্য গাঢ় ও গভীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে—কোনও একটি বিশিষ্ট আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মানুষের জীবনকে যে বিচিত্র ও নানা অবস্থানে দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সাহিত্যে এই একমাত্র গ্রন্থকে 'মানব-মহাবংশ' বা 'মানবায়ন'-মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। এই কাব্যে এক বিরাট্ দেশ-কালের মধ্যে কবি মানুষকে স্থাপনা করিয়াছেন; আদর্শ, নীতি ও ধর্ম্মের কথা কিছুই বাদ দেন নাই বটে, কিন্তু মানবচরিত্র-ব্যাখ্যান হইতে সেগুলিকে পৃথক্ রাখিয়াছেন, অন্ততঃ কাহিনীর প্রধান অংশে; মানুষের কামনা ও ভাবনা এই দুই-ই পাশাপাশি থাকিয়াও সুস্পষ্ট রেখায়

পৃথক্ হইয়া আছে—ধর্ম্মের কথা ও মর্ম্মের কথা তুই-ই স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় কাব্যে যে-ট্র্যাজেডি অচল, অথচ মানব-মহাকাব্যের যাহা একটি অতিশয় বিশিষ্ট রস, এই মহাভারতে তাহা পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে। রামায়ণের কবি যাহাকে এক অত্যুচ্চ আদর্শ-কল্পনার গীতিরসে সিঞ্চিত করিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকে বাস্তব-জীবনঘটিত নাটকীয় কাব্যরসে উজ্জ্বল করিয়াছেন। পাপ, পুণ্য, চরিত্র ও বাহুবল, জ্ঞান, প্রেম, মহত্ব ও নীচতা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপরিসীম দৈন্য—এ সকলের মধ্যে তিনি তুর্ব্বল অসহায় মানুষকেই দেখিয়াছেন; মহামানব নয়—এই পৃথিবীরই রক্তমাংসের মানুষ অতিশয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়া মহাকালের অঙ্গনে যে-নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে, তাহার যবনিকা অন্ধকার,—মহাভারতে সেই যবনিকা-পাত আছে; এবং তাহা নিরতিশয় তুর্ভেদ্য বলিয়া, মানুষ এই নটলীলায় নিযুক্ত থাকিয়াই যে সকল চিন্তা ও ভাবনা না করিয়া পারে না—যাহা তাহার জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—মহাভারতে তাহাও স্থান পাইয়াছে। তাহাতে মানুষের কামনা ও ভাবনা, তাহার প্রবৃত্তি ও প্রতিভা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছে।

অতএব মহাভারতকার মানুষকেই দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, মানুষের প্রাণ, মন ও আত্মা—এই তিনেরই মিলিত চিত্র এই মহাকবির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় কবিগণ কাব্যকে একটি কলাবিদ্যারূপে আয়ত্ত করিয়া তাহার অনুশীলন করিয়াছেন; এই সকল কবি মানুষ না আঁকিয়া মানুষের শোভন-সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন—সাগরে সন্তরণ না করিয়া সরোবরে মনোহর পদ্ম ফুটাইয়াছেন। এ সকল কাব্যকে 'poetry of interpretation' না বলিয়া 'poetry of refuge' বলিতে পারি। বাস্তবকে দূরে রাখিয়া, অথবা তাহার একদেশের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আশ্বস্ত হইবার উপায় ইহাতে আছে; জীবনের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বুঝিবার প্রবৃত্তি নাই।

তথাপি, কাব্যহিসাবে কবির কৃতিত্ব কোনকালেই অল্প ছিল না। বাস্তব জীবন ও সমাজ কবিকল্পনাকে যখন যেমন রসদ জোগাইয়াছে, অথবা যে-কালে যে-ধরণের জীবন-নীতি বা অধ্যাত্মবাদের প্রাতুর্ভাব হইয়াছে, কাব্য সেই অনুসারে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় জীবন-সাধনায় বস্তু অপেক্ষা তত্ত্বই যখন প্রাধান্য লাভ করিল, তখন কাব্যও নির্ব্বিশেষ রসের আধার হইয়া উঠিল। তথাপি

বিশেষই কবিকল্পনার উদ্দীপন-কারণ ; বিশেষকে, ব্যক্তিকে, সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রকাশ-গুলির প্রত্যেকটিকে—তাহার স্বকীয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত দেখার যে দৃষ্টি, তাহাই কবিদৃষ্টি, এবং তাহার যে আনন্দ তাহাই রস। রূপের বাহিরে নয়, জীবনকে অতিক্রম করিয়া নয়, ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া নয়,—তাহাকে স্বীকার করিয়া এবং তাহারই মর্ম্মস্থলে আত্মার পদ্মাসন পাতিয়া সৃষ্টির জয়ঘোষণা—জীবনের স্তোত্রপাঠ—ইহাই কবিধর্ম্ম। কিন্তু এই কবিধর্ম্মে মানুষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই, কবিকেও সেজন্য রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম্মনীতির আনুগত্য করিতে হইয়াছে। তথাপি কবির দৃষ্টি যে-জগৎ সৃষ্টি করে তাহা অবাস্তব-মনোহর এবং মানুষের কল্পনাসুখ-সহায় বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। যিনি চিন্তাবীর বা কর্ম্মবীর—যাঁহারা ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রনেতা, তাঁহারা কবিকে বিশ্বাস করেন না। য়ুরোপে যে-জাতির কাব্যপ্রতিভা সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়াছিল, এবং যাহাদের কাব্যে, একদিকে অতি সুস্থ সৌন্দর্য্য-প্রীতি, ও অপর দিকে মানুষের চরিত্রবল-জনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব কবি-কল্পনার প্রেরণা হইয়াছিল, সেই জাতিরই এক তত্ত্ববাদী দার্শনিক কবিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই! তথাপি, প্রকৃতি-উপাসক জীবনাবেগ-চঞ্চল ঐ পাশ্চাত্য জাতি-সকলের মধ্যেই কবি-প্রতিভার যে ক্রমোন্মেষ হইয়াছে, তাহাতে কাব্যে জীবনের স্থান অনেকখানি প্রসারিত হইয়াছে। সেইখানেই শেষে এমন এক কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি জীবনকে বুঝিবার অপেক্ষা না করিয়া, তাহার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া, ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে ঘুরিয়া, অথবা স্থির জলতলে মুখচ্ছায়া দেখিয়া—কাব্যে যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মানুষ শুধুই মুগ্ধ হয় না, তাহার জীবনাবেগ বর্দ্ধিত হয়—জীবন-সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া, অথবা তাহাকে মন্থিত করিয়া, সে নিজের প্রাণকে নিঃশেষে স্পন্দিত করিয়া তোলে। সকল তত্ত্বকে নিঃসত্ত্ব করিয়া, সর্ব্বপ্রকার নীতিধর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া, মানুষের প্রকৃতি ও নিয়তি সেই কবির দিব্যদৃষ্টিতে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যের সেই এক রূপ। আত্মহারা তন্ময় কবি-প্রতিভা—প্রকৃতি ও মানবহৃদয়, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বোত্থিত অপূর্ব্ব বিস্ময়-রসে মূক-মুগ্ধ হইয়া ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছে যে, মানুষই এই মহানাটকের একমাত্র নায়ক, তাহারই হাসি-কান্না জয়-পরাজয়ের ছন্দে এই সৃষ্টি একখানি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। গগনভেদী বজ্ররবের মধ্যে যে সঙ্গীত—শিশুর কলহাস্য বা প্রণয়ীর গদ্‌গদভাবের মধ্যেও তাহাই রহিয়াছে; মনুষ্যজীবনের ট্র্যাজেডি ও কমেডি একই সুরে বাঁধা। দুর্জ্জেয় রহস্যের সমাধানে প্রয়োজন নাই, রহস্য

রহস্যই থাকুক ; কারণ, এই উপলব্ধিই যথেষ্ট যে—সৃষ্টিমন্দিরের বিরাট্ চূড়াকেও অতিক্রম করিয়া মানব-হৃদয়চূড়া উচ্ছ্রিত হইয়া আছে ; জীবনরস-রসিকতার মত মোক্ষমন্ত্র আর নাই। মানুষ যত দুর্ব্বল, বিধিবিড়ম্বিতই হউক, সে 'স্বমহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ভয় নাই, সংশয় নাই ; কারণ এই মহানাটকের ঐক্যতানবাদনে কোথাও তালভঙ্গ নাই ; চাই কেবল তন্ময়তা, বা সর্ব্বাত্মীয়তার অনুভাব-রসে আত্মনিমজ্জন। শেকস্পীয়ারের কাব্যলোকে, নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রঘটিত যত কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ জীবনের তরঙ্গভঙ্গে ফেনপুঞ্জের মত ভাসিয়া বেড়ায়—অতল নীল বারিরাশিকে আচ্ছন্ন বা অপরিচ্ছন্ন করিতে পারে না। কিন্তু এই কাব্যরসও মানুষের ব্যক্তিগত চেতনার দুরূহ দুঃখ দূর করিতে পারে না। জীবন-মহানাটকের দ্রষ্টারূপে, এবং দ্রষ্টার আসনে বসিয়াই, অভিনয়-গত পাত্রপাত্রীর সহিত একাত্মতা লাভের যে রস-মুক্তি, তাহা অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। শেকস্পীরীয় কাব্যে জীবনকে রস-দৃষ্টিতে দেখার শক্তি চরমে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ইহাও একটা অবস্থাসাপেক্ষ। যে 'সাধারণীকৃতি' রসাস্বাদের পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহাতে পাত্র-পাত্রীর সুখদুঃখ সর্ব্বব্যক্তিগত হইয়া উঠে, সেখানে মানুষকে পাই বটে, কিন্তু ঠিক আমাকে পাই না। অতএব, রসচেতনায় যাহা সম্ভব, ব্যক্তিচেতনায় তাহা সম্ভব নয়। কাব্যরস এই জীবন ও জগৎ-রহস্য হইতেই উদ্ধৃত হইলেও—particular বা বিশেষই তাহার উপজীব্য হইলেও—শেষ পর্য্যন্ত তাহা universal-এর পরিচর্য্যা করিবেই। অতএব খাঁটি রসচর্চ্চাতে মানুষের পরম উৎকণ্ঠা নিবারণের কোনও উপায় নাই। অতিশয় ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চেতনার সেই বাস্তব উৎকণ্ঠা দূর করিবার কি মন্ত্র আছে—যাহার বলে, universal-এর আশ্বাস ব্যতিরেকে মানুষ নিজের পাত্র নিজেই ভরিয়া লইতে পারে ?—তাহারই সন্ধান করিতেছি।

এই ব্যক্তিগত ক্ষুধা অতঃপর ব্যক্তিত্বের বা আত্মাভিমানের তৃপ্তিকামনারূপে কাব্যসাধনার মূল প্রবৃত্তি হইয়া উঠিল। কাব্য বাস্তবকে ত্যাগ করিয়া অতিমাত্রায় ভাবতান্ত্রিক হইয়া উঠিল—ব্যক্তিমাত্রের জন্য স্বতন্ত্র জগৎ কল্পিত হইল, এবং সেই জগতে অবাধ আত্মপ্রসারের স্ফূর্ত্তিই হইল জীবনের উপরে জয়লাভ। বলা বাহুল্য ইহাও একপ্রকার জীবনকে ফাঁকি দেওয়া। বস্তুজগৎ হইতে দূরে সরিয়া ভাব-জগতে বসিয়া এই যে আত্মপূজা—ইহাও একপ্রকার সন্ন্যাস ; এই এককীত্বও মানুষের প্রাণধর্ম্মের বিরোধী। জীবনের সমস্যা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত হইলেও, দুঃখের বাস্তব কারণ ব্যক্তির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। একের সহিত অপরের

নানাবিধ সম্পর্ক—বন্ধুবৈরী আত্ম-পর ভাব—আদি-যুগল হইতে পরিবারে ও সমাজে প্রসারিত সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিড়ম্বনা—ইহাই মানুষের জীবন জর্জ্জরিত করে; তাই একক-মুক্তির ভাব-স্বর্গ ধ্যানী রসিকের পক্ষে উপাদেয় হইতে পারে, কিন্তু যে আধিভৌতিক দুঃখ হইতেই মানুষের প্রাণে অধ্যাত্মসঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে ইহা ব্যর্থ বলিতে হইবে।

কিন্তু কবিধর্ম্মের এই পরিণামও অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মানস-উৎকর্ষ যেমন ক্রমশঃই বাড়িয়াছে, ও তাহার ফলে দুঃখবোধ প্রাণের ক্ষেত্র হইতে মনের ক্ষেত্রে যত অধিক সংক্রামিত হইয়াছে, ততই কল্পনা ও বাস্তবের ব্যবধান বাড়িয়াছে—কবি-প্রতিভার স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। এই যুগে কবিও মতবাদী তত্ত্বপ্রচারক হইয়া উঠিলেন—কবিদৃষ্টির মৌলিকতা জীবনকে ছাড়িয়া তত্ত্বগত হইয়া উঠিল; কেবল ঋষিত্বের দাবি নয়, কবি এক্ষণে তাঁহার সেই ভাবসত্যের বলে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দাবি করিলেন। এই যুগেই কবির মুখে এমন উক্তি শোনা গেল—"The poets are the trumpets that sing to battle, the poets are the unacknowledged legislators of the world!" কেহ বা গাহিয়া উঠিলেন—

We are the music-makers
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams;—
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams:
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.

—"Dreamers of dreams, world-losers and world-forsakers" বটে, কিন্তু তথাপি—"movers and shakers of the world"! কবি এখন ঋষি হইলেও লোক-নায়ক—জগতের ভাগ্যবিধাতা; তিনি মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে মহামানবত্ব, এবং বাস্তব সৃষ্টির পরিবর্ত্তে এক অবাস্তব অপরা-সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতেছেন। ঋষি হইতে কবি, এবং কবি হইতে ঋষি—আবর্ত্তনের চক্র এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে; এবং শেষে সেই চক্রপরিধি ত্যাগ করিয়া কবিমানস উৎকেন্দ্রগামী

হইয়াছে। ইহারও পরে, এই উৎকেন্দ্র-পথে এ পর্য্যন্ত যে কাব্য-সাধনা চলিয়াছে, তাহাতে একটা ব্যক্তিসর্ব্বস্ব আত্মাভিমানই আছে; আর বিষয়-মাহাত্ম্য নাই—আছে কেবল ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির অতি সূক্ষ্ম ও শূন্যময় কলাকৌশল। যে-মানুষ অতিশয় মনোধর্ম্মী, যাহার চেতনা অতি জটিল জড়-সংস্কারের সমষ্টিমাত্র, সেই তথাকথিত আধুনিক মানুষ এইরূপ কাব্যরসে মুগ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু মানুষের প্রাণ যেমন কোনকালেই মরে না, কবিও তেমনই কোনকালেই মরিবে না; "The still sad cry of humanity" মানুষের কাব্য-প্রতিভা চিরদিন উদ্‌বুদ্ধ করিবেই। ব্যথা মানুষকে পাইতেই হইবে; এবং যেমন করিয়াই হউক তাহাকে হজম করিতেও হইবে। মন তাহাকে উড়াইয়া দিতে চাহিলেও, প্রাণ তাহাকে পাইতেই চাহিবে; যে-মানুষ এই ব্যথার সবখানিকে স্বীকার করিয়া ও বক্ষে ধরিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে, তাহারই কণ্ঠের বাণী শুনিবার জন্য মানুষ উৎকর্ণ হইয়া থাকে। তাই, এ যুগেও আমরা সেই কবি-কণ্ঠের গভীরতর বাণী শুনিতে পাইতেছি। যে-বাণী যুগে যুগে রসাবেশের অজ্ঞান-মুহূর্ত্তে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে—অকূল আঁধারে বিদ্যুৎ-রেখার মত চমক লাগাইয়াছে, কিন্তু ভাগ্যবান্ ব্যতীত আর কাহারও চক্ষে যাহা স্থিররশ্মি হইতে পারে নাই—আজ সেই বাণী প্রাণের নিবিড়তম উৎকণ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বমানবের শ্রুতিযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। সকল সংস্কার, সকল sentiment পরিহার করিয়া, কবি আজ স্থির অপ্রমত্ত দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য হইতেই পৃথিবীর আর এক অংশে এক প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ জাতি জীবনকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল—মশানের ক্রুশ-কাষ্ঠে শূলবিদ্ধ অবস্থায় তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মানুষের ইতিহাসের যে অধ্যায়ে প্রাচ্যজাতি জরাগ্রস্ত, এবং পাশ্চাত্যও জীবন-নাট্যের অভিনয়ে যৌবন-লীলা প্রায় শেষ করিয়াছে—সেই কালেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আর এক জাতি সংসারে ও সাহিত্যে নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে; তাহার ফলে মনুষ্যত্বের ভিত্তিতল নূতন করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। নব-জীবনবেদের উদ্গাতা সেই রুশ-জাতির পরিচয় আজ আর কাহারও অবিদিত নাই; সেই জাতির সাহিত্যে যে কবিগণের আবির্ভাব হইয়াছে আমি তাঁহাদের বাণীর একটু পরিচয় দিব; এবং সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য একজন ইংরেজ মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করিব—আমার এ প্রসঙ্গে, তাহার অধিক নিষ্প্রয়োজন।

নব্য রুশ-সাহিত্যিক সর্ব্বত্র একটি প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন—"He is tormented by the desire for an answer to the question : Why is the world of men, what it is ?" একেবারে সেই গোড়ার কথা—'মানব-সংসার যেমন দেখিতেছি তেমন হইল কেন ?' "He has looked upon it without blinkers, without rose-coloured spectacles"—'সেই যে দেখা সে দেখায় চোখে ঠুলি নাই, রঙিন চশমা নাই'। "No other literature brings us into direct contact with life as Russian literature does"—'জীবনের সহিত এমন প্রত্যক্ষ পরিচয় আর কোন সাহিত্যে নাই'। "Tolstoy on the one hand and Dostoevsky on the other, seem completely to have explored the universal of human action and thought"—'মনে হয়, Tolstoy ও Dostoevsky—সে সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল—মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের কোন অংশ দেখিতে বাকি রাখেন নাই', এবং এমন করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, এই প্রশ্ন তাঁহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—এ ব্যবস্থা ভগবানের ব্যবস্থা, অতএব ইহাই ঠিক। এই উত্তরে যে-মানুষ আশ্বস্ত হইতে পারে, তাহাকে ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিতে হইবে, নতুবা এই ব্যবস্থা যে ঠিক, তাহা বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তি সম্ভব নয়। এজন্য রুশ-সাহিত্যিক সে উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; এইখানেই তিনি সাধারণ মানুষের পক্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই—'herein he shows his loyalty to humanity'। Anton Tchekov বলেন, যদি এইরূপ ব্যবস্থাই ভগবানের অভিমত হয়, তবে—"I must see with the eye of God", Dostoevsky, তাঁহার 'The Brothers Karamazov'—গ্রন্থে দুই দিকই দেখাইয়াছেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিতে এরূপ মীমাংসা অর্থহীন। Ivan Karamazov, কোনও একদিন সেই পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিলেও তাহাতে আশ্বস্ত হইবে না, কারণ, "the pain which has been suffered by one single child will make a discord, nothing can atone for it"—'এই ব্যবস্থায় একটি শিশুও যে যাতনা ভোগ করিয়াছে, তাহাতেই সেই সর্ব্ব-সঙ্গতির সুর ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিছুতেই সে দোষ কাটানো যাইবে না'। কিন্তু এই গ্রন্থের অপর চরিত্র Aloysha-র কথা সম্পূর্ণ বিপরীত। সে এই সত্যকে প্রাণের মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছে, এই জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গতি-বোধ তাহার পক্ষে

অনিবার্য্য—"There is no logic in this consummation: it is a miracle"—'এই পরম জ্ঞানসিদ্ধি কোনও রূপ যুক্তিবিচারসাপেক্ষ নয়, এ যেন মানুষের চেতনাগহনে একটা অঘটন-ঘটনা'। "Nothing short of a change of consciousness, a new way of apprehension could serve—the new way was opened to Aloysha"—'জগৎ ব্যাপারকে বুঝিতে হইলে মানুষের চেতনাকে বিপরীতমুখী করিতে হইবে, বুঝিবার দিক্-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে'। ইংরেজ মনীষীর মতে রুশ-লেখক Dostoevsky মানবজীবন-গ্রন্থে এক নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া ধরিয়াছেন।

আমার কথায় এখনও আসি নাই, আরও একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি আমার বড় কাজে লাগিবে, তাই প্রথমে তাহারই একটু আলোচনা করিব, এবং সেই সঙ্গে এই প্রসঙ্গের মূল প্রস্তাব আর একবার সংক্ষেপে উপস্থিত করিব।

(৩)

আমার এ কথা সত্যই অতি-পুরাতন, তাই নূতন করিয়া বলিতে গিয়া বলা আর হইয়া উঠিতেছে না—কখন সুরু করিয়াছি, এখনও শেষ হইল না! যে ভাবনা মানুষের প্রাণের অতি অন্তরঙ্গ—সকল কামনার অন্তস্তলে থাকিয়া যাহা মানুষকে যেন ভোগের মধ্যেই উদাসীন, ভয়ের মধ্যেই নির্ভয় করিয়া রাখে, তাহাকেই ধরিয়া কথার আকারে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছি; সে ভাবনা কি মানুষ সজ্ঞানে ভাবে? কারণ, সে তো ভাবনা নয়, সে যে প্রাণ-বল্লরীর মূলে নিত্যসঞ্চারী সঞ্জীবনী রস! তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এইরূপ মনে হয়—কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ধ্রুব-সত্যের আশ্রয় ব্যতিরেকে এই জীবনকে মানুষ বরণীয় ও সহনীয় বলিয়া মনে করিতে পারে কি না? কোনও দেবতা নাই, দেবত্ব নাই—কোনও ঐশ্বরিক অভিপ্রায় নাই; কেবল এই জীবন ও জগতের সহিত প্রাণগত পরিচয় মাত্র আছে। মানুষ যাহা তাহাই; ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ জীবনে অপরিহার্য্য, এবং মৃত্যুর শূন্য-গহ্বরই শেষ গন্তব্যস্থান—এই জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া মানুষ জীবনকে সার্থক মনে করিতে পারে কি না? ধর্ম্মশাস্ত্র বা অধ্যাত্ম-বিদ্যা এ বিষয়ে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে আশ্বস্ত করিতে পারে নাই,—তাহার সহজ জীবন-চেতনাকে খর্ব্ব ও তাহার মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে। মনুষ্যত্ব অর্থে, আমি কোনও ভাব-সর্ব্বস্ব আদর্শ বা কোনও

মহত্ত্বের ধারণা করিতেছি না—সার্ব্বজনীন মনুষ্য-প্রকৃতির কথাই বলিতেছি; কারণ, তাহা না হইলে মানুষের মানুষহিসাবে বা ব্যক্তিহিসাবে কোনও আশা নাই, জন্ম-মৃত্যুর পরিধির মধ্যে জীবনের কোনও অর্থ নাই। সে অর্থ বুঝিতে হইলে, ইহলোক ও ইহ-জীবনকে অনির্দ্দেশ কল্পলোক এবং কালাতীত মহাকালে প্রসারিত করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক তত্ত্বের দ্বারা জীবনকে অর্থবান করিয়া তুলিবার, এবং তদ্দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই নাস্তিক—আমিও সেই নাস্তিকের দলে। আমি মানুষের ভাগ্যকে কোন-কিছুর দ্বারা শোধন করিয়া লইতে পারি না; এই জীবনের যত-কিছু আধি-ব্যাধিকে মানবাত্মার পরীক্ষা, জগৎকে একটা পাপমোচন-যন্ত্র, অথবা ক্রমোন্নতির আরোহণী—বলিয়া স্বীকার করিতে আমার বাধে। যদি কিছু সৎ বা সত্য কোথাও থাকে, তবে সে এই জীবনের অস্থির আবর্ত্তের মধ্যেই আছে; যদি না থাকে, তবে তাহা কোথাও নাই—এই বুদ্ধি আমার চিত্তে দৃঢ়মূল হইয়াছে। পাপ-তাপ, দুঃখ-দৈন্য দূর হইবার নয়—উহারাই সৎ, উহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই অনাবশ্যক; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির কামনা বা ভাবনা জীবন-বিকার মাত্র। অনাদিকাল অবধি মানুষের জীবন উহারই দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, উহাকে অস্বীকার করা জীবনেরই বিরুদ্ধাচরণ; এবং যেহেতু বাঁচিতে কেহই অসম্মত নয়, অতএব তাহা মিথ্যাচার। যাহারা দুঃখের সহিত সুখেরও উচ্ছেদ-সাধন করিতে যত্নপর, অথবা যাহারা দুঃখকে ফাঁকি দিয়া কেবল সুখ-সাধনের কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত—তাহারা রাজা, গুরু, ভগবান্, রাষ্ট্র, সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা নীতির নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আজ পর্য্যন্ত শান্তি বা সুখের উপায় করিতেছে; কিন্তু এই সকলের তলদেশে মানুষের জীবন, তাহার ব্যক্তিগত ভাব-অভাব লইয়া, যেমন তেমনই বহিয়া চলিয়াছে, নব নব সংস্কারের বজ্র-বন্ধনেও জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এতটুকু পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই যে সত্য, ইহাকে স্বীকার করিতেই হয়। জগতের দিকে চাহিলে ও নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, জন্মের কারণ যেমন দুর্জ্ঞেয়, মৃত্যুও তেমনই অবধারিত; এ দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী যে আয়ুষ্কাল, এবং তাহাই বাহিয়া আমার যে চেতনা—আমার পক্ষে তাহা ছাড়া সত্য আর কিছুই নাই, আদি-অন্তের ভাবনা সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই কালটুকুর মধ্যে যাহা আমার প্রত্যক্ষগোচর তাহাই সৃষ্টি, হয়তো বা সে আমারই সৃষ্টি—আমার

বাহিরে সে কোথাও নাই, আমি না থাকিলে সে-ও থাকিবে না। আমি মানুষ বলিয়াই তাহাকে প্রত্যক্ষ করি, এবং মানুষ বলিয়াই সুখ-দুঃখময় জীবন ভোগ করি। আমার সেই মনুষ্যত্ব যত দুর্ব্বল, ততই আমি সুখ-দুঃখ, আশা-ভয় প্রভৃতির দ্বন্দ্বে অবসন্ন হই; আবার সেই মনুষ্যত্ব যত বলিষ্ঠ, ততই, হয় দুঃখ-নিবৃত্তির—নয় সুখ-সাধনের প্রাণান্ত প্রয়াস পাই। শেষ পর্য্যন্ত জীবন অর্থহীনই থাকিয়া যায়।

কিন্তু আমার মত নাস্তিক সুখদুঃখকে স্বীকার করিয়া, এবং কোনটাকেই অধিকতর মর্য্যাদা না দিয়া, জীবনে কেবল একটি আশ্বাস চায়; অমৃত নয়, সমস্যাপূরণ নয়, তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা নয়—আমি এই দুঃখের গ্লানি ও লাঞ্ছনার মধ্যেই, জীবনে যদি এমন কিছু প্রত্যক্ষ করি, যাহাতে যাইবার সময় দুই বাহু তুলিয়া বলিতে পারি—আমি ধন্য! —জীবন বৃথা হয় নাই, সেই এক বস্তুর সাক্ষাৎলাভে সকল ক্ষতি, সকল পরাজয়, সকল দুর্ভাগ্যের মূল্য পাইয়াছি! আমি তাহা করিয়াছি, তাই আমার কোনও দুঃখ নাই—জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করি না, মৃত্যুর মহাশূন্যে বিলীন হইতেও কাতর নহি। এই বস্তু কি, অতঃপর তাহাই বলিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কাব্য-সাহিত্যে তাহার যে যুগ-যুগান্ত সন্ধান ও চকিত পরিচয়ের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, তাহার বাকিটুকু শেষ করিব।

কারণ, আমারই কথা মানুষ যে কতরূপে ভাবিয়াছে তাহার প্রমাণ এই কবি-গণের মুখেই পাওয়া যায়—যদিও মূল কথাটি বেড়িয়া বেড়িয়া তাঁহাদের কল্পনা বারবার দূরে ঘুরিয়াছে। আমি কবিদের মানব-পূজার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছি—মানব-পূজা জীবনেরই পূজা। কিন্তু এই জীবন-পুষ্পের মধু-সৌরভে একান্ত মুগ্ধ ও লুব্ধ হইলেও, কবির কল্পনা-ভৃঙ্গ মধুপাত্রে লগ্ন থাকিতে পারে নাই, গুঞ্জন করিবার জন্য ঊর্দ্ধে পরিক্রমণ করিয়াছে—বস্তুকে ছাড়িয়া, ভাবের অথবা ভাবনার আতিশয্যে দিশাহারা হইয়াছে। আধুনিক কবি জীবনকে এত সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে বরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না—পূর্ব্বকালের অপেক্ষা একালের কবির জীবন-নিষ্ঠা আরও নিবিড় হইলেও, মন একমুহূর্ত্ত হৃদয়কে বিশ্রাম দেয় না। আমাদের আধুনিক কাব্যেও এই দ্বন্দ্ব ভাল করিয়া জাগিয়াছে। 'বিসর্জ্জনে'র কবি জয়সিংহের জবানিতে যাহা বলিতেছেন, তাহা আনন্দের কথাই বটে; কিন্তু সে আনন্দবাদ যেন নিষ্ফল বিদ্রোহের নিরুপায় সান্ত্বনার মতই শুনাইয়াছে। অথচ এই কথাগুলির মধ্যে জীবনের গূঢ় সত্যের আভাস রহিয়াছে। জীবনের দুঃখই যে সত্য নয়—সর্ব্বদুঃখের মধ্যে দুঃখ-বিস্মৃতির একটা নিরন্তর প্রেরণা বা প্রবৃত্তিই তাহার

প্রমাণ। কবি বলিতেছেন—যাহা কিছু সত্য তাহাই দুঃখময়, সত্যের ভাবনা দূর না হইলে আনন্দ সম্ভব হয় না। মিথ্যাই আনন্দের কারণ—জীবনে যেখানেই সহজ আনন্দ আছে, সেখানেই বঞ্চনা আছে, মিথ্যা আছে, অতএব মিথ্যারই উপাসনা কর। মানুষ যে হাসে, আনন্দ-উৎসব করে, তাহার কারণ, জীবনের সেই স্তরে বা সেই অবস্থায় সত্যের ভাবনা থাকে না; এবং যেহেতু এত দুঃখ এত লাঞ্ছনা এত হিংস্রতার মধ্যেও জীবন-স্রোত কলহাস্যমুখরিত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে, ইহার মূলে কোথায়ও সত্য নাই—

সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান,
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোট কথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী!
সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে,
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি!
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়—
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'ত তার।
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান; হিংসা-ব্যাঘ্রিণীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্ম্মকাজ।
সত্য হ'লে এমন কি হ'ত!

—অর্থাৎ, জীবনে সহজ আনন্দ সম্ভব বটে, কিন্তু তাহার মূলে কোনও সত্য নাই। এই আনন্দ মিথ্যা, দুঃখই সত্য,—এ কথা নাটকীয় চরিত্রমুখে ব্যক্ত হইলেও তাহা লিরিক-কবির আত্মগত উৎকণ্ঠারই নিদর্শন। জীবনের দুঃখ-সুখের কোন অর্থ নাই—এ কথা যেমন সত্য, তেমনই অর্থ নাই বলিয়া, জীবন যে মিথ্যা—এই চিন্তাই

সহজ জীবনধর্ম্ম হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব উপরি-উদ্ধৃত কবি-বাক্যে, আমার কথার ইঙ্গিত আছে মাত্র, পূর্ণ সমর্থন নাই। তথাপি ওই ইঙ্গিতটুকুর জন্যই আমি উহা উদ্ধৃত করিলাম—উহাও একপ্রকার সাক্ষ্য।

কাব্যে জীবনের কথাই মুখ্য হইলেও, কবির কল্পনা বা কাব্যপ্রেরণার যতই প্রসার ঘটিয়াছে, ততই প্রেম ও সৌন্দর্য্য—এই দুইটি ভাব, মানুষের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কবির ধ্যান-ধন হইয়া উঠিয়াছে; কায়া অপেক্ষা ছায়ার মোহ বাড়িয়াছে; আমরা যাহাকে জীবন বলি, তাহাকে একটা মায়াবরণে আবৃত করিয়া, কিংবা তাহাকে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া, একটি অপ্রাকৃত রসলোকের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; কবির কল্পনা-শক্তিই কবিকে একরূপ জীবন্মুক্তির অধিকারী করিয়াছে। প্রথম দিকে, কাব্যে মনুষ্যত্বের একটা আদর্শ, বা একটা অসাধারণ মহত্ত্বের পূজা চলিয়াছিল; পরে মনুষ্যত্বকেও দূরে ফেলিয়া ব্যক্তি-স্বতন্ত্র ভাব-সাধনাই কবিধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুইজন খুব বড় ইংরেজ কবির কথা আমরা জানি—এক জন কীট্‌স্, অপর জন শেলী। কীট্‌সের কবিধর্ম্মের পরিচয় অনাবশ্যক; কিন্তু তাঁহার কবি-জীবনের সাধনা ও সমস্যা-সঙ্কটের কাহিনী নিরতিশয় চমকপ্রদ। কীট্‌সের ধ্যান ছিল—সুন্দরের। রূপ-জগতের রহস্য—ইন্দ্রিয়দ্বারে রসদেবতার যে সাক্ষাৎকার—তাহারই আনন্দ-আবেশে, এই মূরতি-রতিরসবিহ্বল কবি সর্ব্বসংশয় নিরাকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পায়ু সাধক সাধনার এক সোপান হইতে অন্য সোপানে দ্রুত আরোহণ করিবার কালে সহসা জীবনের যে মূর্ত্তি প্রাণ-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানস-অভিমান ধূলিসাৎ হইয়া গেল; অবশেষে জীবনরসরসিক মানুষের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনিই আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"They seek no wonder but the human face"। শেলীও সৌন্দর্য্য-ভাব-সাধনার কবি; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ঠিক রূপ-রস নয়—তাহা রূপাতীত, চিন্ময়। শেলীর প্রেমও তাই অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারভূতা, সৃষ্টির নেপথ্যবাসিনী, 'আত্মমধ্যা' 'স্বয়ংস্থিতা', মর্ত্ত্যমলিনতামুক্ত সেই চিন্ময়ী-সত্তার ধ্যানে তিনি বাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; এই মাটির জীবন, মাটির মানুষ তাঁহার অশেষ করুণা ও সহানুভূতি উদ্রেক করে সত্য, কিন্তু তাহার সেই অবস্থাই তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে; তাহার সেই মৃন্ময়তাই তাঁহার অশান্তি ও অধীরতার কারণ, তিনি তাহা এক মুহূর্ত্ত সহ্য করিতে পারেন না। তাই শেলীর কাব্য

অবাস্তব ভাব-স্বপ্নেই মনোহর; সে-গানের সুর নক্ষত্রলোকে প্রতিধ্বনিত হয় বটে, কিন্তু মানুষের মানবীয় আকুতির পক্ষে তাহা নিষ্ফল হইয়া আছে।

প্রেম ও সৌন্দর্য্য, কবি-কল্পনার এই দুই ভাববস্তু, এ পর্য্যন্ত সাহিত্যে নানা আকারে ও নানা ভঙ্গিতে বিচিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের বাস্তব হৃদয়-বেদনার স্বরূপ ও তাহার মূল্য, কবিই কতক পরিমাণে অনুধাবন করিলেও, কবির কাজ হইয়াছে প্রধানতঃ রসসৃষ্টি—ফুলকে ত্যাগ করিয়া ফুলের শোভা ও সৌরভের স্বপ্নজাল-রচনা। কবি ঠিক মানুষের সমগোত্র নহেন, কবির দৃষ্টিতে যে নেশা আছে তাহা আমাদের আয়ত্ত নহে; কবির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকেও কয়েক ধাপ উপরে উঠিতে হয়। কবির দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টিই বটে, তাই সে-দৃষ্টি সাধারণ মানবের পক্ষে সত্য নহে। তথাপি, আমরা এতকাল এই দৃষ্টির সাহায্যেই জীবনের মহিমা ও মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্যসম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছি। আজিও সেই কবি-প্রতিভাই জীবনকে আরও গভীর ও ঘনিষ্ঠ করিয়া আমাদের হৃদয়গোচর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেই প্রসঙ্গে রুশ-সাহিত্যের কথা তুলিয়াছি। এই সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—'loyalty to humanity'। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোনও নেশা নয়, কোনও রূপরস-পিপাসার ঘোর নয়—মানুষকে একেবারে তাহার স্ব-প্রকৃতিতেই সংরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার যে প্রাণময় দৃষ্টি—ইহাই সে সাহিত্যে কবিপ্রতিভার নূতনতম সাধনা। শেক্‌স্‌পীয়ারের কবিকল্পনার objectivity বা তন্ময়তার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতেও আমরা রসাবেশের সাহায্যে একপ্রকার জীবন্মুক্তির অধিকারী হই—বাস্তবজীবনের বাস্তবতায় আশ্বস্ত হই না; সাধারণ মানুষের পক্ষে সে অবস্থা দুর্লভ না হইলেও ক্ষণিক। আধুনিক কবিকল্পনার মন্ময়তা বা subjectivity যে অপূর্ব্ব ভাবরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও 'loyalty to humanity' নাই, কারণ তাহাও মানুষের বাস্তব হৃদয়-সংবেদনার ক্ষেত্রে অমূলক বলিয়াই মনে হইবে। আধুনিক ভারতীয় কবি-প্রতিভা, একান্ত ভারতীয় ভাবদৃষ্টির সাহায্যে, যে অপূর্ব্ব গীতি-রস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেও জীবন ও জগৎকে অতি উর্দ্ধগ কল্পনায় আত্মসাৎ করিবার পন্থা রহিয়াছে—অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব যেমন আর নাই, তেমনই বাহিরের বাস্তবতাও লুপ্ত হইয়াছে। এ কাব্যে, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও প্রাণের পিপাসা অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া এমন একটি তৃপ্তির ও আশ্বাসের সন্ধান দিয়াছে, এবং আত্মপ্রসাদ বা আত্মমহিমার উল্লাস এমন ভঙ্গিতে উদ্গীত

হইয়াছে—যেমনটি বোধ হয় আর কুত্রাপি হয় নাই। সে কবির কণ্ঠে যখন শুনি—

যাবার দিনে এই কথাটি বলে' যেন যাই,
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতি-সমুদ্রমাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে,
তারি মধু পান করেছি, ধন্য আমি তাই,
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা—সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই,
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥

—তখন মনে হয়, এই তো!—জীবনকে পরম আশীর্ব্বাদরূপে, এক মহাপূজার নির্ম্মাল্যরূপে মাথায় করিয়া লওয়ার—জীবনের অতিরিক্ত আর কিছু আকাঙ্ক্ষা না করার—এমন বাণী যখন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? "এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই"—ইহাই তো জীবনরস-রসিকতার—জীবনের মধ্যেই পূর্ণ চরিতার্থতা-লাভের চরম সাক্ষ্য! কিন্তু ইহাতেও 'loyalty to humanity' নাই; এ বাণী যে দিব্য-চেতনা হইতে উৎসারিত হইয়াছে, তাহার অধিকারী—ভাবসাধক কবি, সাধারণ জীবনযাত্রী মানুষ নহে। 'বিসর্জ্জনে'র কবির পক্ষেই এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে; অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বকে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বরূপে উপলব্ধি করিয়াই, একটি ভাব-সত্যের উপলব্ধির দ্বারা সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হওয়ার যে সাধনা, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জগৎ ও জীবনকে আত্মগত আদর্শে রূপান্তরিত করাই স্বাভাবিক—এই আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ জীবনধর্ম্মের আয়ত্ত নয়। এই প্রত্যক্ষ-বাস্তব মানব-সংসার ও মর্ত্ত্যসঙ্কটময় জীবন-যাত্রাকেই কবি যদি একান্তভাবে গ্রহণ করিতেন, তবে এত সহজে চরিতার্থ হইতে পারিতেন না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-কল্পনা সীমাতেই সন্তুষ্ট নয়—সীমাতীত বিশ্বের, ও কালাতীত চিরন্তনের—এক অতি গভীর আত্মপ্রত্যয়লব্ধ আশ্বাসের বলে,

তিনি জীবন ও মৃত্যুকে মিলাইয়া লইয়াছেন, এবং সর্ব্বভয় ও সর্ব্বসংশয় হইতে মুক্ত হইয়া এমন আনন্দবাদের কবি হইয়াছেন। আমার সন্ধান—জীবনের মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা; সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্বনাশের মধ্যেই প্রাণের আশ্রয়লাভ; জীবনের রূপান্তর নয়, তাহাতে কোনও ভাব-সত্য বা ভাবসৌন্দর্য্য-যোজনা নয়—মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের মধ্যেই, সকল ক্ষতি সকল নিষ্ফলতার মধ্যেই বলিতে পারি কিনা—

অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,

এবং—

এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে' দিন তাই।

—কোনরূপ ভাব-সিদ্ধি নয়, সে হইবে বাস্তব জীবন-চেতনার ফল।)

রুশ-সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম; সে সাহিত্যের প্রধান প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের আরও দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিব। এ সাহিত্যে, জীবনের সঙ্গতি-বোধ—সৌন্দর্য্য-সাধনার ফল নহে; এখানে মানব-ভাগ্যের বাস্তব রহস্যভেদের প্রয়াসই কবিধর্ম্ম, কবিকল্পনা এক নূতন পথের পথিক হইয়াছে। মানুষের মনঃপ্রাণ, তাহার চরিত্র বা কর্ম্মের মধ্য দিয়াই জীবনে যে-রূপ পরিগ্রহ করে—তাহার ব্যক্তি-সত্তার সেই গূঢ়তম রহস্যকে পরম শ্রদ্ধা ও অসীম মমতার সহিত মানিয়া লওয়াই এ সাহিত্যের প্রধান প্রেরণা। এজন্য, beauty নয়—good-এর নূতন অর্থ এই সকল লেখককে বিশেষভাবে ভাবিত করিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই good-এর অর্থ, সৎ—real বা true; যাহা কিছু আছে তাহাই যে সৎ বা সদনুবিদ্ধ, এ চিন্তা আমাদের দেশে নূতন নয়। রুশ-সাহিত্যিক মানুষের জীবন বা মানবীয় সত্তাকেই সত্য-রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কি ও চেহভ-এর এই দৃষ্টিকে ইংরেজ সমালোচক বলেন—"An attitude of complete acceptance, that is to say, an apprehension of human life as something which in all its manifestations exists in its own right"। "In all its manifestations'—অর্থাৎ, সে সৎ কোনও ভাব-সত্য বা বিশ্ব-সত্যের সৎ নয়, সর্ব্ববিধ ব্যক্তি-সত্তায় তাহা বিদ্যমান আছে। বহু ও বিচিত্রকে একের অনুগত করিয়া দেখা যেমন 'complete acceptance' নয়, তেমনই এক 'রস'কেই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে আস্বাদন করাও 'complete acceptance' নয়। এই 'com-

plete acceptance'-ই—'loyalty to humanity'; ডস্‌টয়েভ্‌স্কির সাহিত্য-সাধনায় ইহার পরিচয় আছে। ডস্‌টয়েভ্‌স্কি তাঁহার সমগ্র সাহিত্যিক জীবন ধরিয়া ইহারই সন্ধান করিয়াছিলেন; এবং Ivon Karamazov-এর মত মানুষের পক্ষে—অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুই-ই প্রখর বলিয়া, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব যাহার মধ্যে প্রবল—সেই আধুনিক মানুষের পক্ষে, এই complete acceptance দুরূহ হইলেও, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে জীবনধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুগত বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন—Aloysha-চরিত্র তাহারই দৃষ্টান্ত। "How can man be reconciled to life? Is reconciliation and acceptance possible?" ডস্‌টয়েভ্‌স্কির উত্তর—"হাঁ, কিন্তু তার জন্য চাই—a direct intuition of an essential harmony"। ইহাও একরূপ মিষ্টিক যোগ-পন্থা। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির শেষ গ্রন্থ, The Brothers Karamazov অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে—শেষ কথাটি তিনি বোধ হয় শেষ করিতে পারেন নাই। আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কোথায় গিয়া পৌছিতেন, কে জানে? জীবন-রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার মর্ম্মাঙ্কুর উৎপাটন করিতে কেহ পারে নাই—সেই রহস্যই সকল দুঃসাহসিককে গ্রাস করিয়াছে।

ইংরেজ সমালোচক এই প্রসঙ্গে, শেক্‌স্‌পীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স, এমন কি বায়রনের কাব্য-সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন—সকল কবির মধ্যেই এই প্রশ্নের সমাধান-প্রয়াস ছিল; তাঁহার মতে রুশ-সাহিত্যেই সে সমাধান মিলিয়াছে। আমার মন তাহাতে সায় দেয় নাই—প্রয়াসের চূড়ান্ত হইয়াছে বলিতে আপত্তি নাই, কিন্তু উহাই যদি সমাধান হয়, তবে পাশ্চাত্য মানুষের পক্ষে তাহা নূতন হইতে পারে, আমাদের নিকটে নয়। আমি যে রুশ-সাহিত্যের উল্লেখ ও আলোচনা করিলাম, তাহার কারণ, সে-সাহিত্যে সমস্যার সমাধান যেমনই হোক, তাহাতে যে 'loyalty to humanity' রহিয়াছে তাহা অপূর্ব্ব, আমার চিত্ত তাহাতেই আশ্বস্ত হইয়াছে। ডস্‌টয়েভ্‌স্কির কথাই বলিব। মানুষের ব্যক্তি-সত্তা ও সেই সত্তার নিয়তিকে সৎ বলিয়া বুঝিবার—তাহা যেমন তেমনই হইবার অধিকার যে তাহার আছে, ইহা ধারণা করিবার—যে দিব্যপ্রতিভা, তাহাই ডস্‌টয়েভ্‌স্কির গৌরব। কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কির খ্রীষ্টান-সংস্কার এত বড় বিশ্বাসকে সুস্থ থাকিতে দেয় নাই; মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে এই সৎ-বুদ্ধি দুঃখকে ভেদ করিতে পারে নাই। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এই দুঃখই সবচেয়ে বড় সমস্যা

হইয়া আছে। খ্রীষ্টের পূর্ণ-মানবতাও তাঁহার চক্ষে, এই দুঃখের নিকট পরাস্ত হইয়াছে—সেই অপরিসীম কারুণ্যের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া তিনি হতাশ হইয়াছেন। The Idiot-নামক উপন্যাসে তিনি চরিত্রবিশেষের মুখে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। হল্‌বাইন (Holbein)-অঙ্কিত খ্রীষ্টের একখানি ছবি—কথাগুলি তাহারই সম্বন্ধে। ছবিখানির বিষয়—'ক্রুশ হইতে অবতরণ'। খ্রীষ্টের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ ক্রুশকাষ্ঠ হইতে সদ্য নামাইয়া লওয়া হইয়াছে—সেই রক্তাক্ত বিকৃত মুখমণ্ডলে কি অসহ্য যাতনার চিহ্ন, শূন্য অক্ষি-তারকায় সে কি অপরিসীম অসহায় ভাব! সচরাচর এরূপ চিত্রে, অসীম যাতনার মধ্যেও খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলা হয়; কিন্তু এই চিত্রে মানুষ-খ্রীষ্টের যত কিছু লাঞ্ছনা, দেহমনের অশেষ দুর্গতি, সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। "এই মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট ক্ষতবিক্ষত মুখ দেখিলে স্বতঃই মনে হয়—মৃত্যু এতই ভীষণ ও দুর্দ্দান্ত যে, যে-মহাপুরুষ তাঁহার জীবিতকালে অলৌকিক শক্তিবলে মৃত্যুকে আজ্ঞাবহ করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনিও তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন! ইহার পানে চাহিলে, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কি পৈশাচিক শক্তির সাক্ষাৎ-দর্শন ঘটে! সে যেন একটা অতিকায় দানব—যেমন মূক, তেমনই দুর্ব্বার! অথবা, সে যেন একটা আধুনিক কলকব্জাগঠিত বিরাট্ শক্তি-যন্ত্র; সেই যন্ত্র এমন এক বস্তুকে নিষ্পেষিত করিয়া গ্রাস করিয়াছে—সমগ্র জগৎ এবং তাহার যত কিছু তত্ত্ব অপেক্ষা যাহা মূল্যবান্, সারা সংসার যাহার তুলনায় তুচ্ছ; এমন কি, যাহার পদস্পর্শে পূত হইবার জন্যই যেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল!" উক্ত গ্রন্থের নায়ক Prince Muishkin-এর মধ্যে ডস্টয়েভ্‌স্কি মানব-রূপী খ্রীষ্টের পরম কারুণ্য ও তাঁহার চরম নিষ্ফলতা প্রকটিত করিয়াছেন। মানুষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার যেমন অন্ত নাই, তেমনই ওই এক প্রশ্ন তাঁহাকে বিকল করিয়াছে—"How can man be reconciled to life?" যে যোগ-সমাধির পন্থা—"direct intuition of an essential harmony"-র কথা ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন, ডস্টয়েভ্‌স্কি যে তাহা ভাবিয়াছিলেন, ইহা সত্য। তিনি এক আশ্চর্য্য উপায়ে তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মৃগী-রোগ ছিল, ঐ রোগের আক্রমণকালে, যাতনায় অচৈতন্য হইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে, তিনি দেহ-চেতনার ঊর্দ্ধে আর এক চেতনার আভাস পাইতেন—Prince Muishkin-এর তাহাই হইত। সে অবস্থার যে বর্ণনা তাহার মুখে শুনি,

তাহা পাঠ করিয়া আমারও রোমাঞ্চ হয়; কারণ, আমাদের দেশেও, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এক সাধক মহাপুরুষের জীবনে ঠিক এইরূপ দৈহিক বিকার এবং তাহার ফলে ঠিক ঐ অবস্থার কথা আমরা শুনিয়াছি। আমি ডস্‌টয়েভ্‌স্কির কথাগুলির ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

These moments, short as they are, when I feel such extreme consciousness of myself, and consequently more of life than at other timos, are due only to the disease—to the sudden rupture of normal conditions.

ইহাও ব্যাধির ফল বলিয়া, তাঁহার সন্দেহ হইত যে, এ চেতনা উচ্চস্তরের নয়—নিম্নস্তরের; কিন্তু তখনই আমার মনে হইত, ব্যাধিই হউক আর যাহাই হউক—

—the moment seems to be one of harmony and beauty in the highest degree, unbounded joy and rapture and completest life—these instants were characterised by an intense quickening of the sense of personality.

—এ কথাও নূতন নহে—বহু পুরাতন; এমন যে ঘটে, তাহা বহির্জ্ঞানসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য মানুষের নিকটে অদ্ভুত মনে হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্জ্ঞানলুব্ধ প্রাচ্যের মানুষ ইহাতে চমকিত হইবে না। ব্যাধি বলিয়া যে সংশয়, সে সংশয় শেষে আর ছিল না—The Brothers Karamazov-গ্রন্থে Aloysha-র জীবনে তাহা অতি সহজ হইয়া দেখা দিয়াছে। অতএব এ কথা ঠিক যে, শেষ পর্য্যন্ত বাস্তব মানবজীবন-জিজ্ঞাসু এই মহাপ্রতিভাবান লেখক মিষ্টিক-পন্থার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আমি ইহাই ডস্‌টয়েভ্‌স্কির প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করি না। মিষ্টিক-উপলব্ধি যতই সত্য হউক, তাহা মানুষমাত্রের সহজলভ্য বা সহজসাধ্য নহে। "An intense quickening of the sense of personality"-র কথা জানি—সে অবস্থা যতই উর্দ্ধস্তরের হোক, তাহা অ-স্বাভাবিক, এবং সে অবস্থায় জীবনের সহজ অনুভূতি লোপ পায়। এই যে ব্যক্তি-চেতনার অত্যধিক স্ফূর্ত্তি—ইহাতে ব্যক্তির যেমন মুক্তি ঘটে, তেমনই জীবনীবৃত্তিরও উপশম হয়, জগৎ ছায়া হইয়া যায়। অতএব ইহাও একপ্রকার সৃষ্টিকে অস্বীকার করা। কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি এই যে, তিনি শেষ পর্য্যন্ত যে-তত্ত্বেই

উপনীত হউন, জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—তেমন গভীর, দৃঢ় ও নির্ভীক দৃষ্টি এ পর্য্যন্ত আর কোথাও মেলে নাই। জীবনের ব্যক্তিগত ও বস্তুগত মূল গ্রন্থিটিকে তিনি সজোরে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছেন, দুঃখকে তিনি নস্যাৎ করিবার চেষ্টা করেন নাই, জীবনকে মার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবার জন্য কোনও ভাবগত আদর্শ বা নীতিবাদের বশীভূত হন নাই। আধুনিক রুশ-সাহিত্যের মূলে যে সৎ-এর ভাবনা রহিয়াছে, তাহার কারণ—জীবনকে পূরাপূরি স্বীকার করিবার আকাঙ্ক্ষা। এই সৎ, জীবনের উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছে না, মানুষের মনুষ্যত্বের মূলে অধিষ্ঠান করিতেছে। মানুষ যে দুঃখ পায়, তাহার কারণ সে 'সৎ'—তাহার কোন কর্ম্মে সে তাহার সেই সৎ-প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে না। সেই কর্ম্মের বিচারে কোনও বহির্গত নীতি নাই—তাই তাহা পাপও নহে, পুণ্যও নহে। কর্ম্মের দুঃখ বলিয়াই, কোনও কর্ম্ম কু নহে। দুঃখ স্বতন্ত্র বস্তু, বরং এই দুঃখই তাহার আত্মচৈতন্য বা সৎ-চৈতন্য প্রবুদ্ধ করে। সকল কর্ম্মফল-ভোগের মূলে এই আস্তিক্যনীতি আছে, অতএব—"Human life in all its manifestations exists in its own right."

আবার সেই দুঃখের কথাই আসিয়া পড়িল—মানুষের জীবনে উহার চেয়ে সত্য আর নাই, উহাই যেন একমাত্র কথা! বুদ্ধ হইতে ডস্টয়েভ্‌স্কি—প্রায় আড়াই হাজার বৎসর—ওই দুঃখের কথাই মানব-মনীষার একমাত্র উপজীব্য হইয়া আছে। তার পূর্ব্বে দুঃখ বোধ হয় এত বড় হইয়া উঠে নাই—মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত চিন্তামুক্ত, অতএব সুস্থ ছিল। আজ আমার মত একটা নগণ্য মানুষ এই দুঃখের ভাবনাকেই বড় করিতে চাহে না, আড়াই হাজার বৎসরের সংস্কার আমার মধ্যে বিদ্রোহ করিতেছে! বুদ্ধ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য, জীবনকে নির্ব্বাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন,—মানুষকেই নিঃসত্ত্ব করিতে চাহিয়াছিলেন; রুশ-সাহিত্যিক দুঃখকেই বরণ করিয়া জীবনকে বা আত্মসত্তাকে আরও গভীর করিয়া আস্বাদন করিতে গিয়া, ক্ষুদ্র 'আমি'টা—সাধারণ মানুষের সহজ জীবন-সংস্কারটাই—হারাইতে বসিয়াছিলেন। প্রাচ্য চায় দুঃখের নিবৃত্তি, পাশ্চাত্য চায় দুঃখের নেশা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সন্ধি ঘটাইয়াছে রুশীয় প্রতিভা। দুঃখকে সে যেমন অবস্তু বলিয়া পরিহার করিতে চায় না, তেমনই একটা অন্ধ দুঃখ-মত্ততাও তাহার নাই। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের একটি মন্তব্য বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, ডস্টয়েভ্‌স্কি-প্রমুখ লেখকগণের

অন্তরে রহিয়াছে—"the feeling that there is a secret of life which can be discovered only by a strange sacrifice, and that life must remain unintelligible until it is discovered"। কথাটা সুন্দর বটে, এবং মনে হয়, আমার কথাও যেন কতকটা তাই। কিন্তু এই 'Sacrifice' কথাটার অর্থ কি? আমি যাহা ভাবিয়াছি, এবং ভাল করিয়া ভাবিবার জন্য এই লেখার ধুয়া ধরিয়াছি, উহা কি তাহাই?

"Secret of Life" বলিতে জীবনের কোনও অর্থ বুঝায় না, অর্থাৎ তাহাকে তর্ক-বুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যায় না; সে একটা অপরোক্ষ অনুভূতি, এ কথা মানি। কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিবার—আবিষ্কার করিবার নয়, দেখিবার—দেখাইবার নয়। "Life must remain unintelligible"—এ ভাষাও ঠিক হয় নাই। Intelligible-কথাটাই যে খারাপ! সবচেয়ে বড় কথা ওই—'Sacrifice'। কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটির মধ্যে একরূপ সজ্ঞান দুঃখ-পাওয়ার বা স্বেচ্ছায় দুঃখবরণের ভাব আছে। দুঃখের ভূত কিছুতেই ছাড়ে না! এ সকলেরই মধ্যে একটা তত্ত্বচিন্তা ও দুরূহ সাধন-পন্থার ইঙ্গিত আছে; নতুবা, উপলব্ধি বা অপরোক্ষ অনুভূতির কথাটা ঠিক, এবং 'sacrifice' কথাটাও—অজ্ঞান ও অবশ আত্মবিসর্জ্জন অর্থে মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। এইবার আমার কথা বলি।

যখনই সমষ্টির কথা চিন্তা করি, তখনই ব্যক্তি-আমির কথাটা চাপা পড়িয়া যায়। দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকলই সমষ্টিগত চিন্তার ফল; অথবা এমনও বলা যাইতে পারে, যাহা কিছু সমষ্টিগত তাহাই ভাবনা বা চিন্তা; যাহা কিছু একান্ত ব্যক্তিগত, তাহাই ভাব বা অনুভূতি। সাহিত্য ব্যক্তির সৃষ্টি, তাই তাহা সাহিত্য; এবং তাহাতে যাহা সৃষ্টি হয়, তাহাও ব্যক্তি বা particular। তাই সাহিত্যেই আমরা কতক পরিমাণে জীবনের সত্য উপলব্ধি করি—দর্শনে বা ধর্ম্মতত্ত্বে নয়; কারণ, সেখানে আমরা ভয় পাই, পদে পদে ব্যক্তি-চেতনাকে লঙ্ঘন করার পীড়া অনুভব করি। জীবনের যে দুঃখ তাহা যতক্ষণ ব্যক্তিগত, ততক্ষণ—তাহা যতই তীব্র হউক—যে-প্রাণ তাহাকে অনুভব করে, সেই প্রাণই তাহাকে বহন করিবার শক্তি রাখে, তাহা না হইলে মানুষ বাঁচিত না। সে-দুঃখের আক্রমণ ও উপশম দুই-ই জীবন-ধর্ম্ম। মানুষ যখন জীবনের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভাবকে ভাবনায় প্রসারিত করে, এবং দুঃখকে জগতে ব্যাপ্ত করিয়া দেখে, তখনই দুঃখের অন্ত মেলে না, এবং সেই ভাবনাপ্রসূত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের

জন্ম নিষ্ফল চেষ্টারও অবধি থাকে না। তখনই জীবনের অর্থের কথা উঠে, এবং সে অর্থের নানা অনর্থবাদে মানুষ শেষে মনুষ্যত্বহীন অথবা আত্মঘাতী হয়। যাহারা দুঃখকে কোনও তত্ত্বের সাহায্যে, বা অন্ধভক্তির অচৈতন্যের দ্বারা সহ্য করিতে চায়, তাহারা জীবনকে একরূপ অস্বীকারই করে। কিন্তু যাহারা খাঁটি নাস্তিক—যাহারা জীবনধর্ম্মই পালন করে, কোনও তত্ত্ব বা অর্থসন্ধানের ধার ধারে না—দুঃখকে তাহারা সহজ ভাবেই গ্রহণ করে, এবং জীবনে যদি স্বাস্থ্যের অভাব না ঘটে, তাহা হইলে দুঃখের মধ্যেও সুখের হাসি হাসে। বুদ্ধ আপনার দুঃখে অবসন্ন হন নাই, খ্রীষ্টও নয়। বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট যে-ভাবনায় অস্থির হইয়াছিলেন—জীবন তাঁহাদিগকে সে-ভাবনা ভাবিতে বলে নাই। সে ভাবনার ফল কি হইয়াছে? দুঃখ নিশ্চয়ই দূর হয় নাই, কেবল বাড়িয়াছে মাত্র; মানুষের মাথা আরও খারাপ হইয়াছে, জীবনের প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়াছে, সর্ব্বশেষে মানুষ মৃত্যুর সাধনাই করিতেছে। আজ সহজভাবে জীবনযাপন করাই অসম্ভব, আমরা জীবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; আজ—"the problem of life is to live"—প্রব্লেমই বটে!

এই দুঃখ অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করার যে পাপ—যুগে যুগে তাহাই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে; রুশ-সাহিত্যে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-স্নানের বারি করুণার মন্দাকিনী হইয়া বহিয়াছে; সেই দুঃখই ডস্‌টয়েভ্‌স্কির মত সাহিত্যিকের দিব্যদৃষ্টিকেও বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়াছে। সেই করুণা এত অসীম ও বৃহৎ বলিয়াই সে দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই করুণা যে-দুঃখের ধ্যান করিয়াছে, তাহা একটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ তত্ত্ব মাত্র নয়; লেখকের হৃদয় সর্ব্বত্র ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়রূপে স্পন্দিত হইয়াছে, বহু ও বিচিত্রের মর্য্যাদা কোথায়ও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—যদিও সেই দুঃখের জন্ম হইয়াছে লেখকেরই কবি-চিত্তে, অর্থাৎ আত্মলঙ্ঘনকারী ভাবনা-কল্পনায়। এই করুণার একটি দৃষ্টান্ত দিব—কোন্ গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম মনে নাই, কিন্তু ডস্‌টয়েভ্‌স্কির অসাধারণ কবিশক্তির পরিচয়স্বরূপ সেই কাহিনীর মূল মর্ম্মটি আমার মনের মধ্যে এখনও গভীর হইয়া আছে। অতি দারুণ শীতের রাত্রি। জীবনসংগ্রামে অবসন্ন অথচ দৃঢ়চিত্ত এক যুবা তাহার বাস-গৃহে প্রবেশ করিতেছে—হোটেলের মত এক বাড়ির একখানি ঘরে সে ছিন্নকন্থায় রাত্রিযাপন করে। জীবিকাই তাহার একমাত্র সমস্যা নয়; হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই দুইয়েরই অতিরিক্ত কর্ষণের ফলে, সে জীবনের যে রূপ দেখিয়াছে—তাহার দেশে

তাহার কালে, সমাজের অধস্তলে সে যে দুরপনেয় পঙ্করাশি দেখিয়াছে, তাহাতে জীবনে তাহার আর আস্থা নাই; আজই রাত্রে সে নিজেকে এই জীবন হইতে মুক্তি দিবে স্থির করিয়াছে। উপরতলায় উঠিবার সময়, সিঁড়ির নীচে যেখানে কয়লা প্রভৃতি থাকে, সেইখানে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল—অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিতে পাইল, একটি শীতকাতর বালিকার অতি ক্ষুদ্র দেহ প্রায় অনাবৃত অবস্থায় কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। জীবনে যাহার কোনও আস্থা আর নাই, সেই নাস্তিক তৎক্ষণাৎ সেই বালিকার দেহ তুলিয়া লইয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিল, ও নিজের শয্যায় শোয়াইয়া অতি যত্নে জীর্ণ কম্থায় তাহাকে ঢাকিয়া দিল। তারপর, বাতি জ্বালিয়া এইবার সেই শিশুর দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই সে যেন সহসা ভূত দেখিল! যাহাকে সে বালিকা মনে করিয়াছিল তাহার দেহ তেমনই বটে, কিন্তু এ কাহার মুখ! সেই শীর্ণ কোটরগত চক্ষু ও জ্বরতপ্ত ওষ্ঠে বারাঙ্গনার লালসা ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে! দেহে তাহার কিছুই নাই, তাহার বয়স কত—কে বলিবে? অনাহারে ও ব্যাধির তাড়নায় অতি অল্প বয়স হইতেই সে শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার দেহ শিশুর মতই ক্ষুদ্র। এ হেন জীবন যাপন করিয়া, এত কষ্ট সহ্য করিয়া—এই অবস্থাতেও—তাহার সেই হাব-ভাব, সেই দৃষ্টি! স্বভাবের কি বিকৃতি—অথচ কি অসাড় অজ্ঞান-ভাব! যুবক যে-চক্ষে সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—সে-চক্ষু ডস্‌টয়েভ্‌স্কি ভিন্ন আর কাহারও নাই।

কিন্তু দুঃখের কথা নয়—যাহা বলিতেছিলাম। জীবন দুঃখময়, এমন কি দুঃখই জীবনের মূল সত্য, এ কথা মানুষ বহুদিন ভাবিতে শিখিয়াছে। আমার এই অতি পুরাতন কথার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দুঃখের কথাই বারবার আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ, এ ভাবনা এড়াইয়া চলিবার যো নাই, এবং দুঃখকে মানিয়া না লইলে জীবন-চেতনাকেই অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক—যত প্রকারই হউক, মানুষ এই দুঃখ সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে; জীবন যদি দুঃখেরই হয়, তথাপি মানুষ জীবনেরই আদর করে; যাহারা করে না, তাহারা মহাপ্রাণ বা মহামনা—দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গিয়া তাহারা জীবনকেই অনাদর করিয়াছে। এই কথাই বলিতেছিলাম। দুঃখ যতক্ষণ ব্যক্তিগত, ততক্ষণ মানুষ জীবনেরই স্বাস্থ্য-শক্তির দ্বারা তাহাকে হজম করিয়া লয়; যাহারা অসুস্থ তাহারাই পারে না। কিন্তু

দুঃখ যখন—খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের মত—নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠে, তখন তাহার ঔষধ নাই; হয় নির্ব্বাণ, নয় স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনা করিতে হয়। তাহার কারণ, আপনার দুঃখ আপনি সহ্য করিবার উপায় আছে, কিন্তু বিশ্বমানবের দুঃখ দূর করা বা সহ্য করা ব্যক্তি-মানবের পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টির অভিপ্রায় তাহা নহে। ব্যক্তির দিকে চাহিয়া দেখ, সকল সুস্থ মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি আছে, যাহাতে সে সর্ব্বদুঃখ সহ্য করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। মানুষের জীবনের সেই শক্তি সকল বিষের প্রতিষেধক, তাহার কথাই চিন্তা করিয়া পরম বিস্ময় বোধ করি, এবং সেই বিস্ময়ই জীবনের মহিমাবোধ-রূপে আমাকে সর্ব্বসংশয়মুক্ত করে—জীবনের কোনও অর্থজিজ্ঞাসা আর থাকে না।

বৌদ্ধ-জাতকের একটি কাহিনী মনে পড়িল। জীব-জন্মের দুঃখ নিবারণকল্পে যে মহাত্মা তাঁহার শাক্যসিংহ-জীবনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অস্তিত্বের গূঢ় তত্ত্ব ভেদ করিয়া জন্ম-জরা-মৃত্যুর আবর্ত্তন-চক্র ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বপ্রাণ শূন্য-প্রেমিকের পূর্ব্বজন্মের একটি গল্প আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। মহাপরি-নির্ব্বাণের তখন বিলম্ব নাই, একদিন নিত্যসহচর আনন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার বিবাহ-দিনের একটি ঘটনা আমার বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। আপনি বরাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, আপনার পাণিগ্রহণের আশায় শত শাক্য-কন্যা একে একে আপনার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল; এতগুলি সুন্দরী কুমারীর মধ্যে কেহই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। অবশেষে শাক্য-দণ্ডপাণির কন্যা গোপা যেমনই আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনই আপনি যেন মন্ত্র-চালিতের মত তাঁহার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, এবং পরমুহূর্ত্তে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই পত্নীত্বে বরণ করিলেন। আজিও সে কথা স্মরণ করিয়া আমি আশ্চর্য্যবোধ করি।" তখন বুদ্ধ স্মিতহাস্যে আনন্দকে বলিলেন, "বৎস, তোমার বিস্ময় অমূলক নহে। গোপাকে দেখিবামাত্র আমার শতজন্মের কথা সহসা স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল—সে আমার শতজন্মের সুখদুঃখ-ভাগিনী পত্নী, দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিয়াছিলাম। সে যে আমার কি ছিল, আমার একটি জন্মের কথা শুনিলে বুঝিতে পারিবে। সেবার আমি দক্ষিণদেশে সমুদ্রকূল হইতে কয়েক যোজন দূরে এক পল্লীতে ধীবরকুলে জন্ম লইয়াছিলাম; সমুদ্রতল হইতে মুক্তা-আহরণ করাই ছিল আমার জীবিকা। সংসারে আমি আর আমার পত্নী, আর কেহ ছিল না। তথাপি বড় কষ্টে দিন যাইত। বৎসরের

মধ্যে কয়েকমাস দূর সমুদ্রকূলে জীবিকাসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতাম; অতি সামান্যই জুটিত, তাহাতে সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন ভালমতে নির্ব্বাহ হইত না। একবার ভাগ্য প্রসন্ন হইল, আমি একটি বৃহৎ ও সুলক্ষণ মুক্তা পাইলাম। বড় আহ্লাদ হইল—এতদিনে দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচিল, সে মুক্তার বিনিময়-পণে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিব। মুক্তাটিকে বক্ষে বাঁধিয়া, স্বল্পকালে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দেশে ফিরিলাম—সঙ্গে সঙ্গে সকল আনন্দ নির্ব্বাপিত হইল। দেশে তখন দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, খাদ্যশস্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; যত দিন যাইতেছে ততই মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতেছে, কত লোক যে মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দারুণ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া গৃহে ছুটিলাম—বোধ হয় আমার দুঃখিনী পত্নী বাঁচিয়া নাই, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তখনও মরে নাই বটে, কিন্তু মরিতে বিলম্ব নাই—বহুদিনের অনাহারে শীর্ণ মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তখন আমি আহার্য্য-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম, এবং শত শূন্য বিপণি পার হইয়া প্রথম যেখানে শস্যের সন্ধান পাইলাম, সেইখানেই গলবন্ধনী হইতে মুক্তাটি ছিঁড়িয়া লইয়া, কয়েক মুষ্টি তণ্ডুলের বিনিময়ে তাহা ফেলিয়া দিলাম, এবং গৃহে আসিয়া সেই তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া মুমূর্ষু পত্নীকে বাঁচাইলাম। সে কি আনন্দ! রাজ্যসুখ, চিরদৈন্যের অবসান—সকলই তুচ্ছ মনে হইল; সেই মুক্তার বিনিময়ে যাহা লাভ করিলাম আর কিছুই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হইল না! সেই প্রাণাধিক প্রিয়জনকে ভুলিব কেমন করিয়া? তাই এ জন্মেও দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিয়াছিলাম—গোপাই আমার সেই পূর্ব্বজন্মের পত্নী।”

এ গল্পও সাহিত্য—তত্ত্বকথা নয়। তখনও বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হয় নাই; দুঃখ তখনও ব্যক্তিগত ও মানবসুলভ ছিল বলিয়াই এত সহজে মৃত্যুর বুকেই অমৃত-আস্বাদন ঘটিত। ইহাই সহজ এবং লোকায়ত। মৃত্যু প্রতি-পলে জীবনের উপরে হানা দিতেছে; সর্ব্বনাশের খরপ্রবাহকূলে মানুষ কুটির বাঁধিয়া বাস করে, সে কুটির প্রতি পলকে ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়। দূর হইতে চাহিয়া দেখ—সে কি দৃশ্য! হাহাকার-ধ্বনিতে কান রাখিতে পারিবে না। কিন্তু নিজের প্রাণে নিজের জীবনে মানুষের মত করিয়া দৃষ্টিপাত কর, আপনাকে অনুভব কর, দেখিবে সে এক পরম রহস্য—বিষ এবং বিষের ঔষধ দুই-ই পাশাপাশি মিলিয়া জীবনকে এক অপরূপ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে। এই সহজকে আমরা চিন্তার দ্বারা জটিল করিয়া তুলি,

মানুষের মন মানুষের প্রাণকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। জীবনের গূঢ় রহস্য—Secret of Life—চিন্তার দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না, জীবনানুভূতির মধ্যেই তাহাকে অপরোক্ষ করা যায়। কিন্তু এই সহজ এতই সহজ যে, ভাব ও অভাবের মধ্যে ইহার লুকাচুরি কিছুতেই ধরা যায় না, ভাবনার স্পর্শমাত্রে ইহা লুকাইয়া পড়ে। একমাত্র কবিগণই দিব্যপ্রেরণার মুহূর্ত্তে ইহাকে কচিৎ ধরিয়া ফেলেন, কিন্তু বারবার হারাইয়া যান—সহজ জটিল হইয়া উঠে, যাহা অতি নিকট তাহা অতিদূর উর্দ্ধে অবস্থান করে, যাহা করামলকবৎ তাহাই বিপুল ও বিরাট্ হইয়া চিত্তকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে।

রুশ-সাহিত্যের প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি—উক্তিটি আমার পক্ষে মূল্যবান্। তিনি বলেন, সে-সাহিত্যের সর্ব্বত্র একটা ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—"It is a feeling that there is a secret of life which can be discovered only by a strange sacrifice, and that life must remain unintelligible until it is discovered"। এ কথাও নূতন নহে, ভারতীয় চিন্তায় ও সাধনায়—এমন কি হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে—নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মধ্যেও, একটা sacrifice-তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে; স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'যজ্ঞকথা' নামক গ্রন্থে, ইহাই গভীর পাণ্ডিত্য ও গভীরতর ভাবদৃষ্টির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার মধ্যেও তপস্যার ভাব আছে, জীবনের সহজ তত্ত্ব নাই। Sacrifice বা আত্মাহুতির তত্ত্বই যদি সৃষ্টির, তথা মানব-জীবনের মূল রহস্য হয়, তবে তাহাকে এমনভাবে বুঝিয়া, তারপর তাহার অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই; ঐরূপ একটা নীতির সজ্ঞান অনুষ্ঠান করিতে হইলে, উহার আনন্দ একরূপ কৃচ্ছ্রসাধনের আনন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের ভাবনায় যেমন হউক—জীবনে তাহার প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টির যাহা তত্ত্ব, তাহা জীবনে, অতি সহজে অবশে অজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হইবার কথা। যখনই তাহা মানুষের ভাবনার বস্তু হইল, তখনই তাহা একটা সমস্যা বা অর্থযুক্ত কিছু হইল। সুখ ও দুঃখের সংস্কার মানুষের প্রাণে এমন করিয়া জড়াইয়া থাকে যে, উহার কোনটাকে ভাবের মধ্যে পৃথক্ করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না, প্রয়োজনও হয় না। মানুষ দুঃখকে বরণ করে সুখের জন্য, এবং সেই সুখের কতখানি যে দুঃখ—তাহা তাহার মনেই হয় না। ইহাই রহস্য, ইহাই—Secret of Life।

এই যে রহস্য—ইহাকে কি নাম দিব? নাম দিতে গেলেই তর্ক উঠিবে; এবং যাহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ধারণা করিতে চাই—পুরাতন নামের সংসর্গে তাহার প্রকৃত পরিচয় নানা অর্থে বিরূপ হইয়া উঠিবে। আমরা সচরাচর যাহাকে প্রেম বলি, তাহা এবং তাহার উচ্চতর অভিব্যক্তি ইহার অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহা জীবনের কোনও একটি বিশেষ-প্রবৃত্তি-মূলক নহে, পরন্তু সর্ব্বপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। মানুষ কত ভাবে, কত সম্পর্কে, জীবনের প্রতিক্ষণে ইহার প্রমাণ দিতেছে—কত অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, হিসাববুদ্ধিহীন, এবং সম্যক্ ধারণাহীন প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এই 'sacrifice'-এর অনুষ্ঠান করিতেছে—তাহা লক্ষ্য করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। সে স্ত্রীপুত্রপরিবারের জন্য যাহা করে, তাহাও কি সব সময়ে প্রেমের বশে?—প্রেমিক তো সকলে নয়! যদি বল—স্বার্থের জন্য, তবে স্বীকার করিতে হইবে, স্বার্থের জন্যই সে স্বার্থত্যাগ করে, সেও তো কম রহস্য নয়! আসল কথা, ও রহস্যের নাম নাই—উহাই জীবন-স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগ; উহারই বশে, জন্ম-উৎস হইতে মৃত্যুসাগর পর্য্যন্ত, এই "দেহের রহস্যে-বাঁধা অদ্ভুত জীবন" নিরন্তর তরঙ্গ-তাড়িত হইয়াও অক্ষুণ্ণ ধারায় বহিয়া চলিতেছে।

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! মানুষকে বাদ দিয়া, ব্যক্তিকে ছাড়িয়া, আবার সেই তত্ত্বের নিরাকারে আসিয়া ঠেকিয়াছি! জীবনের রহস্য যাহাই হউক, আমি দেখিয়াছি মানুষকে। জীবনের যে-রহস্যের কথা বলিতেছিলাম, মানুষের প্রাণ-প্রবৃত্তির সেই সার্ব্বজনীন লক্ষণ অতিশয় ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান। আমার নিজের মধ্যেও নিশ্চয়ই তাহা আছে, কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানগোচর নয়, কারণ নিজের মধ্যে নিজেই তাহা দেখিবার নয়—তেমন দেখায় জীবনেরই যেন বারণ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য হই এই ভাবিয়া যে, এত দুঃখ, এত শোকতাপ ও ব্যাধির যাতনা সহ্য করিয়াও আমি তো জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই, কোনরূপ আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার প্রয়োজন তো আমার হয় নাই! যে-জীবনের আলোক-অন্ধকারে আমি ক্ষণিকের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, সেই জীবন—এত ক্ষতি-ক্ষয়, ভয়-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও—আমার নিকটে অশুচি, অসুন্দর বা মিথ্যা হইতে পারিল না। আমি তো জীবনে প্রেমের অমৃত আস্বাদন করি নাই, যশ, অর্থ কিছুই লাভ করি নাই—তবে কিসের নেশায় কোন্ মোহে আমি তাহার স্তুতি-গান করি? জীবনের পরপারেও কোন-কিছুর প্রতি আমার

লোভ নাই, এবং মরিতেও আমার দুঃখ নাই। তবে ইহার কারণ কি? আমি আমার বাহিরে, সুবৃহৎ মানব-সংসারে জীবনের অমৃত-রূপ দেখিয়াছি; হয়তো কবিরাই আমাকে সে রূপ দেখাইয়াছেন, তথাপি, পরের ভিতর দিয়াই আমি তাহাকে আশ্চর্য্যরূপে অপরোক্ষ করিয়াছি। আমি কবির চক্ষে দেখিয়াছি, তাই আমার নিজের জীবন সে পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে নাই; তোমরা যাহারা সেই বস্তু পাইয়াছ—তাহারাই তাহাকে জান না, আমি পাই নাই কিন্তু জানিয়াছি; এবং না-পাইয়াও যে আনন্দ, তাহাই আমার পক্ষে—"a strange sacrifice"। আমি আমার জীবনের সকল ব্যর্থতা, সকল নৈরাশ্য, সকল না-পাওয়া সেই পরম রহস্যের পদতলে অঞ্জলি দিয়া ধন্য হইয়াছি। জীবনের সেই রহস্যকে প্রেম নামে অভিহিত করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছি সত্য—তাহার কারণও বলিয়াছি, তথাপি যখনই তাহাকে ধ্যান করি, তখনই তাহার সুস্পষ্ট সাকার মূর্ত্তি আমার মানসপটে প্রেমরূপেই প্রকাশিত হয়, মনে হয় উহাই "জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী"—উদ্বেল অশ্রুসাগরের মাঝখানে উহাই নিত্যস্ফুট আনন্দ-শতদল। কেহ তাহার মধু, কেহ সৌরভ, কেহ বা তাহার শোভামাত্র প্রাণের মধ্যে সম্বল করিয়া এই পাথারে সন্তরণ করিতেছে। প্রত্যেকের জীবনে—চিৎস্ফূর্ত্তির মাত্রাভেদে—সেই পরম বস্তুর নিত্যপ্রকাশ ঘটিতেছে, তাই মৃত্যু প্রতিপদে প্রতিহত হইতেছে, দুঃখের বিষদন্ত দংশন-মুহূর্ত্তেই ভাঙিয়া যাইতেছে, সর্ব্বনাশও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিতেছে। ঐ বস্তু আছে বলিয়াই জীবন অসৎ নহে—জন্ম-মৃত্যুর অত্যাচার মানুষের পক্ষে কোনরূপ অবমাননা নহে। সারাজীবন ধরিয়া ইহাই দেখিলাম। বহুদিন পূর্ব্বে, যখন জীবনের সহিত পরিচয়মাত্র সুরু হইয়াছে, তখনকার সেই একদিনের একটি কাহিনী এখনও ভুলি নাই—জীবনকে সেই আমার প্রথম প্রণাম। আজ যৌবনের শেষে জীবনকে শেষ নমস্কার জানাইবার দিন আসিতেছে—তাহাকে তেমনই প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে পারিব।

তখন আমি দূর পল্লী-প্রবাসে নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন করিতেছিলাম; বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। মুক্ত-প্রকৃতির বক্ষে বিচরণ করিয়া, দিবাবসানে তাঁবুতে ফিরিয়া—সারাদিনের নব নব অভিজ্ঞতা, কখনও বিষণ্ণ, কখনও বিমুগ্ধচিত্তে চিন্তা করিতাম। জীবনকে এমন ভাবে দেখিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। তখন সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে দেখিয়াছি, অতি সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর চরিত্রে কবি-কল্পিত মানবীয় মহিমা, এবং স্বচ্ছন্দজাত আরণ্য-পুষ্পে

নন্দন-শোভা দেখিয়াছি।* একদিন উন্মুক্ত প্রান্তর-সম্মুখে বসিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে সূর্য্যাস্ত শোভা দেখিতেছিলাম—সে শোভা এতই স্নিগ্ধ ও সুন্দর যে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন এক গ্লাস জল পান করিয়া শ্রান্তিজনিত পিপাসা দূর হইয়া গেল। হঠাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, আমার এই নির্জ্জনবাসে এক পথিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সঙ্গে এক সাত-আট বৎসরের বালক। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বাড়ি এখান হইতে অনেক দূর, সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে তাই এই গ্রামেই কোথাও রাত্রিবাস করিবে। তাহার একপ্রকার শূল-রোগ হইয়াছে, তাই সে আর কাজকর্ম্ম করিতে পারে না; নহিলে তাহারও জোত-জমা ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল। তাহার ছেলে অনেকগুলি। বড়টির বয়স ষোল-সতেরো বৎসর হইবে, চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও, যখন রেশমের কাজ ছিল, তখন সেই ছোট ছেলেটি ওই অঞ্চলের এক কুঠিতে 'কোয়া' কাটিয়া কিছু উপার্জ্জন করিত। এখন সে পথও বন্ধ হইয়াছে। পথিক বলিল, "বাবু, খোদা আমাকে বড় দয়া করিয়াছেন—আমার ছেলেরা কেউ কানা-খোঁড়া নয়। আর এই যে দেখিতেছেন—এ যে কেন আমার ঘরে আসিল জানি না,—আমা ছাড়া ও জগতে আর কাহাকেও চায় না। আমার সঙ্গ ও কিছুতে ছাড়িবে না, দিনে চার-পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিবে, সারা বৎসর আমার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে—ক্লান্তি মানিবে না। উঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে কাঁদে। আবার তখনই উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলে; ভিক্ষার চাউল যতটা পারে আপনি বহিবে, আমাকে সবটা বহিতে দেয় না। ও যে কেন আমার ঘরে আসিল, তাহা খোদাই জানেন!" আমি সেই দুঃখীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম—তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে-ছিলাম। ভিখারী বিদায় হইলে, আবার সেই সূর্য্যাস্ত-শোভার দিকে চাহিলাম —সে শোভা তখন ম্লান হইয়া আসিতেছে, আর এক আকাশের বর্ণ-গরিমায় আমার মনশ্চক্ষু তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম, ইহাই জীবন—কি অপূর্ব্ব, কি সুন্দর!

সেই অতি ক্ষুদ্র কাহিনীতে সেদিন যাহা বুঝিয়াছিলাম, আজ এতকাল পরেও দেখিতেছি, তাহাই চরম ও পরম। কল্পনায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য ঘুরিয়াছি, কাব্যে-ইতিহাসে মানুষের কত গভীর কত বিচিত্র পরিচয় পাইয়াছি, জ্ঞান ও বুদ্ধির কত উপদেশ শুনিয়াছি, কত তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনায় মনের অভিমান চরিতার্থ করিয়াছি,

*গ্রন্থশেষে 'মন-মর্ম্মর দ্রষ্টব্য।

কিছুতেই জীবনে আশ্বাস পাই নাই, বাঁচিয়া থাকার কোন সদর্থ কোথাও মেলে নাই। এখন বুঝিয়াছি—অর্থ সত্যই নাই, আছে কেবল এক অপূর্ব্ব রহস্যের চিত্ত-চমৎকার। তাহাকে যে নাম দাও ক্ষতি নাই; 'প্রেম' বল, বা 'a strange sacrifice' বল, তাহাতে আসে যায় না। আমি কেবল কবির কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই—"অপরূপকে দেখে গেলেম দুইটি নয়ন মেলে।" এ অপরূপকে আমি জীবনের মধ্যেই দেখিয়াছি; জীবনের বাহিরে, ভূমা বা অসীমায়, তাহার শাশ্বত-রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। বরং "এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই" না বলিয়া আমার মন বলে—শেষ আর কোনখানে হইতেই পারে না, শেষ এইখানেই; কারণ, জীবন যে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ—সেইতো সবচেয়ে বড় আশ্বাস।

আমার কথাও এইখানে শেষ করিলাম।

আশ্বিন, ১৩৪৪

রূপ-রহস্য

সকালে নিয়মিত 'চিত্তশুদ্ধি'-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, ভ্রমণকালে নানা রূপ-দর্শন হয়। বর্ষার শেষে এখন শরৎ আসিয়াছে—বাংলাদেশের শরৎ; আকাশে-বাতাসে আগমনীর সুর বাজিতেছে। রাস্তাটিও এমন একটি উদার প্রাকৃতিক দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া চলিয়াছে যে, অনন্তরূপিণী প্রকৃতির যেন একটি জীবন্ত-রূপ সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম; সে যেন একটা আলো—বর্ষাস্নাত সবুজের সমুদ্রে ও কাহার দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছে! তখন মনে পড়িল, 'বন্দে মাতরম্'-গানের সেই 'শস্যশ্যামলাং মাতরম্'-কে; বিশ্বাস হইল—উহা একটা কাব্যকল্পনার metaphor নয়; বঙ্কিম ঐ মূর্ত্তিকে—ধ্যানে নয়—একেবারে সাক্ষাৎ-রূপে দেখিয়াছিলেন।

এই পথে ভ্রমণকালে, মাঝে-মাঝে আরও একটি রূপ-দর্শন হয়, একটি নারী-রূপ; আমি তাহার নাম দিয়াছি—'মায়া'। প্রথম হইতেই সেই অপরিচিতা নামধামহীনাকে একটা রহস্যময়ী শক্তির প্রকাশ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; সেই শক্তিই যেন এক-একদিন এক-এক মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দেন। উষাকালে চিত্ত অতিশয় নির্ম্মল থাকে, সেইজন্যই এইরূপ 'দর্শন'-লাভ হয়; ইহাই ছিল আমার স্থির বিশ্বাস। প্রথম দেখিয়াছিলাম—একটি মায়াময়ী মোহিনী-রূপ, অথচ বড় পবিত্র, বড় নির্ম্মল! তাহার পরে একদিন দেখিলাম—'করুণাময়ী'-রূপ, অথচ একই রূপ! বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইহার পর আবার যখন দেখিলাম—তখন তাহাতে কোন 'প্রকাশ' নাই—অতি সাধারণ দেহটাই দেখিলাম। সে যেন জড়-রূপ—চিন্ময় রূপ নয়। মনে হইল, আমি যে-রূপ দেখি, তাহা দেহাতীত, সে যেন অন্য কোথা হইতে আসে। অথচ সেই কান্তিও দেহছাড়া নয়, তাহার প্রতি অঙ্গে, দেহের প্রত্যেক রেখায় তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে—দেহের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, অর্থাৎ, উহা একটা subjective hallucination, বা মনেরই মোহ নয়। আমার ধ্যান ও জ্ঞান যেমনই হোক, যখন—আর কোন মূর্ত্তি নয়, ঐ একটি নারী-মূর্ত্তিই—তাহাকে সাকার করিয়া তোলে, তখন নিশ্চয়ই সেই মূর্ত্তিরও একটা

বৈশিষ্ট্য আছে। ভাবের সঙ্গে রূপের এই যে সারূপ্য—ইহা একটা বড় তত্ত্ব; যেমন, "বন্দে মাতরম্" শুধুই একটা ভাব নয়—তাহার একটা নিখুঁত বাস্তব প্রতিরূপ—একটা জীবন্ত চিন্ময় রূপ—দেশের মাটিতে শরীরী হইয়া আছে। Subjective দিক্‌টাই যদি বড় হয়, তবে তাহাই একটা মোহ,—বাহিরের বস্তুটা অন্তরের কাম-মূলক কল্পনার একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের যে-দৃষ্টি—যাহা একরূপ মিষ্টিক অবস্থায় ঘটে—তাহাতে subject ও object-এর—অন্তরের ভাব ও বাহিরের রূপের—একটি অপূর্ব্ব সাযুজ্য ঘটে, ভিতরের সেই Idea বা 'চিৎ' বাহিরের একটা রূপকে উপাদান করিয়া সাকার হইয়া উঠে; তাহাই সাধকের ইষ্ট-মূর্ত্তি, ভাব রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সেই মূর্ত্তি যদি পটে বা প্রতিমায় ধরিয়া রাখা যায়, তবে সাধকের পক্ষে এই সুবিধা হয় যে, মূর্ত্তির আর রূপান্তর হয় না—আজ যেমন হইয়াছে; রেখাগুলি তেমনই আছে, কিন্তু সেই দীপ্তি নাই।

হঠাৎ, একদিন আবার দেখিতে পাইলাম—এবার 'কন্যা-কুমারী'-রূপ। প্রতিবার রূপটাই আগে দেখি, পরে তার নাম পাই—অর্থাৎ, তার ভাবটাকে চিনিতে পারি। ইহারও প্রায় একমাস পরে, আবার 'দর্শন' পাইলাম। এবার যে-রূপ দেখিলাম, তেমন 'রূপ' পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। প্রথমটায় আমার দুর্ব্বল মন অভিভূত হইয়া পড়িল। সেই দীর্ঘ-সরল, মহিমময়ী ষোড়শী-মূর্ত্তি। কপালে চন্দনের ছাপ রহিয়াছে—বোধ হয়, স্নানের পর পূজাশেষে বাহির হইয়াছে। এমন চলনভঙ্গি দেখি নাই—যেমন dignified, তেমনই স্বচ্ছন্দ। মানবীর মুখে সেই দেবীর প্রতিভা; আজ একটু দাঁড়াইয়া গেলাম।

যে পথটিতে তাহার সহিত দেখা হয়—সে পথও বড় সুন্দর। দুইদিকে বটের শ্রেণী—মাঝখানে macadam-করা, একেবারে সোজা, একটানা রাস্তা; তাহার একদিকে—দিগন্তবিস্তৃত সবুজধানের শোভা। রাস্তা নির্জ্জন; সঙ্গে ভৈরবীর মত একজন প্রবীণা রমণী; সে যেন তাহার অভিভাবিকা। এই রকমই দেখি, সে কখনও একা চলে না। কাহারও মুখে কথা নাই। পার্ব্বতী-মেয়ে—নেপালের জাত; কিন্তু মুখের ও দেহের গঠন সাধারণ পাহাড়ীর মত নয়—মনে হয়, একটু উচ্চবংশীয়া। মুখখানি প্রায় গোল, কণ্ঠ—কম্বুকণ্ঠই বটে। বয়স আন্দাজ করা শক্ত—আকৃতির তুলনায় অল্প বলিয়াই মনে হয়; তরুণী ষোড়শী; অথচ, সেই অসঙ্কোচ, স্বাধীন ও সংযত দেহভঙ্গিমায়—সে যেন নারী-রূপের একটি পূর্ণ-বিগ্রহ! পার্ব্বতী-মুখ,—তাই চোখের নীচে গণ্ডাস্থি একটু উঁচু; কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য-

হানি না হইয়া বরং এমন একটি কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, না দেখিলে তাহা বিশ্বাস হইবে না। কপালের নীচে চোখ দুটি যেমন সরল-স্নিগ্ধ, তেমনই ভাব-গভীর।

আজ বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল—এ যেন সত্যই একটা 'আবির্ভাব'। ভাবিয়াছিলাম, তিনি আর আমাকে 'দর্শন' দিবেন না, দিবার প্রয়োজন আর নাই, আমার দেখা শেষ হইয়াছে। হঠাৎ আজ আবার এ কোন্ রূপ। তখনই, উহার নাম দিলাম—'ভুবনেশ্বরী'। সুন্দরী নায়িকামূর্ত্তি, মাতৃরূপা, বরাভয়দাত্রী—এই তিন যেন একত্র মিলিয়াছে। একটু দাঁড়াইতেই, আমার দিকে এমন একটি দৃষ্টিপাত করিল যে, আমি তাহাকে সহসা মোহিনীর কটাক্ষ মনে করিয়া চমকিয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম, সে-দৃষ্টি পরম স্নেহের কৌতুক-কটাক্ষ—করুণামিশ্রিত স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিতেছে! যেন বলিতেছে "ভয় কি?" পরক্ষণেই অতিগম্ভীর বরাভয়ের ভাব।

এ-রূপ আমি যদি পটে আঁকিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে উহাকেই ধ্যানে আমার ইষ্টদেবতার আসনে বসাইতাম। কিন্তু আমার দুর্ব্বল মনের স্মৃতিপটে এ রূপ বেশিদিন মুদ্রিত থাকিবে না।

*　　　　*　　　　*

সেদিন শারদীয়া মহাসপ্তমী। সেই পথে সেই মূর্ত্তি আবার দেখা দিল। স্নান করিয়া ফিরিতেছে। দূর হইতে কেবল পশ্চাৎ দিক্ দেখা যাইতেছিল। চুলগুলি পৃষ্ঠে এলানো এবং সেই গমনভঙ্গি—আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। প্রথমে সন্দেহ ছিল—সে-ই কি না; তারপর, আর সন্দেহ রহিল না। এবার সঙ্গে একটি পুরুষ (চাকর বলিয়াই মনে হয়), তাহার কোলে একটি শিশু—বোধ হয়, উহারই সন্তান। এ-মূর্ত্তি 'উমা-হৈমবতী'র। আজ সপ্তমী-পূজা, তাই পার্ব্বতী পিতৃগৃহে চলিয়াছেন; সঙ্গে নন্দীর কোলে গণেশ। দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।

*　　　　*　　　　*

এইবার শেষ-দর্শনের কথা—পূর্ব্বের ঐ দর্শনের প্রায় ৭।৮ দিন পরে।

সেই একই পাড়ার দিকে যাইতেছিলাম—মাঝে একটা নেপালী-বস্তি; তারপর মাঠ—প্রায় শেষ পর্য্যন্ত। তখন যুদ্ধের সময়—ঐ অঞ্চলে সৈন্যদের শিবির-সন্নিবেশ হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলাম, রাস্তার একটা মোড়ে, একজন সুপুরুষ শিখ-যুবক (Military Hospital-এর) দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতেছে,

এবং সেই অবসরে একটা বিশেষ দিকে স্থিরদৃষ্টিতে, অথচ চোরের মত চাহিয়া আছে। দেখিয়া কেমন সন্দেহ হইল, তাহার সেই কাজটা, বিশেষ করিয়া তাহার সেই দৃষ্টি-ভঙ্গিটা লম্পটের মত। রাস্তার মোড়ে রাস্তা হইতে নামিয়া একটু ভিতরের দিকে একটা ছোট বস্তি; আমি আগে কখনো তাহা লক্ষ্য করি নাই। আজ দেখিলাম—কতকগুলি কুঁড়ের মত চালা-ঘর, তাহাতে দরিদ্র নেপালী-পরিবার বাস করে, মেয়ে-ছেলেরাই থাকে। আমি শিখ-যুবকের নিকটে পৌঁছিতেই সে সরিয়া গেল; তার সেই স্থান হইতে তাহারই দৃষ্টিপথ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম—সামনের দুই একখানা ঘরের ফাঁক দিয়া পিছনে একটা বড় গৃহ দেখা যাইতেছে, তাহারই সম্মুখস্থ একটা ঘরের দাওয়ার উপরে নিতান্ত মলিন ও স্বল্পবসনে সেই আমার দেবীমূর্ত্তিটি উবু হইয়া বসিয়া আছে। পাশে একটা বদ্‌নার মত জলপাত্র; চোখ-মুখ ধুইবার অছিলায় সেইখানটিতে বসিয়া সে অবৈধ প্রণয়ের কটাক্ষ-বিনিময় করিতেছিল! হঠাৎ আমাকে তাহার প্রণয়ীর স্থানে আবির্ভূত দেখিয়া একটু চমকিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাহার সেই মুখ-চোখ, সেই বসিবার ভঙ্গি এবং তাহার সেই পিপাসা-কাতর দৃষ্টি দেখিয়াই বুঝিলাম—সে একজন অতিশয় সাধারণী নারী, একেবারে যাহাকে বলে—"Woman in Nature"। তাহার চেহারায়, বেশবাসে ও ভাবভঙ্গিতে কোথাও লেশমাত্র পবিত্রতা বা refinement নাই—একেবারে খড়-মাটি!

প্রথমটা খুবই আঘাত পাইলাম। তবে কি সত্যই এ পর্য্যন্ত সবই 'মায়া'র খেলা! ঐ নারীর মূর্ত্তিতে কিছুই ছিল না? সে একটা সুদীর্ঘ hallucination! সাধারণ বুদ্ধি বা তর্কশাস্ত্র তাহাই বলিবে; কিন্তু আমি তাহা বলিতে পারিব না, কারণ, আমি যে তাহা 'দেখিয়াছি'। যে দেখে নাই সে অবিশ্বাস করিবে, এবং করাই তাহার পক্ষে উচিত। কিন্তু আমি সেই মাটির দেহেই চিন্ময়-আবির্ভাব দেখিয়াছি—এবং তাহা যে আমার মনেরই সৃষ্টি নয়, একথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি। সেই রূপ, সেই দিব্য কান্তি ঐ দেহেরই সম্পদ্‌—এখনও ঐ দেহে তাহা মগ্ন হইয়া আছে; মায়া আমাকে ভুলাইতে বা ঠকাইতে পারিবে না। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাও আজিকার এই দেখার মতই সত্য। যদি না হয়, তবে আমাদের সকল দৃষ্টি—সকল দর্শনই মিথ্যা; অথবা সত্য ও মিথ্যা দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তর্কের প্রমাণ কোন প্রমাণই নয়—সত্যের একমাত্র

প্রমাণ আছে সেই দেখায়। সেই দৃষ্টি আমি প্রতিবারে ক্ষণিকের জন্যও লাভ করিয়াছিলাম। তথাপি, আমি 'মায়া'র একদেশ দেখিয়াছিলাম, আরও যাহা দেখিবার তাহা দেখি নাই, এইবার তাহা দেখিলাম। আজিকার এই দর্শনও তেমনই সত্য, তাই এইরূপ দেখারও প্রয়োজন ছিল। মধ্যে তাহার যে পবিত্র রূপ দেখিয়াছিলাম—সুন্দরী, কল্যাণী ও মহীয়সী মূর্ত্তি, তাহাও যেমন সত্য, এই রূপও তেমনই সত্য। তথাপি আমি আঘাত পাইলাম। তার কারণ, আমি সেই রূপের অন্তরালে 'মায়া'কে—মহাশক্তিকে দেখিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে তো তাহা সাজে না—সে শক্তি আমার কই? তাহাই আমাকে জানাইয়া দিবার জন্য আজ সেই 'মায়া' তাহার নেপথ্যচারিণী, অন্তঃপুরিকা-মূর্ত্তি আমাকে দেখাইল। শক্তির একপ্রান্তে এই Real, এবং অপর প্রান্তে সেই ভুবনেশ্বরী-রূপ—সেই Ideal; এই দুইকে এক করিয়া লইতে পারিলে তবেই পূর্ণ-দর্শন হয়—সর্ব্ব সংশয় দূর হয়। অতএব, এই যে কয়দিন ধরিয়া একটি নাটকের অভিনয় আমি দেখিলাম, তাহার যবনিকা ঠিক স্থানে ঠিক দৃশ্যের উপরেই পড়িল, আমারও একটি কঠিন শিক্ষালাভ হইল। তত্ত্বটা বুঝিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও চিনিলাম। উহার পর, সেই স্থান-কাল-পাত্রের যোগাযোগ যেমন আর ঘটে নাই, তেমনই মনের ভিতরেও সেই পথ আর খুঁজিয়া পাই নাই।

কার্ত্তিক, ১৩৫০

মৃত্যুর দান

"I shall go to him, but he shall not return to me."
—*Old Testament.*

আজ ১লা বৈশাখ, ১৩৫২। সকালে দশটায় টুলু চলে' গেল। এ বয়সে এখনও আর পারি নে, তবু বলতেই হবে—'প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!" যা' বিশ্বের নিয়ম তাই তাঁর ইচ্ছা, তার বিরুদ্ধে নালিশ করব কার কাছে?

* * *

কিন্তু কাঁদবার সময় এ কথা ভেবে তো সান্ত্বনা পাইনে। বুক ফেটে, চোখ ফেটে জল আসে—মাথা টন্ টন্ করে, ভাবি একি দুর্ব্বলতা! কিন্তু সেও সত্যি নয়, কারণ কান্নার প্রয়োজন আছে, এই কান্নার বারিরাশিতেই সৃষ্টি-শতদল ফুটে উঠেছে! গোলোকে-বৃন্দাবনে যে-প্রেমে আনন্দ, সেই প্রেমেই এখানে কান্না; কেন না, এ পূর্ণের নয়, অপূর্ণের—শাশ্বতের নয়, ক্ষণিকের সংসার। কাঁদতে কাঁদতে ভাবি, এ যদি মিথ্যা হয়, তবে সৃষ্টিও যে মিথ্যা হয়ে যায়! কিন্তু সৃষ্টি তো মিথ্যা নয়—মায়া নয়; সেই পরম সত্য যে প্রেম-ব্রহ্ম, তাঁরই লীলা এই সৃষ্টি, সৃষ্টিকে মিথ্যা বললে তাঁকেই অপমান করা হয়।

* * *

যার জন্যে কাঁদছি সে আমাকে ভালবাসত; তার সেই ভালবাসা স্মরণ করছি, ভাবছি—সে কেমন ক'রে নিজেকে এমন নিঃস্ব করে, শেষে একেবারে যেন মুছে' দিয়ে গেল। যত ভাবছি, ততই সেই 'মহা প্রেমে'র আভাস পাচ্ছি; কাঁদাবার মত ব্যথা যদি তাতে না থাকতো, তা'হলে সেই পরম বস্তুর সন্ধান পেতাম না। এই কান্নাই দেহধারী আত্মার একমাত্র শিক্ষার উপায়; যত কাঁদছি ততই তার প্রাণকে আমার প্রাণে অনুভব করছি; এতদিন তো এমন করে' তাকে পাই নি!

কিন্তু শোকের কারণ অন্যরূপ। বেঁচে থাকতে যার ভালবাসা বুঝতে পারি নি, ভাল করে' বুকে জড়িয়ে ধরি নি—মৃত্যুর পর তাকে আরও বেশি করে' জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে; এখন কেবলই আকুল হ'য়ে বলতে ইচ্ছে করে "বাবা আমার!

তুমি আবার এসো, ফিরে এসো! এবার আর তোমাকে এতটুকু কম ভালবাসবো না!" এ জীবনে বারবার এমনই হোল। এই রকমই প্রায় সকলের হয়, নইলে প্রিয়জনের মৃত্যুতে, আর যাই হোক—আত্মগ্লানি হবে কেন? আমি প্রেমহীন, কিন্তু অজ্ঞান নই; প্রতিবারই ঠিক এমনিই হয়েছে, সবাই এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে চলে' যায়; চলে' যাবার পর দরজা খুলি, তখন আর কেউ থাকে না।

* * *

আমাকে স্নেহ-দয়া হয়তো অনেকে করেছে, কিন্তু আর কেউ এমন ভালবাসে নি। ঠিক অতখানি না হ'লে সে ভালবাসা ব্যর্থ হোত—আমার এই কঠিন প্রাণটা এতটুকু জাগাতে পারতো না। এই প্রেম আরেকরূপে দেখা দিয়েছিল—সে খুব উঁচু থেকে, তার পূজো আমি কর্‌তে পারি নি। কিন্তু প্রেম তো এক বই দুই নয়—সত্যমাত্রেই অদ্বৈত; তাই মনে হয়, সেই ভালবাসাই আরেকরূপে, আরেক সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছিল ঐ ছেলের মূর্ত্তি ধ'রে ভালবাসা মূলে এক হ'লেও প্রকাশের দিক্ দিয়ে এক নয়—সবাইকে সব দিক্ দিয়ে স্পর্শ করে না। তাঁরই দূত হয়ে এসেছিল সে, জানিয়ে গেল—ভালবাসা বড় সত্যিকার জিনিষ, হাত পেতে নেবার, বুকে ধরবার। এই শিক্ষা দেবার জন্যেই সে আমার ঘরে ছেলে হয়ে জন্মেছিল—সারা জীবন আমারই জন্যে ব্যাধি-দুঃখ ভোগ করে গেল, কি অসীম সহিষ্ণুতা সেই বালকের! যেন নীলকণ্ঠ বালক-মহাদেব! আজন্ম সে রোগ ভোগ করেছে—সে রোগের নাম, Nephritis বা Bright's Disease। তবু তার জন্যে আমার যাতে কোন কষ্ট বা বিরক্তি না হয়, তাই এমনভাবে সকল দুঃখ, সকল নিরাশা সে সহ্য করেছিল; যেটুকু আদর-স্নেহ পেয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছে—সে কতটুকুই বা! কিন্তু তাতেই সে কৃতার্থ! তারপর শেষের তিনমাস—সেই যাপ্য ব্যাধির উপর এল মৃত্যু-ব্যাধি। সে যাতনা অবর্ণনীয়! তবু একটু স্নেহ, একটু আদর পেলেই সে-অবস্থাতেও তার কি সুখ! বেশি নয়—একটুখানি, তাই যথেষ্ট। পাছে বেশি চাইলে আমি বিরক্ত হই—আমার কোন কষ্ট বা অসুবিধে হয়, সেদিকে তার কি সতর্ক দৃষ্টি! কিন্তু তার সেই স্নেহ-ভিক্ষা—সে তো ভিক্ষা নয়! সে ভালবাসা কিছুই চায় না, কেবল জানাতে চায় 'আমি ভালবাসি'। অমনি ক'রেই সে আমার প্রাণটাকে জাগাতে চেয়েছিল। যেন আমার জন্যেই সারাজীবন তার ঐ তপস্যা।

আজ মনে হচ্ছে, যে-প্রেম জগৎকে ধারণ করে রয়েছে, সমস্ত সৃষ্টি যার দ্বারা 'জীবিত' রয়েছে—সেই "নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌" যিনি, তাঁরই প্রেমের একটুখানি—বড় কষ্ট ক'রে, বড় সহ্য ক'রে—এই অতল অন্ধকারে পথ ক'রে আমাকে স্পর্শ ক'রে গেল। আমি আমার জীবনকে, আমার 'আমি'টাকে কতটুকুই বা বুঝি? কিন্তু সেই জীবনের প্রায় শেষে, যখন দেহে-মনে অশান্তির অবধি নেই—তখন সে-ই আমাকে বড় স্নেহে, বড় কাতর কণ্ঠে ব'লে গেল, "বাবা, তুমি বড় কষ্ট পাচ্ছ—কি কষ্ট তা' তুমিও জানো না, কিন্তু আমি জানি; জানি বলেই আমার এই কষ্টও তুচ্ছ। আমি জানি, তোমার সে খেয়াল নেই, তুমি এ সব বোঝ না; সদাই অন্যমনস্ক থাক, কাউকেই বেশি কাছে আসতে দাও না। কিন্তু তোমারও অভাব কম নয়, তুমি তা' জানো না। তোমার প্রাণ যদি একটু ভরে' তুলতে পারি, তা হলেই আমার এই জীবন ও মৃত্যু সার্থক হবে, কারণ তাতেই তুমি বাঁচবে, জীবনের শেষে শান্তি পাবে।"

* * *

সে বালক, ঠিক এমনিভাবে সে চিন্তা করে নি, যা' করেছে তা'ও সজ্ঞানে করে নি। প্রেমের জ্ঞান আরও বড় জ্ঞান—সেখানে বৃদ্ধও বালক, বালকও বৃদ্ধ। কিন্তু আমার প্রাণ-মন ও জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বুঝেছি, সে ঠিক এই কাজ করতেই এসেছিল। তার সেই চেষ্টা সফল হয়তো হবে না। কিন্তু ঐ প্রেমই জন্ম থেকে জন্মান্তরে আমাকে অনুসরণ করছে, আমাকে তার বাঁচানো চাই-ই। কিন্তু কেন, তার জবাব পাইনে,—আমাকে নিয়ে তার এই প্রাণান্ত প্রয়াস কেন?

* * *

ভালবাসার কি বয়স আছে? না, সম্পর্কভেদ আছে? যে ভালবাসে তার চেয়ে জ্ঞানী কে? তার চেয়ে সহ্যশক্তি কার? তার মত সমর্থ কে? সে বালক হ'য়েও অনায়াসে আমার গুরুস্থানীয় হয়েছিল। সে আমাকে যতখানি বুঝতো, তার এতটুকুও আমি আমাকে বুঝিনে। সেই হয়েছিল আমার বাবা, আমি তার ছেলে। বালক-পুত্রের ছদ্মবেশে কে তুমি আমার ঘরে এসেছিলে? তুমি কি কোন জন্মে আমার পিতা ছিলে? এবার ছেলে হ'য়ে এসেছিলে—পিতা হয়ে যা' পারোনি, পুত্র হ'য়ে তাই পারবার আশা করেছিলে? শুধুই পুত্র নয়—রোগী-পুত্র, আজন্ম-রোগী! রোগ ভোগ করলে ঠিক ততদিন যতদিন আমার অসহ্য না

হয়। যেখানে প্রেমের শক্তি নেই—মন বড় দুর্ব্বল, সেখানে স্নেহও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শেষে বিরক্তি দেখা দেয়; তাই তুমি আর অপেক্ষা করলে না। অনেকদিন হয়ে গেল কিনা, সেই কবে আরম্ভ!—গৃহস্থ কি আর পারে! আমি যে আর পারছি নে, তা' বুঝতে পেরে তুমি আর একটুও বিলম্ব করলে না, তখনই চ'লে গেলে। তুমিই আমার অক্ষমতার লজ্জা ঢেকে দিলে!

* * *

প্রেমহীনের মত দুঃখী নেই; যার প্রেম আছে তাকে জীবনের কোন দুঃখই পরাস্ত করতে পারে না। সেই প্রেমহীনের জন্যেই প্রেম আরও ব্যাকুল হ'য়ে উঠে, ঊর্দ্ধ হ'তে এতদূর নেমে আসে! তার জন্যেই সেই প্রেম চরম দুঃখও হাসিমুখে সহ্য করে। তখন সেই প্রেমহীনের জ্ঞান হয়—সে বুঝতে পারে; তার জন্যেই সেই নিষ্পাপের এমন শাস্তিভোগ দেখে তার পাষাণ প্রাণ গলতে থাকে। যে যত বড় পাপী তার জন্যে প্রেমও তত বড় হ'য়ে দেখা দেয়। এ কি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার!

* * *

আমি প্রেমিক নই, কিন্তু প্রেমের সত্য যা' তাকে জন্মান্তরীণ সংস্কারের বলে সারাজীবনই জেনে এসেছি। সেই জানার ফলে, মানুষের ঘরে প্রেমের লাস্য বা স্নেহের বিলাস আমার কখনো ভাল লাগে নি; আমার ভিতরকার সেই জ্বালা আমাকে অল্পে তৃপ্ত হ'তে দেয় নি। যেখানে সুখ আছে সেখানে প্রেম তারই একটা উপকরণ মাত্র; যুগল-প্রেমের যে সুখ-বিভোরতা তাও আমাকে শ্রদ্ধান্বিত করে নি। ঐ যে প্রেমের পারস্পরিক তৃপ্তি-সুখ, তাতে প্রেমের সেই বিরাট্ মহিমা কই? যা' সুখে নেই—আছে দুঃখে। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ আমার ভাল লাগে না, কারণ, সেখানে দুঃখও দুঃখ নয়—সুখ। আমি প্রেমের সেই মূর্ত্তির পূজা করি—যাতে আছে অনন্ত করুণা বা অনুকম্পা। প্রেমহীনের—অর্থাৎ মহাদুঃখীর দুয়ারে প্রেম ভিখারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, ভিক্ষা-চাওয়ার ছলে সে দিতেই এসেছে; যে সেই ভিখারীকে ফিরিতে দিলে সে-ই বঞ্চিত হ'ল। কিন্তু সেই মহাভিক্ষু তবু নিরাশ হবে না, ফিরে' ফিরে' কতবার দুয়ারে এসে আঘাত করবে!

* * *

যে-প্রেম পূর্ণেরই লীলা,—যে-প্রেম যুগলের পারস্পরিক প্রীতির সুখ-মূর্চ্ছায় বিভোর—সেই প্রেম বড়, না, যে-প্রেম পূর্ণ হ'য়েও নিজেকে শূন্য ক'রে পরের শূন্যতা পূর্ণ করে, মুমূর্ষুকে বাঁচায়, পতিতকে উদ্ধার করে, নিঃস্বকে ধনী করে,

দুঃখীকে সুখী করে—সেই প্রেম বড় ? প্রেমের সে-রূপ দুঃখী ছাড়া আর কেউ দেখে নি, তাই দুঃখী—অর্থাৎ পাপীও এক অর্থে মহা-পুণ্যবান্। পাপের পরিমাণ খুব বেশি না হ'লে প্রেমের সেই সহিষ্ণুতা—যা' শ্রেষ্ঠ প্রেমের—ভগবানের অনন্ত প্রেমেরও একমাত্র লক্ষণ, তা' প্রকাশ পাবে কেমন করে' ? সেই সহিষ্ণুতার কথাই তো স্মরণ ক'রে আমি এত আকুল হচ্ছি ; সেই প্রেমের দিব্যস্পর্শ অনুভব ক'রে প্রেমহীনের এই অশ্রান্ত রোদন।

* * *

সকল প্রেমের সার ঐ সহিষ্ণুতা। মায়ের প্রেম এইজন্যই এত বড়। পত্নীর প্রেমেও এই সহিষ্ণুতাই তাকে গরীয়ান্ করে' তোলে। চখা-চখীর প্রেমে এ জিনিস নেই। ধনীর ঘরে সুস্থ-সুন্দর শিশুকে নিয়ে বাৎসল্যের যে সুখভোগ, তাতেও এই প্রেম নেই—সেও একটা বিলাসমাত্র। আবার ঐ ছেলেকে আমি যেটুকু আদর বা স্নেহ করতে পেরেছি সে কি শুধুই বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি ? সেও আমাকে যে ভালবাসা বেসে গেল, তা' কি নিছক—পিতার নিকট পুত্রের স্নেহলাভের পিপাসা ? না, সেইখানেই সত্যিকার প্রেম আছে যেখানে—যে দেয় সে বড়, যে নেয় সে ছোট। ওসব বাৎসল্য-টাৎসল্য কিছু নয়—সে-প্রেমে সব এক, কোন সম্বন্ধ-ভেদ থাকে না। তাই আমি টুলুকে আমার চেয়ে বড় মনে করছি,—সেই ছিল বাপ, আমি তার অবোধ সন্তান।

* * *

সংসারে যে সুখী আমি কখনো তাকে ঈর্ষ্যা করি নি, কিন্তু শ্রদ্ধাও করতে পারি নি ; তার কারণ কি—ক্রমেই বুঝতে পারছি, আরও বুঝলাম আমার এই ছেলেকে দিয়ে। জগতের উৎসবশালায় বাঁশী কিনে বাজাবার পয়সা যাদের আছে তারা সুখী বটে, যাদের নেই তারা দুঃখী। কিন্তু আমি দেখছি, এই দুঃখীরাই জগৎকে, জীবনকে মহিমান্বিত করে ; তাদের হাতে বাঁশী কিনে দিয়ে সেই ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে যে, তারই পদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয় ; সেই হাসির ছটায় আকাশের চন্দ্রসূর্য্যতারা সমস্বরে আলোর গান গেয়ে ওঠে। দুঃখ যদি না থাকত, তবে প্রেমও থাকত না—প্রেম যদি না থাকে তবে জীবনে রইল কি ? তাই আমার মত অপ্রেমিক—দুঃখীকে দেখে ভয় পেলেও, সুখীকে কখনো সম্মান করি নি—বড় ছোট বলে' মনে হয়েছে। আজ সেই দুঃখের সঙ্গে প্রেমের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখে বুঝতে পারছি—দুঃখই সবচেয়ে মহীয়ান্ কেন ?

যখন ভাবি, সুখীর ঘরে—ধনী ও স্নেহশীল পিতার ঘরে যদি সে জন্মাতো, তবে তার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা—তার আদর-যত্নের কত ব্যবস্থাই হোত! তার মৃত্যুতে সুখী পিতার যে শোক হ'ত—সে একটা সুখ-হারানোর শোক, আমার এই শোকের মত নয়। আমি শুধুই সন্তান হারাই নি, পিতৃহারা হয়েছি। আবার, আমি যা' পেয়েছি তা'ও সে পেতো না,—আমি কি পেয়েছি, তার একটু পরিচয় এই লেখার ভিতরেই আছে; সে পাওয়া যেমন নিদারুণ, তেমনই অমৃত-শীতল!

*　　　*　　　*

আমি দেখছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—সব দুঃখ সহ্য করার সেই দৃষ্টিতে! আমার প্রাণকে জাগাবার জন্যে, আমারই হৃদয়টার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে, সে-যেন তারই প্রাণান্ত সাধনা! সে সম্বন্ধে আমার কোন হুঁসই নেই—আমি যেন জ্ঞাতসারে সে সুধা পান করব না; কিন্তু করতেই হবে, নইলে যে আমার উদ্ধার নেই। তাই সে কি আকুতি তার! তার নীরব দৃষ্টি যেন মিনতি করছে—"রাগ কোরো না; আমি যে তোমাকে ভালবাসি—তোমার দুঃখ-শান্তি চাই। আমি ভিখারী হয়ে ভিক্ষা চেয়ে তোমাকে দাতার সুখে সুখী করতে চাই।" কত ছলে সে আমাকে তার কাছে ডাকতো; মৃতপ্রায় শীর্ণদেহে আর কোন শক্তি ছিল না, কেবল ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ছাড়া। সেই স্বরে সে কত ছল ক'রে 'বাবা' ব'লে ডাকতো, তুচ্ছ আব্দার ক'রে সেই আব্দার-পূরণে যেটুকু স্নেহের পরিচয় পেতো তাতেই যেন সব যাতনা ভুলে থাকতো। শুয়ে শুয়ে সেই রকম কত আব্দার সে মনে মনে রচনা কোরত—চুপি চুপি আমাকে বলবে, আর কাউকে নয়; আমিই যে তাকে সবচেয়ে ভালবাসি—একথা আমি জানি, আর সে জানে। পাশের ঘরে সে, এঘরে আমি; মাঝে দরজা, তবু দেওয়ালের ব্যবধান। আমাকে সে দেখতে পাচ্ছে না, তবু সেই জীয়ন্তে-কবরের মত বিছানাটিতে ("mattress-grave") শুয়ে সে অনুভব কোরত, আমি তার পাশেই ব'সে আছি; দেয়াল ভেদ ক'রে সে আমাকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে দেখতো, আমি কখন কি করছি—প্রত্যেক মুহূর্ত্তের খুঁটিনাটি সে মনে মনে অনুভব কোরত। আমার ভাববার সময় ছিল না যে, সেই নীরব-নিস্তব্ধ ঘরে একটি জাগ্রত হৃদপিণ্ড অনুক্ষণ ধুকধুক্ করছে; তার কোন সুখ নেই, নিদ্রা নেই—আহার নেই বললেই হয়। আমার দেওয়া কতকগুলি তুচ্ছ খেল্‌না শিয়রে সাজিয়ে রেখে, অতিশীর্ণ দুর্ব্বল আঙ্গুলে তাই একটু

নাড়াচাড়া করছে—আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বাইরের নীল আকাশ, পথের লোক-জন—মানুষের জীবন-লীলার নিত্য-দৃশ্য, এসব কিছুই সে দেখতে পায় না। দিনে ঘরটায় আলো জ্বালতে হয় না, রাত্রে জ্বালতে হয়—সেই আলোটুকুই তার একমাত্র সম্বল। দিনে তবু ঘরে মানুষ চলাফেরা করে; কথাবার্ত্তা, গলার আওয়াজ শোনা যায়, রাত্রে তাও থাকে না। সে একা জেগে থাকে—নিতান্ত নিরুপায় না হ'লে কাউকে বিরক্ত করতে ভয় পায়। এ অভ্যাস, এ সহ্যশক্তি অল্পবয়স থেকেই তার হয়েছিল; ব্যাধির কালকূট কণ্ঠে ধারণ ক'রে সে যেন বালক-মহাদেবের মত একটা নেশায় বিভোর হয়ে থাকতো; আগে বলেছি—সে জন্মাবধি Nephritis-রোগে জীবনেই মৃত্যু-ভোগ করেছিল। কেবল শেষের ঐ তিন মাস সে সেই রোগের উপরেও আর একটা রোগের আক্রমণে চরম যন্ত্রণা ভোগ করেছে—এবং এমন ভাবে তা' সহ্য করেছে! তার বয়স হয়েছিল বারো, কিন্তু রোগের জন্যে তার বয়োবৃদ্ধি হয় নি—ঢের কম বয়সের মত দেখাতো। ঐ অবস্থায় সে আমার ঘরের পাশের ঘরটিতে শুয়ে থাকতো, আগে একটু উঠতে ব'সতে পারতো, পরে—প্রায় একমাসের বেশি—তা'ও পারতো না।

তখন তার একমাত্র সুখ ও শান্তি হয়েছিল—আমাকে কাছে পাওয়া। কিন্তু আমি তার বিছানার পাশে বসে থাকতে পারতাম না—কারণ একটা নয়; যেটুকুও থাকা উচিত ও সাধ্য, তাও সব সময়ে পারি নি। আমি তার কাছে বসে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, দু'চারটে স্নেহের কথা, অসুখ ভালো হয়ে যাবার কথা বলি, এ কামনা স্বাভাবিক, কিন্তু সে কখনো জোর করে তা চায় নি। সে জানতো, তার বাবা সে প্রকৃতির মানুষ নয়—দিবারাত্রি বই আর লেখা নিয়েই থাকে। তাই ঐ যে আমি পাশের ঘরেই আছি—তাই যথেষ্ট! সে দেওয়ালের ওপার থেকেই আমাকে দেখছে, আমাকে শুনছে, আমাকে স্পর্শ করছে। তবু মাঝে মাঝে ডাকতো—"বাবা!"

আমি বলতাম, "কেন, বাবা?"

"একবার শুনে যাও।"

"ঐখান থেকেই বল না, বাবা, আমি যে কেবল-কেবল উঠতে পারিনে—কাজ করছি।"

"তুমি একবার এখানে এসো।"

—একটু বিরক্ত হতাম। উঠে গিয়ে তার অর্থহীন আবদার-অভিযোগ শুনতাম ; যা' ব'লতো তাতেই সায় দিতাম, তার আবদার রক্ষা করতাম ; কিন্তু সে আবদার কিই বা !

* * *

এখন মৃত্যুর পর, দেহের সেই আবরণও ঘুচে গেছে—একেবারে স্বচ্ছ কাচের মত তার প্রাণটাকে দেখতে পাচ্ছি। এখন বুঝি, ঐ রকম ক'রে মাঝে মাঝে নানা ছল ক'রে না ডাকলে, সে যে আমাকে কাছে পেতো না—সে কেবল আমাকে এক-একবার দেখবার ছল। তবু ঐ পাশের ঘরে আছি—কোথাও বড় একটা যাই নে, এইটুকুই ছিল তার তৃপ্তি ও সান্ত্বনা ; তাই বাড়ী থেকে কোথাও যাওয়া—যেমন কলকাতায় যাওয়া সে পছন্দ করত না, যাওয়ার কথা শুনলেই ব্যাকুল হয়ে উঠত। ঐটুকুই ছিল আমার উপরে তার একমাত্র 'অত্যাচার'। তাতেও সে কখনো জোর করে নি ; বাবা যদি সেটুকুতেও বিরক্ত হয় বা কষ্ট পায়, তবে তা'ও সে চাইবে না, সেই তার কবর-শয্যায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকবে। সে প্রায় একাই থাকতো, ছোট ভাইরা কলরব কোরত, কখনো বা খেলাও কোরত, কিন্তু সব সময়ে তো নয়। শেষ পর্য্যন্ত সে একাই, তার সেই বিছানা, আর সেই অসাড় দেহ। ইদানীং তার মাথাটাও আর কাউকে বালিসে তুলে দিতে হোত।

* * *

দুঃখই অমৃত-পিপাসা, প্রেম সেই পিপাসার বারি। যেখানে বারি ও পিপাসা এক হ'য়ে আছে, সেখানে সৃষ্টি নেই—জীবনধারা নেই ; সেখানে সেই 'পূর্ণের' নামই 'শূন্য'। জীবমাত্রেই দুঃখ পায়, দুঃখের অনুভূতিই জীবনের অনুভূতি। সে অনুভূতিরও স্তর আছে—কারণ জীবের ও জীব-চৈতন্যের স্তর আছে ; আধিভৌতিক দুঃখই সর্ব্বনিম্ন স্তরের, সেই দুঃখের আগুনে যে বাষ্প-সৃষ্টি হয়—সৃষ্টির যন্ত্রটা চলছে তারই শক্তিতে। একথাও যেমন মানতে হবে, তেমনই, যারা এই দুঃখকে, এই জীবন-ধারাকে একটা মিথ্যা শাস্তি ব'লে, জ্ঞানের দ্বারা একে দমন করতে চায়, তারা শেষ পর্য্যন্ত আত্মাকেই হত্যা করে, বা অস্বীকার করে। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ যে কি বস্তু তা' আমরা আমাদের এই মানবীয় সংস্কারে কিছুতেই বুঝতে পারবো না, বরং মনে হয়, তা বুঝবার প্রয়োজনও নেই ; জীবনকে বরণ ক'রে, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই যেখানে পৌছনো যাবে—সেইখানেই আমরা পরম-বস্তুর দর্শন লাভ কোরব।

আমি প্রেমের কথা ভাবছি—নিজে যতই বঞ্চিত হই না কেন, জীবনে তাকেই সবচেয়ে বড় বলে' মেনেছি। জ্ঞান বা ভক্তির কথা আমি জানি—কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তা' মানি নে—সে বড় উঁচু কথা। জ্ঞানের দুঃখ নেই; ভক্তির কোন ভয় নেই—সে প্রায় মুক্তির কাছাকাছি, জীবন-সংগ্রামের প্রায় শেষ অবস্থা; ভক্তি হয়তো প্রেমেরই শেষ পরিণাম,—তার কথা ঢের পরে। আমার জ্ঞানও নেই, ভক্তিও নেই—একমাত্র ভরসা প্রেম। যে দুঃখকে জ্ঞানী বলেন ইন্দ্রিয়জ মোহ, এবং জ্ঞানের অসি দিয়ে তাকে ছিন্ন করেন, ভক্ত যাকে ভগবানের নামে একরকম সরিয়ে রাখেন,—আমি সেই দুঃখেরই পূজা করি। সেই দুঃখই কত রঙে, কত রূপে আমার ভাব-চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে—আবিষ্ট করেছে। আমি তাকে বুকে স্থান না দিয়ে মাথার ভিতরে বদ্ধ করে' রেখেছি, সেইখান থেকেই এতদিন পরে সে বুকে হানা দিয়েছে। তাকে এড়াবার যো নেই—তার পরমমূর্ত্তিকে বরণ ক'রে, তার হাতেই ভিক্ষা নিতে হবে—মহাবুভুক্ষার সেই অমৃত-তণ্ডুল!

* * *

ছেলেটা কি এসেছিল তাই করতে? তবে এত কষ্ট পাচ্ছি কেন? তার সেই মুখ, তার সেই স্নেহ-করুণ সর্ব্বংসহা কাতর দৃষ্টি কেবলই মনে হচ্ছে—সে এত কষ্ট সহ্য করে' এতদিন আমার ঘরে কাটিয়ে গেল, সে কি আমার জন্যে? কিন্তু ভুলতে পারছি নে—সে ছেলে, আমি বাপ। তাই আমার এ কান্না থামছে না। আমি পিতা—সে ছিল রোগযন্ত্রণাকাতর বালক-পুত্র। পুত্ররূপে তার যে প্রার্থনা, সে প্রার্থনাও সে আমার কাছে করত; তার ভিতরটা—আমি যেমন দেখছি—তা'ও যেমন সত্য, তার বাইরের সেই পুত্র-রূপটাও তেমনি সত্য। বালক তার দুঃখ দূর ক'রে দেবার জন্যে আমার মুখপানে চাইতো; কতবার তাকে বলেছি, শিগ্‌গির 'ভাল হয়ে যাবে'; সে তাই বিশ্বাস কোরত, সব ছেলেই তা করে। আমার কথা শুনে দিনের পর দিন সে ঐ দারুণ হ'তে দারুণতর কষ্ট সহ্য করেছে,—আবদার অভিযোগ করে নি, কিছুর জন্যে অবুঝপনা করে নি; তার কারণ, তার অসুখ নিশ্চয় ভাল হ'বে,—বাবা কখনো মিথ্যা বলতে পারে? দেহে মৃত্যুর আসন্ন আক্রমণ স্পষ্ট অনুভব ক'রেও সে আমার কথা অবিশ্বাস করতে পারে নি। নিরাহারী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত সে সেই তিন মাস কাটিয়ে গেছে; কিন্তু সে আর সহ্য করতে পারছে না—তা'ও দেখতাম; কেবল আমাকে জানতে দিত না—আমি কষ্ট পাবো বলে'। যখন সব শেষ হ'য়ে গেল, তখন আমার সেই

স্তোকবাক্য মিথ্যা হোল। বাপ হ'য়েও আমি মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছি, তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি। শিশু কি তা' বুঝবে? সে কি জানে—রোগীকে ঐ রকম মিথ্যা আশ্বাস দেওয়াই কর্ত্তব্য? শিশুর কাছে বাবার চেয়ে বড় কেউ নেই যে! বাবা সব জানে—বাবার ভুল হতে পারে না। সে তো জানতো না—তার বাবাও তার মতই অজ্ঞান, তার মতই অসহায়। যে-ভগবান্ তাকে পিতার পদে বসিয়েছেন তিনি কোন অতিরিক্ত শক্তি তাকে দেন নি। দারুণ ব্যাধি হিংস্র জন্তুর মত ছেলেকে আক্রমণ ক'রে চোখের সামনে তার দেহটা খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে চর্ব্বণ করছে, বাপ চেয়ে আছে! ছেলে কাতরকণ্ঠে ডাকছে—বাপ কিছুই করতে পারছে না,—মানুষের পক্ষে এত বড় শাস্তি আর আছে!

* * *

দয়াতে দুই পক্ষ নেই—এক পক্ষই আছে, তাতে কেবল নেওয়াই আছে, দিতে হয় না। তাই অতি-নিঃস্ব মহাপাপীও বেঁচে যায়—প্রতিদানে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন যে সেখানে নেই! কিন্তু প্রেমে দুই পক্ষই আছে—শুধু নেওয়া নয়, দিতেও হবে; না দিতে পারলে যাতনার অন্ত নেই। প্রভু, তোমার প্রেম আমার পক্ষে ব্যর্থ হয়েছে—আমি দয়া চাই।

* * *

আজ অশৌচান্ত। কিন্তু আমার সারাজীবনই অশৌচ—সে অশৌচান্ত এ জীবনে তো হ'ল না!

* * *

এক মাসের উপর হয়ে গেছে,—টুলুর সঙ্গে জীবনের যোগ আর নেই, সে অভ্যাস ক্রমে যেন খ'সে যাচ্ছে। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা বুকফাটা হাহা-শ্বাস বেরিয়ে আসে; মনে হয়, কোন উপায় নেই, কোন প্রতিকার নেই, যা' গেছে তা' আর ফিরবে না—সে আর আসবে না, এবার আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? কোন্ শূন্যের কোন্ পথে? যদি আর একটিবারও তাকে ফিরিয়ে পেতাম, তাকে বুকে ক'রে তার মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারতাম—তারপর, আমিও জানতাম, সে-ও জানতো—এই শেষ, আর দেখা হবে না, সে আমাকে একটা শেষ চুমু দিতে বোলত! তা' হ'লে তবু আলোয়-আলোয় এই মহাযাত্রা সম্পন্ন হোত। সেই শেষদিনে আমি এমন একটা রূঢ় ব্যবহার করেছিলাম যা' আমার মত মানুষের পক্ষেও অসম্ভব। আমার

অতি দুর্ব্বল মস্তিষ্ক হঠাৎ জ্ঞান হারিয়েছিল; হঠাৎ আমি তার প্রাণে বড় আঘাত দিয়েছিলাম। তারই অবস্থা ভেবে আমার বুক যাতে বিদীর্ণ হবার কথা—তাতেও আমি তাকেই ভৎ'সনা করেছিলাম। জানতাম না, সেই দিনই তার শেষ দিন। একটু পরেই সে আমাকে তার কাছে ডাকলে, একটা আবদার করলে, সেও একটা ছল—কারণ, অত বড় রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে যে, সে তার বাবার অসন্তোষ এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারতো না। আবার, বাবা নির্ব্বোধ ব'লে সে তো নির্ব্বোধ হতে পারে না। তাই আমাকে ডাকলে; বোধ হয়, যাবার আগে আর একটু আদর আদায় করবার জন্তে! এর পর ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই তার শেষ-মুহূর্ত্ত এসে গেল; কাছে ছিলাম না—যখন ছুটে তার পাশে গেলাম, তখন তার দাঁত চেপে গিয়েছে, চক্ষু স্থির হ'য়ে গেছে। তখনও মনে হচ্ছিল—সে বোধ হয় একটা stroke, শিগ্‌গির সেটা কেটে যাবে, কারণ, নাড়ী তখনো আছে—তার পরেও তিন কোয়ার্টার পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু বাবা আমার আর কাউকে চেয়ে দেখলেন না, আর তাঁর চৈতন্য হোল না!

*　　　*　　　*

সকালে সে একটু ভালোই ছিল—এত শীঘ্র এমন হয়ে গেল কেন? হঠাৎ যেন সুতোটা ছিঁড়ে গেল—বড় বেশি টান পড়েছিল হয়তো। সেই কথাই ভাবি, আর বলতে ইচ্ছে করে—

"When thou dost ask me blessing, I'll kneel down
And ask of thee forgiveness."

*　　　*　　　*

কিন্তু দোষ কারো নয়—কোন human tragedy-তেই Villain-এর দরকার হয় না। বাইরে কেউ নেই, কিছু নেই! সবই মানুষের ভিতরে। শাস্তি পেতে হবে—অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, তবে এই ট্র্যাজেডিতে যবনিকা-পাত হবে। এ পঞ্চাঙ্ক-ট্র্যাজেডি নয়—জন্ম থেকে জন্মান্তরে এর এক-এক অঙ্ক উদঘাটিত হচ্ছে—ট্র্যাজেডিও কমেডি হয়ে উঠছে। পাপ করতেই হবে; সেই পাপ যখন চরমমাত্রায় পৌছুবে, তখনই সৌভাগ্যের সূচনা—যবনিকা-পাতের আর দেরি নেই। চরম শাস্তিলাভ হ'লেই মুক্তি!

*　　　*　　　*

জ্ঞানী বলছেন, এ সব মহাভ্রান্তি। পাপ আবার কোথায়? শাস্তিই বা কি? মায়ার যাঁতাকলে ধরা পড়লেও 'আমি' তার চেয়ে বড়; তাকে স্বীকার করলেই সে

পেয়ে বসে, চেপে ধরে। স্বীকার কোরো না, লাথি মেরে ভেঙে ফ্যালো! যতক্ষণ মমতা আছে, রাগ-বিরাগ আছে—ঐ স্নেহ-প্রেমের কাঙালপনা আছে, ততক্ষণই তুমি তার অধীন। কত ছল, কত চাতুরী তার! এই দেখ না, কেমন কৌশল ক'রে, কেমন যোগাযোগ ঘটিয়ে—কি মারটাই তোমাকে সে মারলে! তুমি হতভম্ব হয়ে গেছ; তার সেই ছলনা—সেই আশ্চর্য্য, সূক্ষ্ম-কঠিন, অব্যর্থ নিয়তির ফাঁদ তোমার জন্যে সে পেতে বসেছিল, তুমি দেহ-মন-প্রাণ নামক তারই তৈরী দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানের আকর্ষণে সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছ। পাপই বা কি, শাস্তিই বা কি? সব ঝুট হ্যায়! সব ঝুট হ্যায়! নিরাশী ও নির্ম্মম হও—বৈরাগ্যই অভয়।

* * *

কিন্তু জ্ঞান আমার কোন কাজেই লাগলো না। মাথার জ্ঞান আর বুকের জ্ঞান তো এক নয়! সেদিন সদ্য-সন্তানবিয়োগের পর এক জায়গায় গিয়ে বসে-ছিলাম। দুই-এক জন সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সঙ্কোচ বোধ করলেন। তাঁদের ধারণা—আমার মত জ্ঞানীর শোক হওয়া অসম্ভব; আমি খুব শক্ত আছি—সমবেদনা প্রকাশ করলে আমাকে যেন অপমান করাই হয়। একজন স্পষ্টই বললেন, "আমরা হ'লে কি আর উঠে দাঁড়াতে পারতাম!" সে যেন আমার একটা গৌরব! আর একজন আমার মাহাত্ম্য স্বীকার ক'রেও, তবু আমি যে তাঁদের মতই মানুষ—একেবারে দেবতা হ'য়ে যাই নি, সেই আশ্বাসের প্রমাণস্বরূপ, ব'লে উঠ্‌লেন—"হুঁ-হুঁ, তবু ওঁর চোখেও আজ জল দেখেছি! এ কি সোজা আঘাত!" শুনে প্রথমটা মনে হ'ল, এরা যেন আমায় চাবুক মারছে; আমার ধৈর্য্য দেখে এরা স্থির করেছে, আমার হৃদয় পাষাণ—সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে আমায় শোনাচ্ছে। পরে মনে হ'ল, দোষ ওদের নয়, ওরা ঠিকই ধরেছে, আমি পাষাণই বটে!

* * *

ওরা তো জানে না, আমার আত্মার ব্যাধি কি। আমার বুকটা যে বড় ফাঁপা—একেবারেই মজবুত নয়; ওতে যদি আঘাতের সমান প্রতিঘাত হোত, তবে সেটা যে চূর্ণ হ'য়ে যেতো! বুকের সেইখানটাকে যত কিছু বাইরের আবর্জ্জনা দিয়ে সর্ব্বদা ভরাট ক'রে রাখি, তাতেই প্রতিঘাত নিবারণ হয়। আঘাত একটুও কম হয় না, কিন্তু তাকে যতদূর সম্ভব বুকের আড়াল ক'রে রাখি; জ্ঞানে নয়—একটা মূর্চ্ছার মত বিস্মৃতি দিয়ে তাকে ঢেকে রেখে দি'। এমনি করেই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করি, নইলে মরে' যেতাম।

* * *

এই যে আঘাত-কাতরতা—এই আমার শাস্তি। এ দুঃখ প্রেমের দুঃখ নয়, তা' যদি হোত, তবে প্রতিঘাতের ভয়ে হৃদয় এমন সঙ্কুচিত হোত না; আঘাতে ও প্রতিঘাতে জীবন ছন্দোময় হয়ে উঠতো, কোনখানে তাল কাটতো না। আমার তা' নয়; এ আমার নিছক শাস্তি, তাই কান্নারও শেষ নেই।

* * *

ছেলেটা শুয়ে আছে—তার সেই মুখ এখনও দেখতে পাচ্ছি, আর দু'দিন পরে ঝাপ্‌সা হয়ে যাবে। তার সেই স্নেহ—সে কি ঠিক ঐ মূর্ত্তিতে ছাড়া আর কোন-রূপে প্রকাশ পেতো না! যার স্পর্শ পাই প্রাণে, মনে—এমন কি, আরও গভীর চেতনার তলদেশে, তারও কি কায়া চাই, মূর্ত্তি চাই? যতই তার সেই স্নেহ মনে পড়ছে, ততই তার সেই মুখখানি—সেই রোগজীর্ণ করুণ মুখখানি চোখের উপর ভেসে উঠছে। সবই দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাই সবই মৃত্যুর অধীন। যে-প্রেম অমৃত, তারও কি মূর্ত্তি আছে? সে যে নিরাকার! আর ঐ যা' দেখছি? ওকে যে বাহুবন্ধনে পেতে হয়! ওকে তো আর তেমন করে পাবো না! শূন্য বায়ুমণ্ডলে সৌরভের মত তার স্মৃতিমাত্র ভাসছে—তার সেই রূপ কোথায়? তার সেই দেহ কোথায়? সেই বিছানার সেই মুখ? তাকে ধরে' রাখি কেমন ক'রে? তবু আর ক'দিনই বা, ধরে' রাখবার আর দরকার হবে না। আবার মাঝে মাঝে এই বৈরাগ্যের বাণীও সময় বুঝে' মনের কানে মন্ত্র দেয়—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥

—প্রাণ তাতে আরও হাহা করে' ওঠে!

* * *

জানি, লোক-লোকান্তরে, অনন্তকালেও তাকে আর পাবো না,—তার সেই মুখ, সেই হাসি আর দেখতে পাবো না, সে চির-বিদায় নিয়েছে। কিংবা, এ দুঃখই বা আর ক'দিন? সে-ও যেমন আর সে নেই, তেমনি আমিও তো আর এই আমি থাকবো না। আবার যদি কোথাও দেখা হয়, সে-ও আমায় চিনবে না, আমিও তাকে চিনতে পারবো না। এমনি করেই সব বন্ধন কেটে যায়, তাই এ দুঃখেরও অবসান হবে। কিন্তু আজ আমাকে সান্ত্বনা দেয় কে? আমার এ সত্যকে আমি অস্বীকার করি কি ক'রে?

জ্ঞানীর কাছে কথাটা ছেলেমানুষের মতই হোল; কিন্তু দুঃখের ব্যাখ্যা যতরকমই থাকুক—সৃষ্টির কারণ, এবং তার এই জটিল নিয়ম-যন্ত্রের ব্যাখ্যা কেউই করতে পারেন নি। গীতায় ভগবান্ স্পষ্টই বলেছেন, এ সৃষ্টির জন্যে তিনি দায়ী নন—"স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে"। শঙ্কর উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন—পারেন নি, মায়াকে মায়াই বলতে হয়েছে, সেটা অবস্তু হয়েও বিচারের বহির্ভূত হয় নি, তাকে একেবারে এড়াতে পারা যায় নি। তন্ত্র একে বলেছেন, 'মিথ্যাভূতা সনাতনী'। ঐ মিথ্যাও সনাতন! যদি সনাতনই হয়, তবে মিথ্যা কি অর্থে? তন্ত্র তার উত্তরে বলবেন—সনাতন ঐ স্নেহ-প্রেম, মিথ্যা ঐ রূপগুলো, ঐ মূর্ত্তিগুলো; একটা হ'ল স্বরূপ-নামরূপ, আর একটা হল—বিকৃত-নামরূপ। তা'হলে আমার ঐ ছেলেটা মিথ্যা—তার সেই স্নেহটাই সত্য; ঐ মূর্ত্তিটাই বিকৃত-নামরূপ, উহাই মিথ্যা,—স্নেহের সেই স্বরূপ-অংশটুকুই সত্য! হায়, হায়! এই তবে একমাত্র সান্ত্বনা? আমার সেই ছেলেটা তবে কেউ নয়, কিছু নয়! সে তবে সত্যই আর কোথাও নেই—আর কোথাও তাকে পাবো না! সকলেরই সেই এক কথা। কিন্তু প্রাণ তা মানে না—মানবে না, অন্ততঃ যতদিন এই জগৎ আছে, জীবন আছে, দেহ আছে। যদি তা' মানি, তবে যে-প্রেম সাকার হ'য়ে—রূপ ধারণ ক'রেই, শূন্যকে ক্রমাগত পূর্ণ ক'রে তুলছে—সেই প্রেমকে অস্বীকার করতে হয়, নাস্তিক হতে হয়। আমার এই কান্নাই ভালো, সান্ত্বনা চাইনে।

বিচিত্র কথা

১। জীবন-জিজ্ঞাসা

কলকাতায় আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তারপর থেকেই স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রকট হয়ে উঠেছে; আশ্চর্য্যের বিষয়, এখনও টিকে আছি এবং সম্ভবতঃ এ বছরটা টিকে গেলাম। এই স্বাস্থ্যভঙ্গ থেকেই একটা মানসিক বিপ্লব চলেছে। নিজের জীবন, চরিত্র, ভাগ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ও সজ্ঞান হয়ে পড়েছি; যত-কিছু পাপ, তাপ, ব্যথা, দুর্গতি, দুর্ব্বলতা ও দুর্ভাগ্যকে সৃষ্টিবিধানের অখণ্ডনীয় নিয়মের অনুযায়ী ব'লে—নিজের ব্যক্তিগত চেতনাকে বিশ্বচেতনার অন্তর্ভূত বলে—উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি; বলা বাহুল্য, আমার জীবনের যত-কিছু ব্যর্থতাকে একটা Law-এর fulfilment হিসাবেই মেনে নিতে চাই। কোনখানে কোন বিরোধ আছে, কোন অন্যায় আছে—এটা আমি স্বীকার করব না। এই জগৎটার আদিকারণ চিরদিনই দুর্জ্ঞেয় থাকবে, কিন্তু এর আদিকে না জানলেও 'মধ্য'কে জানা যায়। বীজ কোথা থেকে এল, কেমন ক'রে অঙ্কুরিত হ'ল, এ কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে, এই বিকাশ-ধারায় সেই বীজরূপী অনাদি ও অনন্ত সত্তা আপনি আপনাকে realise ক'রে চলেছে; এ realisation-এর শেষ নেই, বিরামও নেই। আমার জীবনের যেটুকু উপলব্ধি, তাও সেই বিশ্বচেতনায় একটা contribution। যা 'মহতো-মহীয়ান্' তা 'অণোরণীয়ান্'ও বটে; আমার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে—আমার এই আমি-রূপেই সেই সত্তা একটা অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অতিশয় বিশেষ উপলব্ধি-ধনে ধনী হচ্ছে—আমার মত আর কেউ আগে ছিল না, পরে হবে না; কাজেই আমাকেও প্রয়োজন ছিল। 'অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্র' যিনি—আমিও তাঁরই একটি বিশেষ প্রত্যঙ্গ, আমাকে না হ'লে তাঁর চিৎস্ফূর্ত্তির একটা 'অণোরণীয়ান্' অংশ শূন্য থেকে যেত। এইটুকুই আমার জীবনের প্রয়োজন; এর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ আমার নয়, আর একজনের; এবং এর কিছুই ব্যর্থ নয়, তাই ক্ষোভের কারণ কোথাও নেই।

মানুষের 'আমি' বা অহং-সংস্কারই যে প্রধান অবিদ্যা, এ কথা যে কত সত্য তা বুঝানো যায় না, নিজে না বুঝলে উপায় নেই। দেখুন জগতের একটা প্রধান সংস্কার মানুষের মঙ্গল-বুদ্ধি; এ থেকে যত পাপ-পুণ্য, ভাব-অভাব, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভের ধারণা আমাদের কিছুতেই ছাড়ে না—আধ্যাত্মিক চিন্তায় পর্য্যন্ত! কিন্তু এ সকলেরই মূলে আছে ব্যষ্টি ও সমষ্টির 'অহং'। আমি পরলোক বা পরকালে বিশ্বাস করি না (সংস্কার হয়তো আছে), তাই আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় ব'সে আমাকে এই জীবনের একটা অর্থ আবিষ্কার করতে হচ্ছে, নইলে অব্যাহতি নেই। প্রাণ হাহাকার করলেও আমাকে তা নিবারণ করতে হবে। যতটুকু স্থূলভাবে দেখছি, তাতেই নিরস্ত হ'লে নাস্তিক হতে হয়। আমি নাস্তিক নই। আমি এই সৃষ্টিকে বিশ্বাস করি; এবং এ ছাড়া আর কিছুকে সত্য ব'লে মানি না। কাজেই এই সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টির অর্থ আমায় খুঁজতে হবে। একটা বড় কথা আমি হিন্দুর বংশে জন্মে' উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি, সে হচ্ছে এই যে—অহং-সংস্কার বা ব্যক্তিচেতনাই অবিদ্যা। এইটিকে সম্বল ক'রে আমি যে একটি অর্থের আভাস পাচ্ছি, তা যুক্তি বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; কারণ, আমি যে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করেছি, তাতে Matter ও Spirit-এ ভেদ নেই—Matter-ই Spirit; এই সৃষ্টির নিয়তিই ভগবানের নিয়তি—আমার নিয়তিও ভগবানের নিয়তি। এই সৃষ্টির বিকাশ-ধারায় সেই 'আপনি' আপনার পরিচয়-সাধন করছে; সে পরিচয়ের শেষ নেই—প্রতি মুহূর্ত্তের পরিচয় সে পরিচয়কে পুষ্ট করছে; এমনি ক'রেই চলেছে, অব্যক্ত ব্যক্তই হচ্ছে—কখনও 'ব্যক্তি' হয়ে উঠবে না। আমার মধ্যে দিয়েও সেই 'আপনার-সঙ্গে-আপনার-পরিচয়ে'র একটা কণা পুষ্ট হচ্ছে। যতক্ষণ মানুষের অহং-সংস্কার থাকবে, ততক্ষণ এ চিন্তা রুচিকর হবে না, এতে শ্রদ্ধা হবে না। মানুষের সর্ব্বচিন্তা,—সূক্ষ্মতম চিন্তাও materialistic; এবং এই materialism-এর মূলে আছে ব্যক্তি-চেতনা বা অহং-সংস্কার—এরই নাম অবিদ্যা। কিন্তু এই জগৎকে অখণ্ড আত্মার একমাত্র রূপ ব'লে বুঝতে পারলে, materialism-ই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায়। যারা পরলোকবাদী, তারাই ঘোরতর materialist,—অতি দুর্ব্বল, কৃপার পাত্র তারা। তারা ইহলোককে, অর্থাৎ এই অহং-অনুবিদ্ধ জীব-সংস্কারকে পরলোকে প্রসারিত করেছে। Spiritualism-এর পাণ্ডারা মোহিনী প্রকৃতির অশেষ ছলনায় মুগ্ধ হয়ে, এই জগতেরই একটা ছায়া রচনা ক'রে, অবিদ্যাজনিত

দুঃখকে মুলতুবি করে রাখবার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে দুঃখ হয়, যখন কোন বুদ্ধিমান হিন্দুও পাশ্চাত্যের এই শিশু-সুলভ 'কানা-মাছি'-খেলায় আকৃষ্ট হয়—যা Science-এর বহির্ভূত, তাকেও Science-এর অধিকারে নিয়ে এসে প্রকৃতির অবগুণ্ঠন মোচনের উল্লাস করে। যাদুকরী যে এখানেও তাদের ঠকাচ্ছে, এ খেয়াল কারও হয় না; যত-কিছু experiment বা প্রমাণের মূল্য যে কত সামান্য, তা এই আত্ম-প্রবঞ্চিত হতভাগ্যেরা বোঝে না। সেগুলোও phenomena, তার অন্যতর ব্যাখ্যা সম্ভব, এবং একদিন তা পাওয়াও যাবে। প্রকৃতির একটা ঘাগ্‌রি science খুলেছে, আরও খুলবে, কিন্তু তাকে কখনও উলঙ্গ করতে পারবে না। ওসব প্রমাণকে অতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি আমাদের দেশে এখনও আছে—আমি প্রকৃত যোগীদের কথা বলছি, তা অসম্ভব নয়। আসলে ও-সবই জড়বাদী materialist-দের সুখস্বপ্ন—'wish is father to the thought'। তারা ব্যক্তি-হিসাবে বাঁচতে চায়, বড়-সত্যের সম্মুখীন হবার শক্তি, সাহস বা অভিলাষ তাদের নেই। আমি এদের বিশ্বাস ও মতামত কিছু-কিছু জানি—কতকগুলো দেহাত্মবাদী অহংমুগ্ধ শিশু বা পশু। তারা Spirit-দের প্রমুখাৎ পরলোকের ও সেখানকার জীবনের যে বিবরণ শোনায়, তা এতই তুচ্ছ এবং এতই বালকোচিত যে, অতিশয় প্রাকৃত-সংস্কারসম্পন্ন অশিক্ষিত অতিবিশ্বাসীর দল ছাড়া আর কেউ এক মুহূর্তের জন্যও ওসব কথায় কান দেবে না। এই Spiritism-সম্বন্ধে এত কথা বললাম তার কারণ, মানুষের মোহবুদ্ধির এ একটা নতুন হুজুগ উঠেছে; সেই পুরোনো morality-র সংস্কারকেই এই সব অখৃষ্টানবেশী খ্রীষ্টানেরা আরও দৃঢ় ক'রে তুলে' মানুষকে আবার অবিদ্যার নরকে নিক্ষেপ করবার চেষ্টায় আছে। এই মত যদি মূলবিস্তার করে, তবে আবার একটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম—পুরো materialistic সংস্কার—প্রবল হয়ে উঠবে; ইহলোকের অধিকার নিয়েই এত বাদ-বিসম্বাদ, এবার পরলোকের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকের সৃষ্টি হবে; হিন্দু-ভূত ও খ্রীষ্টান-ভূত আবার এক Communal মারামারি বাধিয়ে দেবে। কি দুর্ব্বল অসহায় আমরা! বাঁচতে হবেই, একটা পরলোক বা স্বর্গ চাইই চাই; এবার সেটাকে science-এর দাবি দিয়ে শোধন ক'রে নিতে হবে!

কিন্তু আমি যে-তত্ত্বের আভাস ও আশ্বাসের কথা বলেছি, তাতে আমি এই সৃষ্টি-বিধানের মধ্যে একটা Justice-এর সান্ত্বনামাত্র পাই, এখনও আনন্দ

পাইনি। অহং-বুদ্ধি যে কিছুতেই যায় না! এই জীবনটার প্রতি আমার ব্যক্তিগত মমতা কতদিক থেকে আমাকে উদভ্রান্ত করে! অতীতকে বড় মধুর মনে হয়, প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে; সেই বাল্য, সেই যৌবন—তার যত ব্যথা, যত দুঃখ—এমন কি যত misery ও squalor—আজ পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয়, জীবনে যা পেয়েছি বা পাইনি তার জন্যে শোক নয়—আরও পাওয়া এবং আরও না-পাওয়া এরই মধ্যে শেষ হ'ল, এ-ই দুঃখ। মৃত্যুর জন্য সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত আছি ব'লে যেমন মনকে প্রবোধ দিই, তেমনই, হঠাৎ কোন সময়ে এই ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিনাশ চিন্তা ক'রে নিদ্রাহীন নিশীথে বড় ভয় পাই। বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাব বা মহাসত্তায় লীন হব, তাতে সুখ-দুঃখ কোন চেতনাই থাকবে না—এইটাই আশা হয় বটে, তবু 'the dread of something after death' যেন অন্তরের মধ্যে কোথায় বাসা বেঁধে রয়েছে। মহাকবির কি অব্যর্থ ভাবনা মানুষের প্রাণের অন্তস্তলের সর্ব্বশেষ চিন্তাকে কেমন যথার্থ করে প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে সেই আর এক কথা—

Men must endure
Their going hence even as their coming hither,
Ripeness is all.

—এত বড় সত্য কথা এমন ক'রে আর কে বলতে পেরেছে? Shakespeare-এর সমগ্র কাব্যকল্পনার মধ্যে যে নাটকীয় objectivity-র পরম রস উৎসারিত হয়েছে, তার মূলে আছে ওই attitude। জীবনকে তিনি এমনি করে দেখতে পেরেছিলেন ব'লেই তাঁর কাব্যে subjectivity-র সঙ্কীর্ণতা এত কম। এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি আপনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে, এই জড়ের মধ্যেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করেছিলেন। এ আশ্বাস ধর্ম্মের আশ্বাস নয়—কোনও idealism-এর মোহও নয়; জগতের প্রাণ-প্রেরণার সঙ্গে নিজ প্রাণ-প্রেরণা যুক্ত ক'রে একটি পরমা নির্বৃতি-লাভ। তাঁর কল্পনায় কোন ব্যক্তি-সংস্কার ছিল না ব'লে তিনি কোন God-ব্যক্তির ধার ধারতেন না।

'Ripeness is all' কথাটার অর্থ আমার মতে এই যে, বিশ্ববিকাশধারার সঙ্গে নিজ প্রাণের বিকাশকে এক ক'রে দেখার যে রসময় উপলব্ধি,—যার ফলে সকল সুখদুঃখ একটি অপূর্ব্ব চেতনায় লয় হয়ে যায়—মনুষ্য-জীবনের সেই সার্থকতাই পরম ও চরম বস্তু। আমি এই তত্ত্বের যে উপলব্ধি করেছি তার মধ্যে

Law ও Justice-বোধটাই প্রধান ও প্রবল; সে উপলব্ধি রসময় নয়, তার মধ্যে একটা intellectual satisfaction আছে—প্রেমের প্রেরণা নেই। তাই আমার 'আমি'টা এত ক'রেও শান্ত হচ্ছে না—আমার সমস্ত সত্তা রসবিগলিত হয়ে সমাধি বা harmony-তে ডুবে যেতে পারছে না। এই প্রেম যে-কোনও পাত্রকে আশ্রয় ক'রে মানুষকে সেই অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। এ বিষয়ে সকল যুগের সকল ভাবুক, সকল কবি যে কথা বলতে চেয়েছেন—তা সে যেমন ক'রেই বলুন, তার implication যেখানে যত সঙ্কীর্ণই হোক—তাতে তাঁরা একটি সহজ সত্যকেই প্রকাশ করেছেন, হয়তো তারা গভীরতর মর্ম্ম উপলব্ধি না ক'রেও। Tennyson-এর সেই দুটি লাইন স্মরণ করুন—

Love took up the harp of life and smote
on all the chords with might,
Smote the chord of Self, that trembling
passed in music of sight.

তাই যেমন ক'রে যে দিক্ দিয়েই জীবনের রহস্য সমাধান করবার চেষ্টা করি না কেন—ঘুরে ফিরে ওই একটা তত্ত্বকেই আশ্রয় করতে হয়, ওটাকে এড়িয়ে যাবার যো নেই। প্রেমই'মৃত্যুঞ্জয়—মহাকবি Shakespeare থেকে মহাতাপস বুদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সাধনার সিদ্ধিমন্ত্র ওই এক। বুদ্ধ এই প্রেমের বলেই জীব-সংস্কার ত্যাগ ক'রে 'ব্রহ্মবিহার' করেছিলেন; Shakespeare এই প্রেরণার বশেই কাব্য-সাধনার পথে প্রাণের সেই পরমা-নির্বৃতি লাভ করেছিলেন। অতএব, 'the problem of life is to live',—মৃত্যু, পরলোক বা পরকাল নয়; আমার মত আপনি তো বৈতরণীর কূলে দাঁড়িয়ে তার প্রথম তরঙ্গের আঘাত প্রতীক্ষা করছেন না, অথবা আপনি তো আমার মত অপ্রেমিক নন। আপনার এসব চিন্তায় কি প্রয়োজন? আপনার যা কিছু চিন্তা, সে আত্ম-সমস্যামূলক নয়, পর-সমস্যামূলক; তাই তর্কে পরকে হারিয়ে দিতে পারলেই আপনি খুশি—নিজের কাছে জবাবদিহির কোন প্রয়োজন নেই। প্রার্থনা করি, আমার মত এই রকম প্রাণের দায়ে আপনাকে যেন কখনও কোনও চিন্তার আশ্রয় নিতে না হয়। * *

পৌষ, ১৩৩৮

২। প্রশ্ন ও তাহার উত্তর

তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে, তার সোজাসুজি উত্তর আমি দিই নি, আমার স্বভাব তা নয়। কারণ যে কথাটা বড়, তার পিঠ-পিঠ উত্তর দেওয়া চলে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। প্রশ্নটাকে মাঝে রেখে খুব দূর থেকে প্রদক্ষিণ করতে করতে শেষে খুব নিকটে এসে তাকে ধরি, তখন সেটা একেবারে গ'লে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন বড় প্রশ্নেরই মীমাংসা কখনো হতে পারে না; যতক্ষণ প্রশ্ন আছে ততক্ষণ উত্তরও আছে, দুটিরই অস্তিত্ব সমান—একটা আর একটাকে 'নাস্তি' করতে পারে না। কাজেই উত্তর নয়—প্রশ্নটাকেই দূর করতে হবে, 'নস্যৎ' করতে হবে—তাকেই বলে আসল মীমাংসা। আমার কিন্তু সে ক্ষমতা নেই, কাজেই আমি তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমার একটা অনুভূতিমাত্র তোমাকে জানাব। তাই ব'লে মনে কোরো না যে, অনুভূতির কথাটা প্রশ্নের উত্তরহিসাবে অবান্তর। তর্ক ক'রে কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা কখনো হয়েছে? যাকে যুক্তিতর্কের মীমাংসা বলে, সে তো মস্তিষ্কের ব্যাপার। কিন্তু সত্যকে যে প্রাণে পেতে হয়! আমি তর্কের সাহায্যে তোমাকে না হয় একটা মত গ্রহণ করালাম, অর্থাৎ তুমি বুঝলে যে ওটাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। তা'তে কি হল? যতক্ষণ তোমার প্রাণ তাতে সায় না দিলে—সেটা তোমার আত্মগত না হ'ল, ততক্ষণ সেটা কি তোমার পক্ষে সত্য? প্রাণের মধ্যে যতক্ষণ না 'পাওয়া' যায় ততক্ষণ কেবল 'জানলেই' কোন একটা বস্তু কারও পক্ষে সত্য হয়ে ওঠে না। এটা মনে রেখো যে, 'জানার মত জানা' আর 'পাওয়া'র মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমরা 'জানার মত জানতে' পারি নে ব'লেই তর্ক ও কথার সর্দার হয়ে রইলাম—পেলাম না, হলাম না। যতক্ষণ প্রশ্ন করি ততক্ষণ নিশ্চয়ই পাই নি,—পেলে কিন্তু একেবারে চুপ ক'রে যাই, মনের মধ্যেও প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বন্দ্ব আর থাকে না।

কথা উঠতে পারে—তবে কি এত সব জানা, এত সব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ—তা মিথ্যা?—তা কি জ্ঞান নয়, তা কি 'জানা' নয়? না; কারণ, যা জানলে সব জ্ঞানই সত্য হয়ে উঠে, সেইটিকে কেউ জানছি না—তার আশে-পাশের ছোট টুকরো খণ্ড বিজ্ঞানগুলিই আমাদের মানসগোচর হচ্ছে। চাবিটা খুব ছোট, তাই এত হাতড়াচ্ছি তবু হাতে ঠেকছে না। সেই অতি ছোট, অতি সরল, অতি সহজ জিনিসটিকে পেলেই, এই প্রকাণ্ড অন্ধকার স'রে যায়—এ মহা

অরণ্য ধেনু-চরানো বেণু-বাজানো গোষ্ঠভূমিতে পরিণত হয়। সেই সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান একদিন ভাগ্যবানের প্রাণের মধ্যে অতি সহজেই এসে পৌঁছয়; বহু তপস্যা, বহু অনুশীলনেও যাকে পাওয়া যায় না, সে ধরা দেয় শক্তিমানের প্রাণের আনন্দ-বিশ্বাসে, সে খেলা করে স্বপন-দেখা শিশুর মুখের হাসিতে, সে বেজে ওঠে বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুরে। সকল জ্ঞানের পরাভব যেখানে, সকল আর্টের অপ্রয়োজন যেখানে—সেই অযত্নসিদ্ধ অনাড়ম্বর সহজ সুন্দর পরিপূর্ণতার মধ্যে তিনি প্রকট হন—যিনি জ্ঞানীর সত্য যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান্। সারা রাত্রি বর্ষণ হয়েছে, গভীর নিদ্রায় তা জানতে পারি নি; সকালে উঠে দেখি—দীঘির জল কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে! যে ছিল রিক্ত সে হঠাৎ এমন পূর্ণ হয়ে উঠল কি করে—আশ্চর্য্য হয়ে যাই। তেমনই কোন এক নিবিড় বর্ষা-নিশীথের অতর্কিত অভিসারে কখন যে হৃদয়-হ্রদ সব-হারানো অথচ সব-ফিরে-পাওয়ার আনন্দে কূল ছাপিয়ে উঠবে, তার কিছুই ঠিক নেই। কেবল এইটুকু জানি—সে 'পাওয়া' মনে হবে না, প্রাণে হবে।

আমার বিশ্বাস—এই পাওয়ার পথ প্রেমের পথ। কিন্তু প্রেমও কামনারই পরিণাম। কামনা মানে—ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উন্মেষ; ইন্দ্রিয়গুলো যত অনুশীলিত হয় কামনা তত সূক্ষ্ম হতে থাকে, ততই সুন্দর-বোধ জাগে। এ-ও এক রকমের জ্ঞান—এ-ও মনোবৃত্তিরই উৎকর্ষ, হৃদয়বৃত্তির নয়। সুন্দর-বোধ জাগ্রত হ'লে একেকে বহুরূপে উপভোগ করবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়—একের মধ্যে মন বাঁধা পড়ে না। যাকে আমরা সাধারণতঃ প্রেম বলি—সেই সাংসারিক হৃদয়বন্ধন মনোবৃত্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করে না; বরং সেই মনোবৃত্তি যখন সংকীর্ণ এবং হৃদয়বৃত্তি প্রবল হয় তখনই এইরূপ হৃদয়বন্ধন সম্ভব হয়। সে অবস্থায় একের মধ্যে বিশ্ব ক্ষুদ্র হয়ে থাকে; এজন্য বড় কবি বা বড় শিল্পীর মত, সাধারণ মানুষের কামনা বিশ্বগ্রাসী হয় না; অবাধ কল্পনা ও সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা নেই ব'লে তাদের সেই সাংসারিক প্রেম, বা একের প্রতি আসক্তি, ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু মন যখন সারা বিশ্ব ঘুরে বহুর মধ্যে একেকেই ভাল করে চিনে নেয়—তখন ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট্, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু, ব্যক্তির মধ্যে পরম পুরুষকে দেখে চরিতার্থ হয়। তখন কিন্তু আসক্তি আর থাকে না। তাই, সে প্রেম যেমন ধীর তেমনই গভীর। ঘরের মানুষ পথে বার হয়, তারপর সর্ব্বতীর্থ ঘুরে যখন সে আবার ঘরে ফিরে আসে, তখন ঘরটাও তীর্থ হয়ে গেছে; তাই আলাদা ক'রে গৃহ-বিগ্রহের পুজো আর হয় না।

মনোবৃত্তির উৎকর্ষের ফলে যার সুন্দর বোধ জেগেছে, যার কাম বিশ্বলক্ষ্মীকে কামনা করে, তার ব্যক্তিত্ব-বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, সে উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারী, চরিত্রহীন হয়ে ওঠে। বাঁধনের মধ্যে যে সুখ, সে সুখ তার ভাল লাগে না; কিন্তু বাঁধনহারা হয়ে চির-অতৃপ্তির উল্কাদহন সে সহ্য করে—যতক্ষণ না তার সেই 'বিশ্বরূপ-দর্শন' ঘটে ততক্ষণ তার শাস্তি নেই। এই স্বর্গ-মর্ত্যহারা জীবনে কি বিরাট্ ক্রন্দন, কি অশান্ত উল্লাস!

আসক্তি মানে গণ্ডি। কিন্তু আর একরকম গণ্ডি আছে—সে গণ্ডিকে মুক্ত পুরুষেরাও স্বেচ্ছায় বরণ করেন। জলের স্বরূপ যখন বুঝেছি, তখন কূপোদকও যা গঙ্গোদকও তাই; এককে যখন পেয়েছি, বুঝেছি, তখন খণ্ডের মধ্যেও পূর্ণ-তৃপ্তির বাধা আর থাকে না। তখন আমার গৃহলক্ষ্মীর মধ্যেই বিশ্বের নারীমূর্ত্তি দেখি—যত-কিছু সৌন্দর্য্য, যত-কিছু মহিমা ঐ ক্ষুদ্র সসীম ব্যক্তিদেহের গণ্ডির মধ্যেই পূর্ণ প্রকাশ হয়; তখন সুন্দর-কামনার সেই বিশ্বান্বেষী কল্পনা ঐ যেমন-তেমন দুটি চোখ, আঁকাবাঁকা ভুরু, সামান্য ওষ্ঠাধর, ও অসম্পূর্ণ স্নেহের মধ্যেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে; তখন কবি Wordsworth-এর মত—"To me the meanest flower that blows hath a meaning that lies too deep for tears"। এখানে বাইরে একটা গণ্ডির মত দেখায় বটে, কিন্তু অন্তরে সে সত্যিই মুক্তিলাভ করেছে, তার কাছে কোন বস্তুর মধ্যেই সঙ্কীর্ণতা আর থাকে না। যে সুস্থ তার কাছে সুস্থ-অসুস্থের ভেদ আর থাকে না; যে মুক্ত সে বন্ধন-অবন্ধনের বাইরে; যে বুদ্ধ তার আর কোন ভেদ-বুদ্ধি থাকে না। মন যখন সেই একে পৌঁছেচে তখন বহুর মধ্যে ফিরে এলেও, যে-কোন একই তার চক্ষে বহু—সুন্দর-পিপাসা নিবারণ হয়ে গেলে সর্ব্ব-ঘটে পূর্ণ-সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠান হয়, বৈচিত্র্যের মায়া, নবত্বের মাদকতা আর থাকে না। সে মন আর ফুলে ফুলে বেড়ায় না, যে কোন একটি পুষ্পপাত্রের মধু-মাধুরীতে মশগুল হয়ে যায়।

তোমার প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর আমি দিলাম না। এমন কি, তোমার প্রশ্নটি যে কি, তা-ও আমি কোনখানে উল্লেখ করলাম না। তবু দেখ, ঐ প্রশ্নের প্রসঙ্গে আমার মনে কত কথা জেগেছে, এবং আশা করি, সে কথাগুলো এত দূরের কথা হ'লেও অবান্তর ব'লে মনে হবে না। তবু সর্ব্বশেষে, তোমার প্রশ্নেরই উত্তর হিসেবে আমি একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করলাম, তা এই যে, কামনার দিক্ দিয়ে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম, যারা ফুল পেলেই সন্তুষ্ট, মধুর খবর

এখনও পায় নি ; দ্বিতীয়, যারা মধুর সন্ধানে ঘুরছে, এখনও পায় নি—তাই এক জায়গায় বসতে পারছে না ; এবং শেষ, যারা মধুর সন্ধান পেয়েছে, আস্বাদও জেনেছে। যারা প্রথম শ্রেণীর—তারা জড়-প্রকৃতি ; যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর—তারা বাঁধন-হারা ; আর যারা তৃতীয় শ্রেণীর—তারাই স্বস্থান-গত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

৩। আমার কাব্য-সাধনা

জগৎকে ও জীবনকে মহিমান্বিত করাই সকল কবিকর্ম্মের আন্তরিক প্রেরণা। এইরকম মহিমান্বিত করার দুটি উপায়—(১) মানুষের জীবনের বা ভাগ্যের যে দিক্‌টা মহান্ সেই দিক্‌টাই কাব্যে প্রতিফলিত করা ; (২) যা মহৎ নয়, অতিশয় তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, তার মধ্যেও প্রাণধর্ম্মের মহিমা আবিষ্কার ক'রে দেখানো। এই দুই দিক্ ছাড়া সাহিত্যের আর কোন দিক্ নেই। কারণ, সাহিত্যে মানুষের আত্মার স্বাস্থ্য চাই—যার থেকে মানুষের প্রাণ সঙ্কুচিত হয়, সেই অতি নীচ, ক্ষুদ্র, নিষ্ঠুর ও কুৎসিত fact-গুলোকে—অস্বীকার করা নয়, তাদের সংঘর্ষে মানুষকে সুন্দরতর মহত্তর দেখানো চাই। সেটা মিথ্যা-রচনা নয়—সেইটাই সত্য-কল্পনা। কারণ, মানুষের জীবন যেমনই হোক, তার অন্তরে অন্তরে অমৃতের কামনা আছে—এটা fact ; যদিও এর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কোনও ব্যাখ্যা নেই। এই অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে যে মিথ্যা মনে করে, সে নিজেই স্বাস্থ্যহীন, বিকারগ্রস্ত রোগী।...

সত্যকার প্রাণধর্ম্মী মানুষ যথাপ্রাপ্ত জীবন ও জগতের মধ্যেই প্রাণের আশ্রয় চায়। এজন্য জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যও যেমন তার পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই এই জগৎ ও জীবনকে অতিশয় সংকীর্ণ, অতিশয় ছোট ও হেয় ক'রে তার মধ্যেই মানুষের সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ ক'রে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান্ মানুষের প্রাণ আশ্বস্ত হয় না। জীবনকে ভোগ করতে হ'লে, মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি করলে চলবে না ; ক্রমাগত নিজ-প্রাণের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করতে হবে—অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে বলবৎ রাখতে হবে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য যাতে দূর হয়, যাতে fact-কে সর্ব্বদা বৃহত্তর কল্পনার আবেগে অমৃতরসে সিঞ্চিত ক'রে নেওয়া যায়, প্রাণের সে-শক্তি অটুট রাখা চাই।

আমার এখন যে এই বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে, তার থেকে প্রমাণ হয় আমার প্রাণশক্তি ক'মে আসছে। আমার মনে হয়, এতদিন আমি নিজেও চলছিলাম,

তাই এই চলমান জগৎটাকে 'চঞ্চলা' ব'লে মনে হয় নি ; আজ হঠাৎ আমি থেমে গেছি, আমার চলা ফুরিয়েছে—তাই জগৎটাকে বড্ড বেশি চঞ্চল, অনিত্য, অস্থায়ী ব'লে মনে হচ্ছে। জীবন্তর সঙ্গে মরন্ত আর পাল্লা দিতে পারছে না। তাই এই অবসাদ, এই বৈরাগ্য। কিন্তু এই জগৎ ও জীবনকে আমি কখনও ছোট ক'রে দেখি নি—এর বাইরে আর কোনখানে কোনও ভরসা আছে ব'লে বিশ্বাস হয় না। আজ যদি আমাকে বিদায় নিতে হয়, তা হ'লেও একেই প্রণাম ক'রে বিদায় নেব। এই দুঃখ থাকবে যে, এই অনন্ত রস-প্রস্রবণের কতটুকুই বা আস্বাদন করলাম!—যার এক কণাতেই সারাজীবন টলমল ক'রে উঠেছিল।

কিন্তু সহসা সব বন্ধন যেন খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি আর তোমাদের কেউ নই। তোমরা জীবিত, আমি মৃত।··· তোমাদের বয়সই তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ও-বয়সে আশা অপরিসীম, দুঃখও দুঃখ নয়—দুঃখের উত্তাপে প্রাণের বয়লারটা আরও বাষ্প সঞ্চয় করে, তার শক্তি বেড়ে যায়। সৌন্দর্য্যপুরীর রাজকন্যা গোপনে স্বয়ংবর-মালা গলায় পরিয়ে দেয়—তারই গর্ব্ব-সুখে দুনিয়ার কোনও দুঃখ একেবারে অভিভূত করতে পারে না! যত দুঃখ পাও, তত সেই নিভৃত বাসরকক্ষে স্বপ্নাভিসারিণীর অধর-পীযূষ প্রাণটাকে গভীরতর আশ্বাসে আশ্বস্ত করে। ব্যথার সুরভি-ঘ্রাণে প্রাণ আকুল হয়, কানে যে নূপুর বাজতে থাকে, তার ছন্দটি ধরবার চেষ্টায় সব দুঃখ ভুলে যেতে হয়—এমনি ক'রে জীবনের কুড়ি বৎসর কাটিয়েছি। কম কি? আমি কবিতা লিখতাম আমার আনন্দে—সেই কবিতাই আমার রতিসম্ভোগ; আমার কাব্যলক্ষ্মীর অধর-সুধা—তার চেয়ে বেশি আমি কিছু চাই নি। যদি চেয়ে থাকি, তবে আমার সে প্রিয়তমাকে অপমান করেছি। তার চেয়ে বেশি কিছু যে চায়, সে কবি নয়। অধিকাংশ কবিতা-লেখক কাব্যসুন্দরীর তোষামোদ ক'রে তার একটু কৃপাকটাক্ষ পেলেই ধন্য—তাই নিয়ে তারা বাইরে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে ব্যাকুল। কেউ বা চিরদিন courtship বা তোষামোদ ক'রে একটু কৃপাকটাক্ষ পেয়েই সন্তুষ্ট, তার মত আত্মপ্রবঞ্চিত আর কেউ নেই। তাঁর সঙ্গে গাঢ় মিলন চাই—একেবারে রতিসুখ! সেই ব্রহ্মানন্দের পরমক্ষণ না হ'লে কবিতা লেখা যায় না। কবিতার আসল definition এই:—কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রসমূর্চ্ছিত মানবের দিব্যভাব-বিধুর গদগদ-ভাষ। কবিতা-লেখার সময়টাই সেই পরমক্ষণ। তারপর আর সে সমাধির অবস্থা থাকে না। তখন সেই প্রিয়-সম্মিলনের সুখস্মৃতি একটু ধ'রে রাখবার জন্যে সেই কবিতা

পড়ি, এবং পরকে পড়াতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু যে সেই সত্যকার মিলন-সুখ ভোগ করেছে, সে আর কিছু চায় না; সে আবার সেই আনন্দই পেতে চায় —তার আত্মা সেই অপার্থিব সম্ভোগ-সুখ কামনা ক'রে 'নিশি-নিশি শয়ন-রচনা' করে। যে সেই আনন্দের চেয়ে কবি-যশের জন্য লালায়িত, তাকে রাধিকার মুখে বৈষ্ণবকবির ভৎর্সনা শুনিয়ে দিতে হয়। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গোপনে রাত জেগে ভোরের সময় রাধিকার কাছে এসেছেন। চন্দ্রাবলী রাধিকার ঈর্ষ্যা বাড়াবার জন্যে ছল ক'রে দূতী পাঠিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে যে, তার যে নূপুরটি পাওয়া যাচ্ছে না, তা কি কৃষ্ণ প'রে এসেছেন? নূপুরটি তা হ'লে কৃষ্ণ যেন দূতীর হাত দিয়ে ফেরত পাঠান। তাই শুনে' রাধিকা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা ক'রে বললেন, "তুমি যে এমন ইতরের সঙ্গ কর, তা জানতাম না—ছি, ছি! কৃষ্ণহারা হয়ে নূপুরের জন্য লালায়িত!—এমন লোকের সঙ্গেও তুমি পিরীত কর!" এখানেও ঠিক তাই। যে কাব্য-লক্ষ্মীর অধর-সুধার চেয়ে নিজের কবিতার পক্ষপাতী—যে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে যশোবঞ্চিত হওয়াটাই বড় দুর্ভাগ্য মনে করে, সে কি কম ইতর! তিনি যখন চুম্বন করেন, সেই চুম্বন-সুখে প্রদীপ্ত আমার যে মুখ-জ্যোতি—যা আমি দেখতে পাই নে, লোকে দেখে—তারই নাম যশ। সে জ্যোতির যদি কোন মূল্য থাকে, তবে সে এইটুকু মাত্র যে, সে আমারই সুখের অকৃত্রিমতার প্রমাণ। সেই সুখই যদি না রইল, তবে যশের মূল্যই বা কি, সার্থকতাই বা কি? বরং সে যশ চাই না, সেই সুখ চাই—নিভৃত-বাসরে সঙ্গোপনে সেই সুখ আস্বাদন ক'রে মরজন্ম সফল করব, আমার মুখের সেই আনন্দ-জ্যোতি কারও দেখবার দরকার নেই। আজ আমি সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—যশে আমার কি প্রয়োজন?

কিন্তু চিঠি যে শেষ হয় না। এ আমায় কি যে পেয়ে বসেছে আজ! এর যেন শেষ নেই। লিখতে লিখতে প্রাণটা কেমন ক'রে উঠছে; বাইরে আকাশ অন্ধকার,—কখনও ধারাবর্ষণ হচ্ছে, কখনও বৃষ্টিকণা চূর্ণ হয়ে ঝরছে, মাঠের পরে দূর বৃক্ষশ্রেণী কুয়াসায় আচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। নিঃশব্দ বৃষ্টি থেকে থেকে সশব্দ হয়ে উঠছে। বেলা বাড়ছে না, ঠিক একভাবে আছে। বর্ষা আমার কখনো ভাল লাগে না। ভেবেছিলাম, অমাবস্যা কেটে গেলে আকাশ একটু পরিষ্কার হবে। আজ প্রতিপদ, সে আশা দেখছি নে। কিন্তু শীঘ্র আকাশে চাঁদের ফালি দেখতে পাব—মাঝে মাঝে অন্ততঃ। চাঁদ চিরদিন আমার নির্জ্জন-বাসের সঙ্গী। ওর রূপ আর পুরোনো

হ'ল না।......বর্ষার অন্ধকারকে রঙিন ক'রে তোলে কিসে?—"A flask of wine, a book of verse, and Thou"! 'Book of Verse' হ'লে আমার চলবে, 'Flask of Wine'-টা অধিকন্তু; আর শেষেরটি আমার পক্ষে চিরদিনই গরহজম। তবে Book of Verse-এর সঙ্গে একজন সমপ্রাণ শ্রোতা চাই—কবিতার নেশাই আমার একমাত্র নেশা। কিন্তু বর্ষার রাত্রি আমার ভাল লাগে—খুব অন্ধকার গভীর রাত্রি, আর অবিশ্রান্ত সশব্দ বর্ষণ। বাইরে থেকে আসছে যুঁই, বেল, হেনার গন্ধ—ঘরে মিটমিট করছে প্রদীপের আলো। জেগে থাকব না, ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে বর্ষারাত্রির অভিসার-সঙ্কেত শুনতে পাব। কিন্তু সে রকমটি এখানে হয় না। যত উৎপাত দিনের বেলায়—রাত্রে গুমোট। মনে হয়, এখানকার প্রকৃতিও অতিশয় অরসিক। এখানকার বর্ষায় একরাশ বকুল-ফুল নিয়ে মালা-গাঁথা, বা একরাশ ভিজে চুল নিয়ে কোন রকমে খোঁপা-বাঁধা—যুঁইফুলের কেয়াফুলের গন্ধ, নীলাম্বরী—এ সব মনে পড়ে না। এ আমাদের মত ধূমিত-দশা দীপাধারের উপযুক্ত নির্ব্বাসন-স্থান।

শ্রাবণ, ১৩৩৭

১২

জীবন-কাব্য

জীবন-কাব্য

মিনা তখনও পড়িতেছিল। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, প্রায় দশটা বাজে। অন্য দিন ইহার অনেক আগে, খাতা-পত্র গুছাইয়া, ডেস্কে চাবি দিয়া, বাতি হাতে করিয়া, সে শোবার ঘরে যায়। তার বাবা সামনের চেয়ারে বসিয়া একখানা বইএর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন। মেয়ে মাঝে মাঝে যে সব প্রশ্ন করিয়া তাঁহার পড়ায় বাধা দেয়, আজ আর সে সব কিছু ছিল না। হঠাৎ মিনা বইখানা বন্ধ করিয়া একটু জোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কেমন যেন মূর্চ্ছাহতের ন্যায় এলাইয়া পড়িল। তখন তাহার বাবার হুঁস হইল, বলিলেন—"পড়া হয়ে গেল? অমন ক'রে রইলি যে? মাথাটা ধরেছে বুঝি?—এতক্ষণ অমন ক'রে কি পড়ছিলি?"

মিনা প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপর আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বাবা, মানুষ কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে? উঃ!" —বলিতে বলিতে সে যেন ফুঁপাইয়া উঠিল।

তাহার বাবা বইখানার দিকে একটু ভাল করিয়া তাকাইয়া, কতকটা আন্দাজ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তাই বুঝি অমন হয়ে পড়লি? স্কটের নভেল, তাও আবার কেনিলওয়ার্থ, শেষ করেছিস্?"

"নাঃ, আর পড়তে পারলাম না। এমি রব্‌সার্ট্‌কে কি করে মেরে ফেল্লে! আমি ও' আর পড়ব না—এমন জানলে কখ্‌খনো পড়তাম না! মানুষ যদি এতই নিষ্ঠুর হয়, তা' আবার এমন করে দেখাবার কি দরকার ছিল?"

হরিনাথবাবু মেয়ের কথায় হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি পণ্ডিত লোক, যাহাকে সত্যিকার পণ্ডিত বলে। কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন, যেমন সাহিত্য-রসিক তেমনি সুপণ্ডিত। কাব্যামৃত-রসাস্বাদ তাঁহার বিলক্ষণই হইয়া থাকে, সুজনের সঙ্গলাভটা তেমন ঘটিয়া উঠে না। মেয়েটিকে দিয়া সেই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা বোধ হয় ছিল; তাহার নির্ম্মল বুদ্ধি, শিক্ষা-প্রবণতা ও ভাবগ্রাহিতা দেখিয়া তিনি তাহাকে মনের মতন করিয়া মানুষ করিতে চাহেন। শিক্ষকের

যাহা প্রধান গুণ, তাহা তাঁহার ছিল—বয়স অল্প বলিয়া কাঁহাকেও তিনি অবজ্ঞা করিতেন না; যাহার যেমন বোধশক্তি তাহার সঙ্গে তেমনি করিয়া সত্য-সুন্দরের আলোচনা করিতেন। ইহাতে তাঁহার খুব বিশ্বাস ছিল, কারণ তিনি বেশ দেখিয়াছেন যে, অনেক বিষয়ে ছোটদের বুদ্ধি বড়দের চেয়েও পরিষ্কার। সৌন্দর্য্য ও সত্যজিজ্ঞাসা যেন একটি সহজাত সংস্কার। বহু-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া যে জিনিষটা ফুটিয়া উঠে নাই, সেটা হয়ত এমন কাহারও মধ্যে যেন জাগ্রত ও উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, যাহার না বয়স বেশি, না বিদ্যা বেশি।

মেয়ের কথায় একটু হাসিয়া হরিনাথবাবু বলিলেন, "স্কটের নভেল এখন তোমাকে যেমন বিচলিত করছে, আশা করি, আর একটু বড় হ'লে আর তেমন করবে না। ভাব-প্রবণ তরুণ হৃদয়ে তাঁর প্রভাব বড় বেশী। একজন নামজাদা সমালোচক বলেছেন, ১৫।১৬ বছর বয়সেই স্কটকে সব চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক বলে মনে হয়, পরে আর পড়তেই পারা যায় না। আমার মনে হয়, স্কটের গল্প বলবার শক্তি অসাধারণ; অল্প বয়সে স্কটকে যেমন ভাল লাগে, তেমনি আবার বেশী বয়স হলে, কর্ম্মহীন নিশ্চিন্ত জীবনে জগৎটা যখন ছায়া-ছায়া হয়ে আসে, তখন স্কটের গল্প আবার পড়তে বেশ লাগে।"

বাপের এই অনতি-দীর্ঘ বক্তৃতায় মিনার ভাবের ঘোর বোধ হয় একটু কাটিয়া আসিয়াছিল। এতক্ষণ সে নিছক আবেগের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল; এখন একটু বুঝিবার মত, ভাবিবার মত কথা শুনিয়া কতকটা সংযত হইয়া তাহার বাবাকে বলিল, "এর মানে আমি কিছু বুঝলাম না, বাবা! স্কটের গল্প বিশেষ করে' কেবল ছেলেমানুষদের আর বুড়োদের রুচিকর—তার মানে, গল্পমাত্রেই তাই নয়, কেবল স্কটের গল্প সম্বন্ধেই ও কথাটা খাটে? গল্প যার ভাল লাগে না, তার কোনোকালেই কোনো গল্প ভালো লাগবে না, আমি ত' এই বুঝি। এতে আর স্কটের দোষ কি?"

"সব গল্পই গল্প, এ কথাটা এক হিসেবে সত্যি, অর্থাৎ কিনা, ঠিক সেই রকমটি কোনখানে না ঘটে' থাকতে পারে। কিন্তু গল্পের 'মতলব'টা সত্যি হ'তে দোষ কি? প্রকৃতির নিয়মে বাইরের ঘটনা ঘটে, আবার যে মানব-মানবীর চরিত্র এই বাইরের ঘটনাকে প্রভাবিত করে এবং তার দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়, তার সম্বন্ধেও অখণ্ডনীয় নিয়ম রয়েছে। এই দুইটি নিয়ম ছাড়া আর একটি বড় নিয়ম, যা হচ্ছে অনিয়মের নিয়ম—একটি পরম রহস্যময় তত্ত্ব—মানুষের অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন

রয়েছে। যাঁর কল্পনায় বা প্রতিভা-দৃষ্টিতে এই তিনটি একত্র হয়েছে, তিনিই অন্তর্যামীর মত নূতন জগৎ নূতন জীবন সৃষ্টি করতে পারেন—সেও যেমন সত্য, তেমনি সুন্দর! যে-গল্প কেবল মিথ্যা ভাবের বাষ্পে আমাদের কণ্ঠরোধ করে, তাকেই উপন্যাস বা 'রোমান্স' বলে। ছেলেবেলায় রাক্ষসের গল্প শুনেছ—যে সব সোনার কাঠি, সাত সমুদ্র, তেপান্তরের মাঠ, সোনার গাছ, হীরের ফুলের গল্প শুনেছ—সেই গল্পই একটু বেশী বয়সের উপযোগী করে' তরুণ-হৃদয়ের স্বপনের রঙে ফলিয়ে তোলার যে কৌশল, তাই হচ্চে এসব রোমান্সের বাহাদুরী। সে সব গল্প সত্য নয়, এমন কি শুভও নয়—কেবল উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয় দেয়; সংসারে সত্যিকার জীবনে যে মাধুরী, যে মহিমা, যে পুণ্য-বেদনার অবকাশ আছে, তার পরিচয় দেয় না; অনুভূতির উদ্রেক না করে' কেবল মিথ্যা সেন্টিমেণ্ট জাগিয়ে তোলে। 'ডন কুইক্সোট' পড়েছ ত? —এই সব গল্পের সেই ভাবকে ওই পথে একটু বেশী করে' বাড়িয়ে নিয়ে গেলে ওই রকম হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। এমি রব্‌সার্টের জীবনের ট্র্যাজেডিটা মূলে ঐতিহাসিক হলেও হতে পারে, কিন্তু সকল ট্র্যাজেডির সঙ্গে একটু কমিডিও থাকে—তার জন্যে সমবেদনা কম হয় না, তবে ঠিক অমনি করে' মানুষের বিচারবুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে' একটা নিদারুণ আঘাতে অবসন্ন করে দেয় না। জগতে সত্যিকার 'ট্র্যাজেডি' যা কিছু ঘটেছে, তার জন্যে একটা দুর্ব্বৃত্ত নরপিশাচ না হ'লেও চলে। তা' ছাড়া, মানুষ যে একেবারে পিশাচ হয়—এ কথাও সত্যি নয়, তার মনুষ্যত্ব যাবে কোথায়? সেটা যদি লেখক চাপা দেন, তবে মানুষের হৃদয়ের ইতিহাস লেখা তাঁর কর্ম্ম নয়। মানুষ যেমন দেবতা নয়, তেমনি মানুষ পিশাচও নয়। এই সত্য-দৃষ্টি যে গল্পের মধ্যে আছে, তাকেই আধুনিক অর্থে নভেল নাম দেওয়া যায়। স্কটের গল্প ঐতিহাসিক বলে' মনে করো না, তার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; বরং ইতিহাসের দোহাই দিয়ে তিনি যে কল্পনাকে খাড়া করেছেন তার মধ্যে যদি কোনো চিরকালের সত্য থাকে, তবে সেইটুকুই বাস্তব, সেইটুকুই ইতিহাস। তাঁর গল্পের ঐ আবরণটা চাতুরী, সেইটাই তাঁর মিথ্যা কথার কৈফিয়ৎ। লোকে বলে, তিনি তাঁর কাহিনী-রচনায় য়ুরোপের মধ্য-যুগকে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু আসলে তা' নয়। সে যুগের জীবনযাত্রার কতকগুলো তোড়-জোড়, নিতান্ত বাহ্য আচার-প্রথা ছাড়া, তার মর্ম্মস্থানটিতে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি। এ জন্যে কার্লাইল বলেছেন, স্কটের নভেলে মধ্য-যুগের চেহারা কেবল সাজসজ্জা কাপড়-চোপড়েই আটকে

গেছে, ভেতরকার প্রাণটা যেখানে, সেখানে পৌঁছতে পারে নি; তাঁর নিজের যুগের আবহাওয়ার প্রভাব তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। সে যুগের মানুষের মনে যে সব আন্তরিক সংস্কার-কুসংস্কার আশা-বিশ্বাস ছিল—ভূত, প্রেত, ডাইনি, শয়তান প্রভৃতির সাহায্যে সেগুলোকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। কিন্তু যে মানস-প্রকৃতির ফলে, যে অতি-প্রাকৃত আধিদৈবিক শক্তিতে আস্থা থাকার জন্যে, তাদের জীবনে এই রকম বস্তুর একটি সত্যিকার স্থান ছিল—সে কালের মানুষের মনের সেই ভিতরের দিকটা তিনি দেখাতে পারেন নি, ভূত-প্রেত-পিশাচের সেই বাস্তব মোহ তাঁর লেখার কোনোখানে নেই।"

এইখানে মিনা বলিয়া উঠিল, "সে থাকবে কেমন করে'—সে-ত' আর সত্যি নয়!"

"সত্যি কোনটা আর মিথ্যা কোনটা—তার পরিচয় মানুষের মনেই যে রে! সেকালে যে সেটা সত্যি ছিল! এই এখনো আমরা যে অনেক জিনিষ বিশ্বাস করি, হয়ত' এর পর তা' মিথ্যা বলে' প্রমাণ হয়ে যাবে, তাই বলে' কি সেগুলো আমাদের কাছে সত্যি নয়? এই সত্যি-মিথ্যার ধারণা কালে-কালে বদলায়—মানুষের জ্ঞান বাড়ে; কিন্তু মানুষের যেটি অন্তর-প্রকৃতি, সেটা সবকালে যে সমান আছে! মানুষ একই কারণে কাঁদে, একই কারণে হাসে; তার সুখদুঃখ, ব্যথা-বেদনা এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে গিয়ে পড়ে বই ত' নয়! ঘূর্ণীর মধ্যেও একটি বিন্দু স্থির থাকে, সেইজন্যেই ত' সকল কালের সকল দেশের মানুষকে মানুষ বলে' আমরা চিন্‌তে পারি। বহু প্রাচীন মিশরের সমাধি-ঘরের দেওয়ালে যে চিত্র দেখি তার রেখা-বর্ণ যেমনি হোক, তার মধ্যে সেই চিরকালের মানুষের যে প্রাণের ভাষা ব্যক্ত হয়েছে, তা' বুঝতে ত' দেরী হয় না। সত্যিকার মানুষের সত্যিকার সুখ-দুঃখ বুঝতে হ'লে খুব জাঁক-জমকের দরকার হয় না, তার সাজসজ্জা, উপকরণ-আয়োজন—অত স্তূপাকার বিরাট হবার দরকার দেখি নে; তার ব্যথা গভীর করে' দেখাবার জন্যে ভীষণ ভয়ানক ঘটনা বা নরপিশাচের সৃষ্টি করতে হয় না। বরং বাইরের সমস্ত আবর্জ্জনা সরিয়ে দিয়ে, তার বুকের কাছটি বরাবর খুলে ধরলেই সত্যিকার মানুষটিকে দেখতে পাওয়া যায়। খুব হোমরা-চোমরা বীরভদ্র নায়কের চেয়ে একটি সাধারণ সামান্য ব্যক্তির জীবন-কাহিনীতে প্রাণের পরিচয় বেশি থাকে। গ্রে'র 'এলিজি' পড়েছিস ত'? সেই কবিতাটিতে কবি এই কথাই ভালো করে' বলতে পেরেছেন বলে' তার এত আদর। এমি রব্‌সার্টের

মৃত্যুর ব্যাপারে যে নিষ্ঠুরতা আছে, সেটা বাইরের দিক,—পাঠকের মনকে সহজে অভিভূত করবার জন্যে ঘটনাচক্র ও চরিত্রের মধ্যে একটা যে জবরদস্তি আছে, সেটা তোর চোখে পড়ে নি। একটা নিতান্ত সরলা অবলাকে একটা দানব এমন করে' মেরে ফেল্লে, এই ভেবেই না তোর মনটা এত কাতর হয়েছে? তবে কি, যার অনেক দোষ, তার যদি পরিণামটা ঐ রকম নিষ্ঠুর হয়, তাতে তোর কষ্ট হবে না?"

"হবে, কিন্তু এতটা নয়; কারণ, তখন এটাও মনে হবে যে, সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।"

"কিন্তু, পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে সবাই করে রে! পাপ জিনিষটা আসলে কি জানিস্? ছোট আর বড় যেমন পাপই হোক, সেটা মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা বই আর কিছু নয়। যার অন্তরে যত অজ্ঞান, তার ভুল তত বড় রকমের হয়; সেই ভুলের দেনা শোধ করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের 'ট্র্যাজেডি'। এইজন্যে দুঃখের পরিধি দে'খে ত' নয়, যখন বুঝি, তার কারণ মানুষের পাপ নয়—তার জ্ঞানের অভাব, অর্থাৎ তার 'অদৃষ্ট' যা তাই, তখনই এই বিশ্বজনীন দুর্ব্বলতা, এই অজ্ঞান-জনিত ভ্রম, আর তার শাস্তির কথা চিন্তা করে' গভীর সমবেদনা জাগে; আবার তারি সঙ্গে একটা আশাও জাগে, গভীর দুঃখে একেবারে নিরাশ্বাস হইনে। মানুষকে সত্যিকার পাপী বলে' ধারণা হ'লে একটা অন্ধ দুঃখই হয়; প্রাণ তোল-পাড় করে মাত্র, ভগবানের উপর অভক্তি হয়, আত্মার অকল্যাণ হয়। মানুষকে পাপী মনে করে' তার দুঃখটাকে যখন ছোট করে দি', তখন আমরা নিজেরাই ছোট হয়ে যাই। মানুষ পাপী ব'লেই তার দুঃখের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারি নে, একটুও ছোট করতে পারি নে। মানুষ কেন পাপ করে—এ কথার উত্তর মেলে না। কিন্তু যখন বুঝি, অজ্ঞানই দুঃখের মূল, তখন এ আশ্বাসও জাগে যে, যত অন্তরে জ্ঞান লাভ করব তত এই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। বাইরের দুঃখ —জড় শক্তির নিয়মে যেটা আমাদের চিরকাল ভোগ করতে হবেই—সেটাকে এই জ্ঞানের দ্বারা সহ্য ক'রেই জয় করব। সেই সহ্য-করার শক্তি যখন হয়, তখনই সত্যিকার আনন্দ আস্বাদ করা যায়—সে অবস্থায় ওই দুঃখই জ্ঞানীর হৃদয়ে রসোদ্রেক করে। উপন্যাসে আমরা আপন-আপন প্রাণটাকে নানা পাত্রে নানা সংস্থানে, নানা ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে দেখি কিনা! পরের অবস্থায় নিজেকে ফেলার নামই সহানুভূতি, গলা ধরে' কাঁদাই সহানুভূতি নয়। এই সহানুভূতিই

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়, এ একটা খুব বড় শক্তি। এই শক্তি ভাল করে জাগ্‌লে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, অর্থাৎ সকলের মধ্যে আপনাকে দেখতে পাই—অনেক জটিল ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়, জ্ঞান হ'লে আর ক্ষোভ থাকে না। এমি রব্‌সার্ট ম'ল কেন জানিস? লিস্‌টার কিম্বা তার ওই পাষাণ্ড চাকরটা তার কারণ নয়। তার বিনাশের বীজ তার নিজের চরিত্র ও বুদ্ধির মধ্যেই ছিল। যে অত মুগ্ধ-স্বভাব, অত সরল, যে সাপকে আদর করে' ধরতে যায়, কোনো সন্দেহ করে না—যে অন্ধের মত তিন-তলা ছাদ থেকে সোজা পা' বাড়াতে পারে, সে ক'দিন বাঁচবে? আত্মরক্ষার দিকে যার একেবারে দৃষ্টি নেই, সে কি কখনো বাঁচতে পারে?"

"বাবা, আত্মরক্ষা করা তো স্বার্থপরতা। যে এমন করে' নিজের আপদ-বিপদের চিন্তা না ক'রে আপনাকে উৎসর্গ করে' দেয়—সে কত সুন্দর! কত মহৎ!"

"অমন করে' মরে' না গেলে ওই মহত্ত্ব, ওই সৌন্দর্য্য, কি অমন করে' ফুটে উঠতো?"

"তা বটে, এতটা ফুটে উঠত না।"

"তাই যদি হয়, আর ওই সৌন্দর্য্য-মহত্ত্ব দেখেই যদি মুগ্ধ হও, তবে ঐ মরার জন্যে শোক করছ কেন?"

এবার মিনা চুপ করিয়া রহিল। তখন তাহার বাবা বলিতে লাগিলেন, "আসলে, ওই মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য-বোধটা তোমার মনে প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাকে ছাপিয়ে ওই নিরীহ অসহায় মেয়েটির প্রতি তোমার দয়াটাই প্রবল হয়ে উঠেছে; আর সেটা বাড়িয়ে তুলেছে ঐ লোকটার পৈশাচিক নির্ম্মমতা। আমি বলি, মানুষকে পাষণ্ড বলে' ঘৃণা করাও যেমন, কেবল দয়া করাও তেমনি—সেও এক রকম তাকে অপমান করা। যে রচনায় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধির উদ্রেক না হয়, সে রচনা মিথ্যা। সকল পরাজয় ও শাস্তির মধ্যে মানুষকে যেখানে একেবারে শক্তিহীন প্রতিপন্ন করা হয়, সে রকম লেখাও পাঠকের মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। মানুষের অভিজ্ঞতা একটু বেড়ে গেলে, বুদ্ধি একটু পরিণত হলে, এসব ফাঁকি ধরা পড়ে, তখন আর ভালো লাগে না। তাই বলছিলুম, স্কটের নভেল এখন তোমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে, একটু বড় হলে, সত্য-সুন্দরের জ্ঞান আর একটু বাড়লে, আশা করি, আর তেমন করে' অভিভূত করবে না।"

"কিন্তু, বাবা, আমি একটা কথা তবু বুঝতে পারলাম না—মানুষের সুখদুঃখ সবারই সব কালে কি এক? তা কি হ'তে পারে? সব মানুষের মনের ধরণ

তো এক নয়, সকলেরি আশা-আকাঙ্ক্ষা ত' এক নয়। আবার সবকালে মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস এক থাকে না—তা' হলে সুখ-দুঃখ কেমন করে' এক হবে?"

"আমি ত' আগেই বলেছি, মনুষ্য-সাধারণের—মানুষ বলতে যে জীবটি আমরা বুঝি—তার সুখ-দুঃখ সব কালে সব দেশে একই; মানবীয় অনুভূতির একটা সার্ব্বজনীন ভিত্তি আছেই—মনুষ্য-প্রকৃতি চিরকালই সমান। তবে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আমরা যে পরিবর্ত্তন বা প্রভেদ লক্ষ্য করি, সেটা যত বড়, যত বিচিত্র বলেই মনে হোক্, সেটা বাইরের সংস্কার মাত্র। পরিষ্কার শাদা জল যেমন রং-বেরংঙের কাচের আড়ালে বিভিন্ন বলে' বোধ হয়, আর ঐ রকম বিভিন্ন বলে' বোধ হয় বলেই, যেমন আমাদের তা' দেখে সুখ হয়, তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন জাতির পরিচয়ে আমরা বিচিত্র রস উপভোগ করি বটে, কিন্তু মূলে যে তারা সমান—তা' মানুষের ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য ভালো করে' আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। জাতি, কাল এবং দেশের পার্থক্য থাকলেও শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলি কি আমাদের কম ভালো লাগে? সপ্তদশ শতাব্দীর এই বিদেশী কবি-যাদুকর যেখানে যেমন করে' তাঁর দেশের লোককে হাসাতে কাঁদাতে চেয়েছেন, আমরা ঠিক তেমনি করে' সেই সেই জায়গায় হাসি কাঁদি ত'! যেখানে আমাদের বাধে সেখানে হয় ভাষার ভঙ্গি, নয় সামাজিক আচার-প্রথার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবই তার কারণ। এইটে বেশ মনে করে' রাখবি যে, মানুষের মধ্যে প্রাণ আর মন বলে' দুটো পৃথক্ বস্তু আছে; প্রাণটা হচ্চে প্রকৃতির দেওয়া, আর মনটা হচ্চে দেশকাল ও প্রতিবেশ-প্রভাবে মানুষের অনেকটা নিজের সৃষ্টি।

"যে-দেশে যে-কালে যেমনই সভ্যতা-বৃদ্ধি হোক্, মানুষের প্রাণটা যেমন তেমনই আছে। প্রাণধর্ম্মী মানুষই সত্যকার সনাতন মানুষ—এই দেহই সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা-বেদী। সেই দেহের রক্ত কি সকলেরই এক নয়? এই রক্তের যে চেতনা, যে অনুভূতি—পরম সত্যের বীজ তার মধ্যেই আছে। এই দেহই সনাতন, এই দেহই নিত্য; এই দেহের মধ্যে যা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তা' সব কালে সব দেশে সকলের মধ্যে সমান। মনুষ্যধর্ম্ম সর্ব্বযুগে এক, মানুষ তাকে প্রকাশ করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে; তার কর্ম্মপদ্ধতি, তার অনুষ্ঠান-রীতি, তার সমাজনীতির অন্তরালে যে সত্যটুকু প্রকাশ পায়, তা' ওই সাধারণ মানবধর্ম্ম। যেখানে সেই মূল ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় না, সেখানে সত্য নাই—আছে মিথ্যা সংস্কার মাত্র। শিক্ষিত সভ্য-মন কতকগুলা সূক্ষ্ম জল্পনা-কল্পনার রঙে রঙীন

হয়ে উঠে বটে, কিন্তু সেটা বাইরের ছোপ, একটু আঁচড়ালেই সেই চিরন্তন মানব-হৃদয়ের পাকা রঙটি ফুটে বেরুবে। এই জন্যে ম্যাথু আর্ণল্ড্ কাব্যের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম মার্জ্জিত সেন্টিমেন্টের বিলাস পছন্দ করতেন না; তাঁর মত ছিল—যে সব হৃদয়বৃত্তি খুব আদিম, সহজ ও সরল, নিত্যকার জীবনযাত্রায় যা' স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সেইগুলিই কাব্যের উপাদান হওয়া উচিত। আমার মতও কতকটা তাই।

"এইবার তোমাকে ঐ মনের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। মনের সূক্ষ্ম বিলাস আর জ্ঞান এক জিনিষ নয়। মনই হচ্চে রিপু, মনই অবিদ্যা। মন মানুষকে স্বধর্ম্ম-বিস্মৃত করে। দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত প্রাণই আনন্দ-নিকেতন। মন নিরানন্দের আকর, অবাস্তব সুখদুঃখ-কল্পনার নায়ক। দেহ ও প্রাণের কর্ষণ না হয়ে যখন বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মে দুর্ব্বল স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কাপুরুষের মধ্যে এই মনটারই কর্ষণ অতিমাত্রায় ঘট্‌তে থাকে, তখন মানুষ মিথ্যাচারী হয়ে ওঠে; সহজ সরলকে জটিল করে' তোলে, স্বাস্থ্যকে অস্বাস্থ্য, নীতিকে দুর্নীতি এবং সত্যকে মিথ্যা বলে' একটা কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করে—সে-জগতের মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা অহঙ্কারের সীমা নেই; মানুষের যেটা স্বধর্ম্ম—যেখানে সর্ব্বমানবের মিলনভূমি—সেটাকে তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সকলেই এখন আপনার সুখদুঃখ পৃথক্ করে নিচ্ছে—কোথাও কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। মনের এই অত্যধিক কর্ষণে মানুষের অহংটি উৎকট হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। এই মনের কর্ষণ না হয়ে যদি প্রাণের কর্ষণ হয়, তবে দিব্যজ্ঞানলাভ হয়; মানুষ একই কালে আপনাকে ও পরকে চিনতে পারে, সর্ব্বাত্মীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।

"তোমার প্রশ্নটা ছিল, সুখদুঃখ সকলের সমান কি না—এখন বুঝতে পেরেছ, যা' প্রাণের জিনিষ, তা' সব মানুষেরই সমান। কিন্তু ওই কর্ষণের ফলে এই প্রাণ-বস্তুটিরও উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে। প্রাণের কর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এই জন্যে সুখ-দুঃখের কার্য্যকারণ-পদ্ধতিটা এক হ'লেও, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রাণে অনুভূতির তারতম্য হবেই; কর্ষণের দ্বারা প্রাণটা যত বড় হ'তে থাকে, ততই সুখদুঃখ ব্যক্তিগত না হয়ে সাধারণ হয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই জ্ঞানবৃদ্ধির পরিচয় আছে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সুখদুঃখের হাহাকারটা কমে' যায়—সংসারের যত-কিছু বাস্তব সুখদুঃখ একটি শান্ত-মঙ্গল আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়ে দেখা দেয়। ব্যথা থাকে, কিন্তু ব্যথার বিষ আর থাকে না। সেজন্য ব্যথাকে এড়িয়ে যাওয়ার, ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি আর থাকে না;

বরং তাকেই বরণ করে' সত্যকার সমবেদনা ও প্রেমের আনন্দে জীবনটাকে সেবায় আত্মোৎসর্গে সফল করে' তুলতে ইচ্ছা হয়"।

"ব্যথা থাকবে, অথচ ব্যথার বিষ থাকবে না—এর মানে কি বাবা"?

হরিনাথবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুই বেটি বড় জেরা করতে সুরু করলি ত? আচ্ছা, বুঝিয়ে দিচ্ছি। জগতে সুখ-দুঃখ দুই আছে, দুই আমাদের মনকে অভিভূত করে, আমরা আত্মহারা হয়ে পড়ি। কিন্তু, ওই যে সত্যিকার জ্ঞানের কথা বলছিলাম, ওই জ্ঞান যত বাড়্‌তে থাকে, ততই আমাদের শক্তি বাড়ে, মন সহজে চঞ্চল হয় না, প্রাণে একটা শান্তির ভাব স্থায়ী হয়ে উঠে। তখন সুখ-দুঃখ—যা-কিছু সবই অনুভব করি বটে, কিন্তু কোনটাই অভিভূত করে না, একটি শান্ত আনন্দ-রসের অনুভূতি সর্ব্বদাই যেন জাগ্রত হয়ে থাকে। এই রকম অবস্থা যার হয়েছে, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী বা রসিক। জগতের কোনোখানে তিনি কোনো অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি দেখতে পান না—সবই সুন্দর বোধ হয়। সুখদুঃখ-বোধটা আপনার স্বার্থবোধ থেকেই জন্মায় কি না! প্রথমটা তাই হয়। তার পরে আর একটু উন্নত অবস্থায় আপনার স্বার্থটাই পরের মধ্যেও প্রসারিত করতে পারি। স্বার্থ ও পরার্থে যখন ভেদ থাকে না, তখন আমরা আর এক ধাপ উপরে উঠি—তখন সহানুভূতি বা সহমর্ম্মিতার সাহায্যে আমাদের প্রকৃত জ্ঞানলাভের সূত্রপাত হয়—শেষে আর স্বার্থ-পরার্থ কিছু থাকে না, সত্যিকার বৈরাগ্য আসে। এই বৈরাগ্য মানে প্রাণের রুক্ষতা মনে কোরো না। এই বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ রসিকের অবস্থা; এই বৈরাগ্য না হ'লে জগতের মর্ম্মগত মাধুরী, সৃষ্টির লীলামধু কিছুতেই আস্বাদ করা যায় না। যিনি ঋষি, তিনিও এই বৈরাগ্য লাভ ক'রেই ঋষি হয়েছেন; যিনি খুব বড় শিল্পী, তিনিও এই বৈরাগ্য লাভ ক'রেই সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে সত্যরূপে প্রকাশ করেন। তাঁদের উপভোগ-ক্ষমতা বেশী; তাঁদের রচনা যেমনই হোক, যে-বিষয় নিয়েই হোক, তার একটি মাত্র গুণ হচ্ছে—অপূর্ব্ব চিত্ত-চমৎকার। সুখ-দুঃখ দুইই তাঁদের কাছে সমান—ও দুটো কাব্যের উপাদান মাত্র, সেই উপাদান দিয়ে যা' নির্ম্মাণ করেন তা' হচ্ছে পরিপূর্ণ আনন্দ। যারা সেই বৈরাগ্য লাভ করেনি, বা সেই বৈরাগ্যের আভাসও পায় নি, ওই সুখ-দুঃখই বোঝে, ওইটেই ঘোরালো করে' পেতে চায়—তাদের উপভোগ-ক্ষমতা বড় কম, তাদের জ্ঞানও খুব সঙ্কীর্ণ—নিছক হাসি ও নিছক কান্না না হ'লে তাদের চলে না; তারা সহানুভূতির প্রসার

চায়, সেইটেকেই যে-কোন পাত্রে এবং যে-কোন অবস্থায় খুব গভীর করে' ভোগ করতে চায়। ব্যথাটাই যে সর্ব্বস্ব নয়, ব্যথাটা উপলক্ষ্য মাত্র—উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ, এটা তারা কিছুতেই বোঝে না—সুখ ও দুঃখ এই দুটো জিনিষকে ছাড়িয়ে তারা উঠ্‌তে পারে না; যেটা উপাদান, সেইটেই আসল বস্তুর মত মূল্যবান হয়ে ওঠে। বৈরাগ্য-যুক্ত আনন্দ-সাধক বা সত্য-সুন্দরের সাধককে তারা হৃদয়হীন সৌন্দর্য্য-মূঢ় শিল্পীমাত্র ব'লে ধিক্কার দেয়—তারা সাধারণ মানুষের মনোভূমিতে বিচরণ করে। এইখানে তুমি হয় ত' ব'লবে, মানুষের প্রকৃতির প্রভেদ আছে, সকলের প্রাণ সমান নয়। সেটা ভুল,—ওটা প্রকৃতির প্রভেদ নয়, একই মানুষের একই প্রকৃতির উচ্চ-নীচ অবস্থা মাত্র—সব মানুষ সমক্ষেত্রবাসী নয়। সুখ-দুঃখের ভেদ নেই, কারণ সে ক্ষেত্রে সব মানুষই সমান—বরং এই সুখ-দুঃখের ক্ষেত্রেই মানুষের সাধারণ প্রকৃতিটি খুব ভালো করে' বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এসব ত' তুমি বুঝতে পারছো ব'লে আমার মনে হয় না—তা' হোক, কিছু-কিছু তোমার মনে ধরেছে নিশ্চয়ই! তাই হলেই হবে; ক্রমে এসব কথা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ব্যথা আছে অথচ ব্যথার বিষ নেই—এই কথাটা একটা গল্প দিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিলে সব চেয়ে ভাল হয়, কিন্তু সে কি আমি পারবো? তুই যে জেরা করিস!—তা'তে আমি আবার গল্প বলায় ওস্তাদ মোটেই নই।"

"না বাবা, আমি কিছু বলব না, তুমি বল না?"

"আজ থাক, অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমার মা আবার রাগ করবেন, এরি মধ্যে দু'বার তিনি উঁকি দিয়ে গেছেন। আর তোমারও কাল খুব সকালে উঠতে হবে, মনে আছে ত?—আঁকগুলো বুঝিয়ে নেবে, আমার ত' আর সময় হবে না। না, অমন করে থেকো না। বলছি ত', বল্‌ব 'খন! যে এত অধীর হয়, এখনও এত ছেলেমানুষ—আমার সে গল্প বল্লেও ত' সে বুঝ্‌তে পারবে না।"

"হাঁ, খুব পার্‌বো! পরশু আমার বেশী-কিছু টাস্ক্‌ নেই, কাল সন্ধ্যের সময় তোমার কাছে ওই গল্পটা শুনব, বাবা!"—বলিয়াই মিনা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। হরিনাথবাবু আবার তাঁহার বইখানা তুলিয়া লইয়া আগেকার মত পড়িতে লাগিলেন।

বৈশাখ, ১৩৩০

ব্যর্থ জীবন

(কাহিনী)

যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সে দেশের মৃত্তিকা তৃণ-শ্যামল, আকাশ বৈদূর্য্য-নীল, বালসূর্য্য জবাকুসুমসঙ্কাশ, এবং পৌর্ণমাসী রজতদ্রবময়ী। যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছি তখন শঙ্খ বাজিয়াছে, এবং বিধাতাপুরুষ নামক কোন দেবতা একদিন অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শিশুর ললাট-ফলকে অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দিয়াছিলেন—প্রসূতি তখন নিদ্রামগ্না। আজ অদৃষ্টের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, স্বজনবর্গ কাঁদিতেছে; আর আমি?—প্রেতপুরুষের দেহ নাই, রক্ত নাই, তথাপি একি বিচিত্র স্পন্দন! কোথায় অদৃষ্ট? কোথায় দেবতা?—দেহী কি প্রেত অপেক্ষাও জ্ঞানী?

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে নিজের কোনও সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাই নাই। বালকের পক্ষে বিদ্যালয় যেমন, আমার পক্ষে সংসারও তেমনি বোধ হইত। জন্ম-পরিগ্রহ যদি ইচ্ছাধীন হইত, তবে আমার মত এমন ভুল বোধ হয় আর কেহই করিত না।

তথাপি এই উদাসীন হৃদয়ে একটা আসক্তি ছিল। গৃহ-প্রাঙ্গণে যখন ফুল ফুটিত, অশ্বত্থবৃক্ষের অন্তরালে পূর্ণিমার চাঁদ অতিশয় বৃহৎ দেখাইত, বৎসরের মধ্যে প্রথম যেদিন প্রভাতে উঠিয়া আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিতাম, তখন পুলক-বিস্ময়ে ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইতাম; কিছুই বুঝিতাম না, তবু অসাড় হৃদয়ে সাড়া জাগিত। এমনি করিয়া শৈশব কৈশোর কাটিয়া গেল। অকারণে হাসিয়াছি, এবং অকারণে কাঁদিয়াছি; আবার যখন কাঁদিবার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে তখন অশ্রুবর্ষণ করি নাই। শৈশব-সহচর ভাইটি যখন মুমূর্ষু, তখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গিয়াছি। প্রথম যেদিন ব্যথা অনুভব করিলাম, সেদিনের কথা মনে আছে। সন্ধ্যার সময়ে মাঠের উপর দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম, দেখিলাম একটি বালক পথ হারাইয়া অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিতেছে। হঠাৎ মনে হইল, সে যেন আমারই ভাই—বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, ক্রন্দনাবেগে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম,

কিন্তু নিকটে গিয়া তাহার অশ্রু মুছাইতে পারিলাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছ, দেহের আবরণ আমার শীতল আত্মাকে উষ্ণ করিতে পারে নাই। আমার কোনও বন্ধু ছিল না, মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে নাই। পৃথিবীর মায়া আমার পক্ষে বিফল হইয়া যাইত, কেবল যে শুভলগ্নে তাহা সফল হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই লগ্নেই আমার জীবনান্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু সে কথা পরে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন চিন্তাশক্তি বাড়িয়াছে, তখন একটা বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়াছি—সে আমারই হৃদয়। বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে আসক্তিকে প্রেম বলে তাহা আমার মধ্যে নাই। জননীর স্নেহ আমাকে বশ করে নাই, বন্ধু-প্রীতি আমাকে মুগ্ধ করে নাই, ভ্রাতৃ-প্রেম আমাকে সুখী করে নাই। কিন্তু স্বার্থও আমার ছিল না—যে-স্বার্থ হইতে আসক্তির জন্ম হয়, সেই স্বার্থ ই ছিল না। স্বার্থের কোনও অর্থ বুঝিতাম না—স্নেহ প্রেম যাহা দাবী করে তাহা অর্থশূন্য, এমন কি লজ্জাকর মনে হইত। তথাপি ইহা বুঝিয়াছিলাম যে, মনুষ্য-জীবনে এই স্বার্থ ই প্রধান শক্তি—এই স্বার্থ ই প্রেম। প্রেমের দুই রূপ আছে, আত্ম-প্রেম ও পর-প্রেম; এই দুইরূপের একটিও না থাকিলে জীবন-চক্র অচল। দুই-ই অভাব-জনিত। যে কিছুই চায় না, সংসার তাহাকে চাহিবে কেন? মানুষ আমাকে দেখিয়া হাসিত, আমিও মানুষকে দেখিয়া হাসিতাম।

কিন্তু প্রেম যাহার নাই, তাহার কর্ম্ম-প্রবৃত্তিই থাক না, সে কেবল চিন্তাপ্রবণ হইয়া পড়ে। আশা নাই, উদ্দেশ্য নাই,—সুতরাং নৈরাশ্যও নাই। দিনের পর দিন কাটিয়া যায়—জীবনটা কতকগুলি দিনের সমষ্টি মাত্র হইয়া দাঁড়ায়, এক দিনের সঙ্গে অন্য দিনের কোনও যোগ থাকে না। অথচ প্রতিদিন নব নব চিন্তায় মন ব্যাপৃত থাকে; তাই কাল চিরদিনই—বর্ত্তমান, এবং অতীত-ভবিষ্যৎ লোপ পাইয়া জীবন নিরবচ্ছিন্ন মোহময় হইয়া উঠে। হৃদয়ের কেবল একটা বৃত্তিই ছিল—সুন্দর দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দ বোধ করা। মনে হইত, আর সকলই মিথ্যা, এই সৌন্দর্য্যের অনুভূতিই একমাত্র সত্য। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যাহার ক্ষণ-পরিচয় লাভ করিতাম তাহা পৃথিবী হইতে অনেক দূরে। সৌন্দর্য্য আমার প্রাণে যে কামনা জাগাইত, এই পৃথিবী তাহা পূরণ করিতে পারিত না, তাই তাহাকে এত ভালো লাগিত।

জ্যোৎস্নাময়ী নিদাঘ-শর্ব্বরী আমার মনোহরণ করিত। ছায়ার মত আলোক, তাহাতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা অপেক্ষা অপ্রকাশ থাকে অধিক—মহা-সৌন্দর্য্যের

একটি প্রান্তমাত্র যেন পৃথিবীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার সমস্তটাই আকাশের ওপারে। সে যেন একটি স্বপ্ন, ঘুমন্ত পৃথিবীর আঁখি-পল্লবে সৌন্দর্য্য-দেবতার চুম্বনের মত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আমি সেই স্বপ্নের অংশ পাইতে চেষ্টা করিতাম, সমস্তই রহস্যময় হইয়া উঠিত। নিথর নিশ্চল তরুপল্লবে রহিয়া রহিয়া বায়ুমর্ম্মর জাগিত; বৃহৎ প্রাচীন দেবমন্দির আলো-অন্ধকারে আরও বিরাট্-গম্ভীর দেখাইত; আমার চক্ষু স্বপ্নাবেশে মুদ্রিত হইয়া আসিত। তখন মনে হইত, আমি যেন আমার এই দেহ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির পরীরাজ্যে বিচরণ করিতেছি। ঘন লতাগুল্মের অন্তরালে আমি যেন জোনাকী হইয়াছি, প্রত্যেক হৃদ্‌স্পন্দনে দেহটি আলোকিত হইতেছে। কখনও বা পত্রাবলীর ছিদ্রাবকাশে চন্দ্ররশ্মি হইয়া কোনও গহন-গূঢ় পুষ্পমুকুলকে চুম্বন করিতেছি, তাহার অন্তর মধুময় এবং অঙ্গ সৌরভাকুল হইতেছে। আবার কখনও নিশ্বাসের মত অতি মৃদু বায়ু-হিল্লোল হইয়া তটতরুচ্ছায়ায় প্রসুপ্ত নদীদেহ কণ্টকিত করিতেছি; বৃক্ষশাখার পত্রান্তরালে যে একবৃন্তাবলম্বী ফল-দুইটি ঘনতর স্পর্শে আরক্ত-কপোল হইয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকে অতি স্নেহে বীজন করিতেছি; নীড়সুপ্ত পাখীর পালকের মধ্যে নিদ্রাকোমল স্পর্শ অনুভব করিতেছি। নিদাঘের জ্যোৎস্না-রাত্রি আমার মনোহরণ করিত, আমার সারাদেহে যেন শিশির-শীতল পুষ্পগুচ্ছ বুলাইয়া দিত।

জীবনে দুঃখ আছে, তেমনি সুখের স্বপ্নও আছে। মৃত্যুর পর স্বপ্ন নাই, নিদ্রাও নাই; দেখিবার কিছু নাই—তবু চক্ষু ক্লান্ত হয় না, ঢুলিয়া পড়ে না। এখানে সুখের নামে দুঃখ নাই। যদি সুখ চাও দুঃখকে বরণ কর—বারবার পৃথিবীর জন্ম-দুয়ারে আঘাত কর। সেখানে ক্ষুধা পাইলে আপনার হৃদ্‌পিণ্ড আছে, তৃষ্ণার্ত্ত হইলে চক্ষুজল আছে। কিন্তু কি বলিতেছিলাম?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষের সঙ্গে পরিচয় করি নাই, মানবীকেও আমি ভালো করিয়া দেখি নাই। ফুল, প্রজাপতি, পাখী যাহার দেখিতে ভালো লাগে, সুন্দর মুখও তাহার ভালো লাগিবে। দুইটি পূর্ণায়ত কৃষ্ণতার চক্ষু, দীর্ঘ অলক, পেলব ওষ্ঠ, সুমসৃণ স্বচ্ছ ত্বক্ যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু তাহা কামনা করি নাই। অতি সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তিও মুগ্ধ করে, কিন্তু তাহাকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয় না; কামনার বস্তু না হইলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না। সুন্দর আরও-সুন্দরের কল্পনায় বিভোর করিত; সুন্দরকে মুহূর্ত্তকাল দেখিয়া বহুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম।

ইহার পর বুঝিতে পারিলাম, যৌবন নামে জীবন-বসন্ত আসিয়াছে। প্রাণের মধ্যে অস্পষ্ট অভাব অনুভব করিতাম; হাসিয়া ভাবিতাম, জীব-ধর্ম্মের প্রধান শাসন আমাকে অধিকার করিতেছে। যৌবনারম্ভে নিঃসঙ্গ বোধ করিতাম, কিন্তু কাহারও সঙ্গ কামনা করিতাম না। কেবল, ফুলের কাছে যাহাকে অধিক মানায়, যাহার প্রতি অঙ্গের গতি ও ভঙ্গিতে ছন্দের মত একটা সামঞ্জস্য আছে, যাহার অশ্রু পুষ্পপাত্রে শিশিরের মত, হাসি নবকিসলয়-পাটল বনশ্রীর ন্যায়—সেই রমণীর দিকে এক-একবার চোরের মত চাহিয়া দেখিতাম, আপনার মূঢ়তায় আপনি বিস্মিত হইতাম। মনে হইত, নারী-সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা প্রবঞ্চনা আছে—মুগ্ধ হইতে হয় সত্য, তবু সে মোহ। যদিও বাহুবল্লরীর প্রশংসা করিতাম, তথাপি অপাঙ্গের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিতাম না; সুবঙ্কিম ভ্রূ-রেখা, সুদীর্ঘ নয়ন-কোণ, নাসা ও ওষ্ঠের নিখুঁত ভঙ্গিমা আমি আঁকিয়া দেখিতে ভালোবাসিতাম।

এই যে কামনার প্রথম উন্মেষ, ভয় ইহাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমি যে আনন্দ পাইয়াছি, নারী-সৌন্দর্য্যে তাহা পাই নাই। ফুলের বর্ণ, সৌরভ ও পেলবতা যে আনন্দ দেয় তাহাতে চিন্তা ও কল্পনার প্রসার হয়; সে সৌন্দর্য্য জড়, জীবনহীন; তাই জীবনের উপর তাহার প্রভাব নাই। তথাপি নারী-দেহের চিত্র বা মূর্ত্তি-সৌন্দর্য্য আমি উপভোগ করিয়াছি। মেঘাবলিবেষ্টিত পঞ্চমীর চাঁদের মত কুঞ্চিতকুন্তলশোভি মসৃণ ললাট নির্দ্দোষ-সুন্দর; অতি সূক্ষ্ম বসনের মধ্যে ফুলবেষ্টিত কবরীও সরল উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু কালো চোখের তীব্র আলোক অথবা প্রবাল-অধরের মুক্তাময় স্মিত-হাস্য আসক্তিহীন উপভোগের বস্তু নহে। সে আলোকের অল্প উত্তাপেই হৃদয়ের মধুখবর্ত্তি গলিয়া যায়, সে হাসির যাদুমন্ত্রে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সকলই বিস্মৃত হইয়া মায়াবিনীর মোহজালের মধ্যে স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরিতে হয়। সকল সৌন্দর্য্য হইতে এ সৌন্দর্য্য ভিন্ন। সাগর-বেলায় সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যা, নব-প্রভাতের অরুণালোকে হৈম-মুকুট হিমবান, কলহাস্য-কৌতুকময়ী গিরি-নির্ঝরিণী, শুক্লরাত্রে তারা-খচিত আকাশতলে তন্দ্রামগ্ন বনস্পতি, নদীজলে তটতরুর স্পন্দহীন প্রতিবিম্ব—এ সকল দেখিয়া চঞ্চল হই নাই। কিন্তু যেদিন পথিপার্শ্বে, অতি তীব্র, অতি মধুর হাসির শব্দে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মীর মত তরুণীযুগল অর্দ্ধসমাপ্ত বকুলের মালা হাতে লইয়া পরস্পরের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেছে, নির্জ্জন-নিভৃতে পথিকের পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া মাথার উপরে অতি নিপুণ বাহুবিক্ষেপসহকারে

অঞ্চল টানিয়া কৌতুক-কটাক্ষ অবগুণ্ঠিত করিতেছে,—সেদিন বুকের মধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছিল বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু একথা মনে আছে, সেদিন গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত ফুলদল কেবল দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্ত হই নাই; সেগুলিকে তুলিয়া সন্ধ্যালোকে মালা গাঁথিয়াছি, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ তাহাকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াছি। যখন সন্ধ্যা গভীর হইয়া রাত্রি আসিল, দূরে মাঠের প্রান্তে নদীজল আর রৌপ্যরেখার মত ঝিকঝিক করিল না, গাছ-পাতার উপরে একটা সম্মোহন আসিল, পাখীর পালক-ঝাড়ার শব্দ নীরব হইল, এবং মাথার উপরে আকাশের তারাগুলি যেন আমাকেই লক্ষ্য করিয়া রহস্যভরে চোখ টিপিতে লাগিল, তখন ক্রমে আমিও একটা অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল, তারাগুলি বকুলফুলের মত; আর, অন্ধকার প্রমোদ-হাস্যময়ী দিগ্বধূর মুখাবগুণ্ঠন। সে গুণ্ঠন আমার চক্ষে আর উঠিল না, স্বপ্নে ও তন্দ্রায় রাত্রি শেষ হইয়া আসিল।

কিন্তু রজনী-শেষে আকাশ-প্রান্তে যে পাণ্ডু চন্দ্রখণ্ড দেখিয়াছিলাম, আজ তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। চন্দ্র সৌন্দর্য্য-পীড়িত মানস-গ্রহ—কোন্ আসন্ন-সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে কাহার কটাক্ষ-শরে জর্জ্জরিত হইয়াছে। তাহার সমগ্র দেহ যখন আলোক-আবেগে পূর্ণ হইয়া ওঠে, তখনই তাহার ক্ষয় আরম্ভ হয়—সে যেন আমারই অদৃষ্টের চিত্র-লিপি! সেদিন তাহা বুঝি নাই।

এখন হইতে আর সৌন্দর্য্য-প্রীতি নয়, পিপাসার উদ্রেক হইল—যাহা কখনও কোনও বস্তুবিশেষে আবদ্ধ ছিল না, তাহাই একটি রমণীকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রাণমূলে বেদনার সঞ্চার করিল। যাহাকে ভয় করিতাম, তাহার জন্য ব্যথায় বিবশ হইয়া পড়িলাম। নারীসম্বন্ধে আমার ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

আমার মনে হইল, নারীর জীবন নিরতিশয় দুঃখময়। অসীম যন্ত্রণার সৃষ্টি ও তন্মধ্যে আপনি দগ্ধ হওয়া—নারীর কি ভীষণ অদৃষ্ট! অতি দুর্ব্বল, ক্ষণভঙ্গুর, ভারলেশহীন তৃণখণ্ড অকস্মাৎ যৌবন-লাবণ্যে জ্বলিয়া উঠে, আপনি ভস্ম হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-পতঙ্গের পক্ষ-পুচ্ছ দগ্ধ করিয়া দেয়। তাহার যৌবন-দীপ্তি দেখিয়া ভীত বা মোহ-মূর্চ্ছিত হইও না; সে অসহায়, অজ্ঞান—আপনার চিতা সাজাইয়া আপনি হাসিতেছে! যুগে-যুগে সে জগতের নাট্য-শালায় সৌন্দর্য্যের স্ফটিক-পাত্রে আপনার জন্য অশ্রু ও পরের জন্য হলাহল ভরিয়া দাঁড়াইয়াছে,—পুরুষের লুব্ধ ব্যগ্র হস্তের তাড়নায় মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া, অশ্রুজলের

নদী বহাইয়া, হলাহলের জ্বালা ছিটাইয়া, উন্মাদের অট্টহাস্যে অপসৃত হইয়াছে! কত রাজাধিরাজ পথের ভিখারী হয়, কত ট্রয় ধ্বংস হয়, লঙ্কা ভস্ম হয়—সে গালে হাত দিয়া ভাবে, কেন এমন হয়? সে কি করিয়াছে? সে প্রশ্নের উত্তর নাই। তাই মনে হয়, যার মুখ যত সুন্দর তার চক্ষে ও অধরোষ্ঠের ভঙ্গিমায় তত অধিক বিষাদ প্রচ্ছন্ন থাকে; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর পানে চাহিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। সৌন্দর্য্য অত্যাচারী অভিভাবকের মত তাহার হৃদয়দুয়ার জুড়িয়া বসে, আপনার কথায় তার কণ্ঠরোধ করে, তাহার মত না লইয়া তাহার জীবনের গতি নিরূপণ করে। পুরুষ নিজের মোহ ও তৃষ্ণার তাড়নায় নারীসম্বন্ধে যে ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়, সে তাহার প্রতিবাদ করিতেও পায় না, বরং বাহ্যতঃ তাহার সমর্থন করিতে বাধ্য হয়। সে না জানিয়া নানা অশান্তির সৃষ্টি করে; অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, জয়োল্লাস ও হিংসার হানাহানির মধ্যে তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারও শ্রুতিগোচর হয় না।

যখন এ চিন্তার উদয় হইল তখন বুঝিতে পারিলাম, আমার সৌন্দর্য্যধ্যান ভাঙ্গিয়াছে; কৈশোর হইতে যৌবনের প্রথম উন্মেষ পর্য্যন্ত আমার জীবনের যে একমাত্র সান্ত্বনা তাহা হইতে আমি বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে যাহার আভাস পাইয়াছিলাম, তাহার জন্য হৃদয়-বেদনা বা কোনও কামনা অনুভব করি নাই। যে-সৌন্দর্য্য দেশকালের অতীত হইয়া—কল্পলোকে জ্যোতিঃ-শতদল হইয়া বিরাজ করিতেছিল, আজ তাহাই যাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল তাহা বড় নিকট, হাত বাড়াইলে যেন তাহাকে স্পর্শ করা যায়—হৃদয় ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহিবে না! এ সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচয় ঘটিলেই মিলন-ব্যাকুলতা অবশ্যম্ভাবী। এ আকাঙ্ক্ষা জ্বরের মত আমার সর্ব্বাঙ্গ-শোণিতে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

এই লালসাই কি প্রেম? প্রেম কি সৌন্দর্য্য-পিপাসা? সে কি উপভোগের পরিবর্ত্তে ভোগের বাসনা? প্রেম-মদিরা পান করিলে বুকের ভিতরে জ্বালা করে? শরীর বিবশ হয়, আঁখি-পল্লব মুদিয়া আসে? আমি মনে মনে আমার সেই মনোহারিণীর উদ্দেশে বলিতে লাগিলাম—ওগো প্রবাসিনী স্বর্গ-কন্যা! আমি তোমাকে দেখিয়াছি। তোমার রূপ শুধুই চক্ষে নয়—আমার হৃদয়ের রক্ত-সরোবরে তাহার ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ আলোকরশ্মির মত তোমার নেত্রপল্লবের ওই পক্ষ্মরাজি, এবং তাহারই অন্তরালে যে কটাক্ষ-বহ্নি

লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার মোহিনী মায়ায় আমি আত্মহারা হইয়াছি। আমি আমার সকল জীবন, জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি, তত্ত্বজ্ঞান-জনিত পরমানন্দ—সকলই ভগবান্ অথবা সয়তানের হাতে ছাড়িয়া দিব, তুমি প্রসন্ন হও! ওই অন্ধকার কেশরাশিতে আমাকে আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে অন্ধ করিয়া দাও, আমার দুই চক্ষের জ্বর-জ্বালা নির্ব্বাপিত কর!—সারা দেহ হইতে বিদ্যুন্ময়ী জীবনী-শক্তি শোষণ করিয়া আমার হৃৎপিণ্ড শীতল করিয়া দাও। আমি আমাকে তোমার দুই বাহুর যূপ-বন্ধনে সমর্পণ করিতেছি, তুমি এ বলি গ্রহণ কর! তোমার ওই কজ্জলিত নয়ন-কোণ হইতে বিদ্যুৎ-বিকাশের সহিত বারিবর্ষণ কর; তোমার রূপের মধ্যাহ্ন-দীপ্তি আমাকে জ্বর-তপ্ত করিয়াছে—অশ্রুময়ী বর্ষাসুন্দরীর রূপে তুমি আমার প্রাণে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার কর! আমি ওই রূপ চাই, কিন্তু ধবল মরুবালু-বিচ্ছুরিত ওই তীব্র প্রভা চাই না; অধরে কুঙ্কুম ভাঙ্গিও—ক্ষতি নাই, কিন্তু নয়ন-পল্লবে শিশিরচ্ছলে দুই ফোঁটা অশ্রু লাগিয়া থাক্!

আবার, কখনও কল্পনায় প্রেমের রাজ্যে বাস করিতাম। মনে করিতাম, সে আমাকে ভালবাসে বলিয়াই মুগ্ধ করিতে চায়; নিজ-হৃদয়ের সহিত মিলাইবার জন্যই আমার হৃদয় দ্রবীভূত করে। সৌন্দর্য্য ও প্রেম, এ উভয়ের পরস্পর কি সম্বন্ধ, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম—বুঝিতে পারিতাম না। সৌন্দর্য্য কি প্রেমেরই পূজা-পুষ্প, না প্রেমই সৌন্দর্য্যের বন্দনা-গান? আমার মনে হইত, চারিদিকে বাঁশী বাজিতেছে, সন্ধ্যাকাশে আবীর-রাগ, পৃথিবী ফুলে ফুলময়। প্রেম-নগরে চাঁদের হাট বসিয়াছে, মানব-মানবীর দৃষ্টি নক্ষত্র-শ্রেণীর মত স্বপ্নময়; রূপরসগন্ধ-স্পর্শের ঐকতান-রাগিণী প্রাণ-বীণের সকল তন্ত্রী আহত করিতেছে! সে রাজ্যে দুঃখ নাই, সেখানে কেহ কাঁদে না, সেখানে কিছুই অসুন্দর নহে। আমার প্রিয়তমা সন্ধ্যালক্ষ্মীর মত, লঘুমেঘস্তরে চরণ বিন্যস্ত করিয়া, দুই করপল্লবে কবরী হইতে ফুলহার ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে; তাহার মুখের উপর নবোদিত শশিকলার অস্ফুট জ্যোৎস্না, আঁখি মদিরালস, অধরে হাসি ঘুমাইতেছে। আমি যেন নির্নিমেষ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছি, সে মুখ-চুম্বন সারা প্রাণে অনুভব করিতেছি।

কিন্তু এই জ্বর-ঘোরের স্বপ্ন বেশিদিন টিকিল না। দারুণ আঘাতে এ মোহ টুটিয়া গেল, কিন্তু হাহাকার ঘুচিল না। তখন আমার মনে হইল, ও কে? উহার মধ্যে যে প্রাণ-মন রহিয়াছে তাহার সহিত উপরকার ওই সৌন্দর্য্যের কি

সম্বন্ধ? আমি যাহা চাই তাহা যে ও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না—সে ক্ষুধা ও কেমন করিয়া মিটাইবে? ও যে ফুল-মণ্ডিত মৃৎ-পুত্তলিকা! তখন বুঝিলাম আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এ প্রেম নয়, এ সৌন্দর্য্য-পিপাসারই বিকার মাত্র। যে পিপাসা ছিল না তাহাই উদ্রিক্ত হইয়াছে, কিন্তু মিটাইবার সময় কেবল মরীচিকা—চারিদিকে জলরাশির প্রতিচ্ছায়া আছে, পান করিবার একবিন্দু নাই। বুঝিলাম প্রকৃতি আমার উপর প্রতিশোধ লইয়াছে।

এ পিপাসার একমাত্র ঔষধ প্রেম,—সে ত আমার নাই! একদিন যে দেখিয়াছিলাম, এক কাঠুরিয়া খররৌদ্রে অতিমাত্র অবসন্ন হইয়াও তাহার সহকর্ম্মিণী চীরগ্রন্থি-পরিধানা মলিনা পত্নীর মুখে চাহিয়া ললাট হইতে প্রফুল্লমুখে স্বেদবিন্দু মুছিতেছে, তাহার মর্ম্ম আজ জ্বালার মত অনুভব করিলাম। সেও সুখী, এই সৌন্দর্য্য-স্বপ্নাতুর হতভাগ্য তাহার পদধূলির যোগ্য নয়।

ইহার পর আর অধিক কথা নাই, আমার জীবনের ইতিহাস শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি নিজের মধ্যে নিজে শুকাইয়া গিয়াছি। প্রেমকে জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না, সে স্বভাবজ; যাহার প্রেম নাই তাহার পক্ষে এই জ্ঞানও অভিশাপ। শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে অবশিষ্ট কয়দিন কাটিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি ক্ষয়রোগে কঙ্কালসার হইয়াছিলাম।

একদিন শীতের শেষে হঠাৎ দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আমি অতি শীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বড়ই অস্থিরতা বোধ করিতেছিলাম। ঘরের সকল জানালা দুয়ার খুলিয়া দিতে বলিলাম। আকাশ বড় পরিষ্কার, বাহিরের গাছগুলির মধ্যে পাতার সর-সর মর-মর শব্দ হইতেছিল। এমন সময়ে আকাশপ্রান্তে চতুর্দ্দশীর চাঁদ হাসিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, আমার শরীরের সকল রক্ত যেন গণ্ডে-ওষ্ঠে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে কতকাল দেখি নাই, তাহার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ যেন সে-ই আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু এ যে বিদায়ের দিন—এত হাসি কেন? হায় স্বৈরিণি! তুমি তোমার ওই ভুবন-মোহিনী হাসির ছটায় দশদিক্ আলো করিয়া আকাশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে—তোমার কি? আমি মরিয়া যাইব, আমার মত অনেক আছে—তোমার কি? মানুষের জীবন ব্যর্থ হইতে পারে, তোমার রূপ ব্যর্থ হইবার নয়। আমার দুই চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন আমার একটি অপূর্ব্ব কবি-কাহিনী মনে পড়িল। এক সর্পিণী যাদুমন্ত্রে এক

যুবককে ভুলাইয়াছিল, তাহার চক্ষে সে অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী। তাহার কুণ্ডলীকৃত নাগ-দেহের শীতল বেষ্টন যুবকের দেহে সুকোমল বাহুবেষ্টন বলিয়া বোধ হইত, তাহার গরল-শ্বাসে সে রোমাঞ্চ-কলেবর হইত। একদিন যুবকের গুরু আসিয়া মন্ত্রবলে তাহার মোহ ভাঙ্গিয়া দিলেন—মায়াবিনী সর্পিণী অন্তর্দ্ধান করিল, যুবক তাহার স্বরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু বহু পূর্ব্বেই বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাই মোহভঙ্গেও সে আর বাঁচিল না। হায়, আজ নিজ-জীবনে এ রূপকের অর্থ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলাম। যে সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মধ্যে আমার প্রেমহীন হৃদয় আশ্রয় লইয়াছিল, সেই ধ্যানই তৃষ্ণার আকার ধারণ করিয়া আমাকে রূপ-মরুভূমিতে আনিয়া ফেলিয়াছে। জীবনকে আমি ছলনা করিয়াছিলাম; আমি জীবন-যাত্রার একমাত্র পাথেয় যে প্রেম, তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই; সৌন্দর্য্যের ধূলিমুষ্টি লইয়া জীবন-বিপণির বিকিকিনি চলে না। আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছি, মিথ্যাবাদী বঞ্চকের মত, লাঞ্ছিত কুক্কুরের মত, আমি জীবন-যজ্ঞশালার এক প্রান্ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি।

ক্ষণিক উত্তেজনার পর আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ক্রমে যেন ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া গেলাম। তারপর গভীর সুষুপ্তি হইতে যেন ক্রমশঃ ভিতরে ভিতরেই জাগিয়া উঠিতে লাগিলাম। কত স্বপ্ন—কত দৃশ্য! তারপর ধরণী মুছিয়া গেল; আলো নাই, শব্দ নাই, আমি যেন বায়ুশূন্য মহাব্যোমে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছি। তখনও মনে হইতেছিল, ইহা স্বপ্ন; সুষুপ্তি হইতে জাগরণে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এ সুষুপ্তি আর ঘুচিল না। এই মৃত্যু! চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারকা নাই, আলোক নাই, বর্ণ নাই, শব্দ নাই—অন্ধকারও নাই। তবু চেতনা আছে, স্মৃতি আছে, কামনার অনুশোচনা আছে। ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতির রেশ রহিয়াছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই; কিন্তু মন রহিয়াছে, মনের উপর তাহাদের দুরপনেয় কলঙ্কচিহ্ন রহিয়াছে। এই মনোদেহ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না? আমার মনে হয়, আমি যেন গর্ভস্থ ভ্রূণের মত বাস করিতেছি। এই কলঙ্ক-রেখা মুছিয়া গেলে আবার কোন নূতন অদৃষ্ট লইয়া জন্ম গ্রহণ করিব।

জন্ম-মৃত্যুর এই নেপথ্য হইতে গত-জন্মের কথা তোমাদিগকে শুনাইলাম। আমার কাহিনীতে আমার আর প্রয়োজন নাই, জীবনের অনুশোচনা মরণে বেশিদিন রহিবে না। পৃথিবীর জীবন-রঙ্গমঞ্চে আমাকে যে অভিনয় করিতে

হইয়াছে, আজ তাহাকে আর এক চক্ষে দেখিতেছি। তথাপি জীবদ্দশার সেই অনুশোচনা এবং তাহার রেশ বিলীয়মান স্মৃতি-চক্রবালে অস্ফুট আলোক-রেখার মত এখনও জাগিয়া রহিয়াছে; এখনও যাহারা জীবন-রঙ্গমঞ্চে আমার মতই অদৃষ্টের ক্রীড়নক, তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে। তাই আমার কথা তাহা-দিগকে শুনাইলাম। কিন্তু শুনিবে কি? আমার আর সে ভাষা নাই; মৃত্যু-সাগরে জীবন-স্রোত আসিয়া মিলিয়াছে, প্রাণের সে কলধ্বনি আর নাই। এ কাহিনীতে তপ্ত রক্তের স্পন্দন নাই, এ বর্ণনায় সৌন্দর্য্যের সেই বর্ণ-বৈভব নাই। সকল সৌন্দর্য্য এ-পারে আসিবার কালে নাবিকের হাতে পণ-স্বরূপ দিয়া আসিতে হয়,—সে সধবার সিন্দুর, বিধবাকে সাজে না। তাই মনে হয়, আমার এ আকিঞ্চন বৃথা, জীবিতের কানে মৃতের কথা কোনও কালে কখনও পৌঁছিবে না।

১৩২৪

আমি

(১)

আমি বিরাট্। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্ত-সীমন্তের সিন্দূরচ্ছটা, সূর্য্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট-চন্দন।

বায়ু আমার শ্বাস, আলোক আমার হাস্য-জ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষা-শক্তি; মৃত্তিকা আমার হৃৎপিণ্ড, কাল আমার মন, জীব আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরু-তারকার মত অচপল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যূষের শিশিরকণা আমার মুখ-মুকুর, সাগরগর্ভের শুক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান, পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত; অশ্বত্থবীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে আমারই রসপ্রবাহ, ধূলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্য্যাস্ত-শেষ প্রায়ান্ধকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তর-উষার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ,—অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্ন-বিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, বিদীর্ণহৃদয় পিতৃরোষ। আমি ভীষণ,—রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নি-বমনের মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত, অখণ্ডনীয় প্রাক্তনের মত। দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে; যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমারই জিহ্বা লক্‌লক্ করিতেছে। আমিই মহামারী। রুধিরাক্তকৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃতজনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবে।

আমি মধুর,—জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী

বিবাহধূম্রারুণলোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মত; যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। আমি ম্যাডনা—বক্ষে নিমীলিতনয়ন স্তনন্ধয় শিশু; আমি সাবিত্রী—অঙ্কে মৃতপতি; আমি বিদর্ভরাজ-তনয়ার প্রণয়দূত হংস; আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়নসলিলার্দ্র-তন্ত্রী বীণা। আমি স্বামীর সহিত স্বপত্নীর মিলনে স্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতি-পরিত্যক্তা "ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগ"-বচনা জানকী। সান্ধ্য-আকাশের মেঘস্তরে আমার বসনাঞ্চল ঘুরিয়া যায়, উষার আরক্ত কপোলে আমারই লজ্জারাগ; আমি করুণার অশ্রুজল, প্রেমের আত্মত্যাগ, স্নেহের পরাজয়। আমার নত-নেত্রের কিরণ-সম্পাতে রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আমারই সুগোপন নিঃশব্দপদসঞ্চারে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে; আমিই সুখস্বপ্নের নয়নপল্লবে মৃণাল-বর্ত্তিকায় স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দিই; আমি হৃদয়-সীমায় চুম্বনের মত জাগিয়া উঠি এবং নেত্রপ্রান্তে অশ্রুর মত ঝরিয়া যাই।

আমি আনন্দ,—শরৎ-প্রভাতের স্বর্ণালোক; পত্রপুষ্পে ওষধিলতায় সে আনন্দ শিহরিয়া উঠিতেছে। আমি শনির উপরে বৃহস্পতি, শয়তানের পার্শ্বে জেহোবা, আহ্রিমান-শত্রু ওরমজদ, মারবিজয়ী নির্ব্বাণ-দেবতা। আমি শ্মশানকূলবাহিনী জাহ্নবী, নিশীথ-অন্ধকারে প্রস্ফুটিত ফুলদল, অসহায় ক্রন্দনের উপাসনা। আমি ধ্বান্তারি হিরণ্যজোতি, গিরিশিলার কলনির্ঝরিণী, ধূসর-মৃত্তিকার শ্যাম-রোমাঞ্চ। ধরণী ষড়ঋতুর নৃত্যচক্রে কখনও অবশ, কখনও অশ্রুপ্লাবিত, কখনও হিন্দোলোৎসবে মাতিয়া উঠিতেছে—নিখিলের অশ্রুশিশির আমারই হাস্যকিরণে অরুণায়মান।

আমি রহস্যময়, আমি দুর্জ্জ্ঞেয়। অন্ধকার চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে, ঊর্দ্ধে আকাশ ও নিম্নে জলস্থল আমার সত্তায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। দিগন্তে মৃত্যুর চক্রনেমি—সুষুপ্তির রাজ্য। আকাশে অমৃত-আলোকের দীপালি-উৎসব, পৃথিবী-পৃষ্ঠে জীবন-মরণের আলো-ছায়া। আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার; আমি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণশিখা, আমিই অনির্ব্বাণ স্থিররশ্মি। আমি বৈতরণীর নাবিক; স্বচ্ছ অন্ধকারে রজতচিক্কণ খরস্রোতে আমার প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাইবে, জ্যোৎস্নালোকে আমার মুখ গুণ্ঠনাবৃত।

আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন; অস্তির মধ্যে আমি নাস্তি। আমিই বিশ্বচিত্র, আমিই তাহার চিত্রকর। আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা। আমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতেছি। আমি অমৃত-

আস্বাদনের জন্য বিষপান করিয়াছি, জীবনের জন্য মৃত্যু, এবং ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি বিধান করিয়াছি। ভোগের জন্য আমি এক হইতে বহু হইয়াছি; পূজা লইবার জন্য আপনি আপনার পূজারী হইয়াছি; পরমানন্দের জন্য দুঃখানুভূতি এবং সত্যের জন্য মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি। এই গ্রহ-উপগ্রহময় বিশ্বরচনা আমার কন্দুকক্রীড়া। আমি জড়জগতের আকর্ষণশক্তি, প্রাণী-জগতের ক্ষুধা, এবং মানব-জগতের প্রেম। পরমাণুর বিবাহে বিশ্ব-সৃষ্টি হইয়াছে—আমি সেই বিবাহে প্রজাপতি, আমি স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মা। আমি মানবহৃদয়ে প্রেম—মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব। দয়িতের জন্য, প্রিয়তমের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, সন্তানের জন্য মাতৃরূপার প্রাণত্যাগ, নবীনের জন্য পুরাতনের উচ্ছেদ—আমি সেই মধুর মৃত্যু, সেই মহাপ্রেমিক, মহাকাল। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু; আমিই আবার অমৃত; আমিই সুখ, আমিই দুঃখ, আমিই আবার আনন্দ; আমিই ষড়রিপু, আমিই আবার প্রেম।

(২)

আমি মৃৎপুত্তল, ধরণী আমার প্রসূতি, পশু আমার সহোদর। ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-মালিনী নিশীথিনী, নিম্নে অযুততরঙ্গ-কোলাহলবিক্ষুব্ধ মহাসাগর—আমি বাতাহতপক্ষ বিহঙ্গ। আকাশে সুবর্ণচূর্ণমুষ্টি ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সে দিকে চাহিলে নিদ্রালস চক্ষু ঢুলিয়া পড়ে; নিম্নে গভীর বজ্রনাদী সাগরগর্জ্জনে কর্ণ বধির হয় এবং ঝটিকান্দোলিত পক্ষদুইটি ব্যথার ভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী শ্যামল, আকাশ নীল ও রৌদ্র হিরণ্ময়—আমি সদ্যোদ্গতপক্ষ পতঙ্গ। পত্রপুষ্প দুলিতে থাকে, বায়ু মধুময় বোধ হয়, এবং বসন্তদিনের কুসুম-সঙ্গীত চিত্ত-হরণ করে; কিন্তু আসন্নসন্ধ্যার তিমিরাবরণে যখন সকলই ঢাকিয়া যাইবে, তখন হিমসিক্ত পক্ষদুইটি বায়ুভরে আর কাঁপিবে না।

পৃথিবীর পুষ্পবীথিকায় আমার হাসি-অশ্রুর মেলা। রজনীর হিমকণা আমার বক্ষ ও আনন অভিষিক্ত করে, কখনো তাহা হইতেই সৌরভের সঞ্চার হয়; তখন মর্ত্ত্যের বায়ুমণ্ডল একটি প্রদোষ বা একটি প্রভাত ব্যাপিয়া আমোদিত হইয়া থাকে। শুক্লাযামিনীর কৌমুদী-কিরণ ও শারদ-প্রভাতের অরুণিমা যখন হৃদয়ের সহস্রদলকে পূর্ণবিকশিত করে, যখন পাখী পঞ্চমে গায়িতে থাকে, বসন্ত-বায়ুর আতপ্ত শ্বাসে নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যায়, তখনই অসহ্য পুলকে ঝরিয়া যাই—নিম্নে ধূলিতলে কি অপূর্ব্ব সমাধি-শয়ন! আবার কখনো প্রবল বাত্যা, অশনিসম্পাত ও

করকাবৃষ্টি,—অর্দ্ধমুকুলিত পুষ্পজীবন ছিন্নবৃন্ত হইয়া যায়, কালরাত্রির অন্ধকারে অকালে হারাইয়া যাই।

আমি সৃষ্টি-গ্রন্থের প্রহেলিকা। আমার হাসি ক্রন্দনের ন্যায় শোকোদ্দীপক, এবং ক্রন্দন হাসির ন্যায় চিত্তহারী। আমি নক্ষত্রলোকের গান গাই, সমগ্র বিশ্বরচনা আমার মানসপটে প্রতিবিম্বিত; আমি নূতন কল্পলোক সৃজন করিতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে কঙ্কর-কণ্টকে আমার পদতল রক্তাক্ত, পবনতাড়িত ধূলিজালে আমি অন্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি আমমাংসভোজী। আমি মৃত্যু-জলধির উপরে শয়ন করিয়া অমৃত-ইন্দুর স্বপ্ন দেখিতেছি; কিন্তু কোথায় আকাশের স্থিররশ্মি নক্ষত্রমালা, কোথায় আমার গৃহকোণের তৈলনিষেকপুষ্ট বায়ুবিকম্পিত ধূলিমলিন দীপশিখা! আমি তাহারই আলোকে ছায়া-ধরাধরি করিতেছি।

আমি দুর্ব্বল, অসহায়। আমার তনুযষ্টি মাধবী-মদিরায় ঘুরিয়া পড়ে, অসহ্য শীতবাতে আমার হস্তপদ যূপবদ্ধ পশুর মত কাঁপিতে থাকে। কিন্তু আমার হৃদয়তলে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহাও নির্ব্বাপিত হয় না—সে অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত ভস্মসাৎ হইয়া যাই; আপনার হৃদ্‌পিণ্ড আপনি ছিঁড়িয়া ফেলি, আকাশে দেবতা হাসিয়া উঠে! আমি খধূপের মত ঊর্দ্ধে উঠিতে যাই, কিন্তু ভস্মাবশেষ হইয়া ধূলিচুম্বন করি। আমি কালস্রোতে অম্বুবিম্ব, প্রবল ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে তৃণখণ্ড, স্রোতোবেগকম্পিত বেতসলতা।

আমি কখনো তন্দ্রাতুর—স্বপ্নবিলাসী, কখনো কর্ম্মবীর্য্যের অবতার। কখনো নিদ্রোত্থিত সিংহের মত জীবন-বাগুরার গ্রন্থি-ছেদনের নিষ্ফল প্রয়াস করিয়া আপনার অহঙ্কারে আপনি মত্ত হইয়া উঠি, শেষে মৃত্যু-নিষাদের অব্যর্থশরে আহত হইয়া ক্লিষ্টজীবন বিসর্জ্জন করি। কখনো স্থির নির্ব্বিকার হইয়া মনোরাজ্যে অধিষ্ঠান করি; তখন সোমসূর্য্য, লোকলোকান্তর, গ্রহ-উপগ্রহ কিছুই আমার মনোরথের অনধিগম্য নয়; তখন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশল ভেদ করিতে পারি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথিয়া যাই।

আমি মূর্খ, আমি নির্ব্বোধ! বৃথা-বুদ্ধির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সরল আনন্দ ও সহজ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। পুষ্পমুকুল যে সৌরভ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহার পুষ্পজীবন কাটিয়া যায়; একটু আলোক, একটু বায়ুবীজন ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। পাখী তাহার বসন্ত-গীত শেষ হইলে কোথায় চলিয়া যায়, আর দেখিতে পাওয়া যায় না; সুপক্ক নিটোল স্বর্ণাভ ফল, নীল আকাশতলে

পক্ষমুক্ত করিয়া সন্তরণ, দু'টি গান ও সরসীজলে পুচ্ছসংস্কার—সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু আমি ভোগের অনন্ত উপকরণ কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, অতীত ও ভবিষ্যৎ-ভয় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। নিষ্ফল স্বপ্ন ও কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আমি আপনাকে আপনি বন্দী করিয়াছি। জীবন আমার জন্য শোক করিতেছে, মৃত্যু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

আমি উন্মাদ!—পর্ণকুটিরে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছি, সাগরবালুকায় গৃহরচনা করিয়াছি! আমি নিদাঘঝটিকায় তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছি—আমি ভালবাসিয়াছি। হায় উন্মাদ! ক্ষয়িতমূল নদীতটে আসন্ন আঁধারে কার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছ? ধূলি ধূলিকে আলিঙ্গন করিতেছে! মৃত্যু-পুরোহিত বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে! উহার নাম কি? প্রেম! মৃত্যুরোগের অব্যর্থ ঔষধ? একা থাকিলে মরিয়া যাইব তাই আর একজনের হাত ধরিতে হইবে? এক ভিখারী আর এক ভিখারীকে অন্ন দিবে, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইবে? বর্ষারাত্রে বজ্রবিদ্যুন্ময় আকাশতলে গৃহহারা আমি কাহাকে জড়াইয়া ধরি? যখন মস্তকের উপর কৃতান্তের শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে, তখন নিমীলিতনয়নে কাহার অধরসুধা পান করিতেছি!

কিন্তু পারি না। জ্ঞান-সত্যের লৌহকবচ এই মুহ্যমান হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই পুষ্পময় অঙ্গাবরণ পরিধান করিলে মৃত্যু-বিভীষিকা পলায়ন করে। অমৃত কি তাহা জানি না, কিন্তু যেন তাহার আভাস পাইয়াছি। জননীর পয়োধর, শিশুর অধরপুট ও প্রণয়িনীর বাহুবেষ্টন অন্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তখন ধরণীর ধূলি হইতে আকাশের পানে চাহিতে ইচ্ছা করে; অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে, সে কি মোহ—সে কি ভ্রান্তি? কিন্তু আর একজনের অশ্রু দেখিলে আমার অশ্রু শুকাইয়া যায়, আর একজনের হাসি দেখিলে মৃত্যুভয় থাকে না, আর একজনের হাত ধরিলে অনায়াসে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারি; এ মদিরা পান করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তখন কুটীরাঙ্গনে পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নালোক ব্যর্থ মনে হয় না; একটি চাহনি, একটি চুম্বন, একটু হাসি, একটু অশ্রুজল পাগল করিয়া দেয় পৃথিবী ঘুরিয়া যাক, আকাশ চন্দ্রতারকা লইয়া ছিঁড়িয়া পড়ুক, আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি তখন কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি।

আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাট্‌কে আমি ধারণা করিতে পারি। আমি মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকেই প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি ধরণীকে নবকলেবর প্রদান করে। আমি অন্ধ, কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে আমার মুখে যে আলোক আসিয়া পড়ে, তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে?

মানসী, পৌষ—১৩২১

সন্ধ্যাতারা

(কথিকা)

(১)

এই শ্যামল পৃথিবী হইতে অনেক দূরে দিগন্তপারে সাগরমেখলা প্রবালদ্বীপ আছে; তাহার বর্ণ প্রবালের মত। সেখানে পৌছিয়া সাগরোর্ম্মি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তাহার চতুঃসীমার বেলাভূমি সাগরবালুকায় আস্তৃত, তাই বালুকার পীত-আভায় কৃত্রিম প্রভাতের মত একটা আলোক ফুটিয়া উঠে।

প্রাহ্ণ ও সায়াহ্নের গোধূলি ভিন্ন সেখানে অন্য আলোক নাই। কেবল অতি-দূর দিক্‌চক্রবালে একটি স্বর্ণাভ আলোক-রেখা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া মিলাইয়া যায়; তখন সমুদ্রপার হইতে একটি গুঞ্জনধ্বনি ভাসিয়া আসে, এবং উপকূলবর্ত্তী বনবাটিকায় নবোদ্ভিন্নযৌবনা রাজকুমারীর বক্ষোবসন মৃদুসমীরণস্পর্শে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠে; তাহার নীলালকমধ্যশোভী নব-কর্ণিকার বিস্রস্ত হয়, চরণ-নূপুর গুঞ্জরিয়া উঠে।

সে দেশে কেহ কথা কহে না; কেবল কখনো বা মূক অধরোষ্ঠের প্রবাল-প্রভা ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠে, এবং মুক্তার মত সুবিন্যস্ত দশনপংক্তি ঈষৎ বিকশিত হয়; আবার কখনো বা সেই প্রবাল-আভা গণ্ডদ্বয় অনুরঞ্জিত করে, এবং সেই মুক্তাবলী নয়নবিলম্বিনী হয়।

কিন্তু আলোক বা ভাষার অভাব সেদেশে কেহ অনুভব করে না। লতাপুষ্পের বর্ণ অস্ফুট, তাহাতে কি আসে যায়? তাহার তো সৌরভ আছে। বায়ুমণ্ডল নিস্তব্ধ—শব্দ নাই, ভাষা নাই, তাহাই তো সুখকর। বাহিরের শব্দে, বাক্যের অর্থচাতুরীতে অন্তরের ধ্বনিটি ডুবিয়া যায় না।

এমনি করিয়া সেই ক্ষুদ্র দ্বীপের মুক্ত-জীবন অতিবাহিত হয়। গোধূলির দেশ অন্ধকারে পীড়া বোধ করে না; চোখে যে আলো আছে তাহাতেই প্রিয়জনকে চিনিয়া লয়, বক্ষের উপরে কান রাখিলেই তাহার হৃদ্‌স্পন্দন বুঝিতে পারে।

(২)

রাজকন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী; তাহার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনকান্তি লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রচ্ছায়পক্ষ্ম নয়নের দৃষ্টি অন্যের মত নহে—কেমন সুদূরবদ্ধ, স্বপ্নালস; তাহার কারণ, হৃদয়ের পদ্মপুট তখনো মধুরিক্ত, তাই নীরব গুঞ্জন বা অস্ফুট আলোক তাহার ভাল লাগিত না।

একদিন রাজকন্যা সমুদ্রকূলে স্বর্ণবালুকার উপরে বসিয়াছিল, তাহার পদ-প্রান্তে সাগরোর্ম্মির শুভ্র ফেনলেখা নীরব স্রগ্ধরা-ছন্দে আলিপনা আঁকিতেছিল। তখন সায়াহ্ন-গোধূলি, বালুকার উপরে শুক্তিরাজি প্রবালের আভায় ঝলমল করিতেছে; অরুণিমার অনুকারী সেই বর্ণালোক সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতে-ছিল না; কেবল একটা অজানিত কিসের পিপাসায় তাহার অর্দ্ধনিমীলিত আঁখি দূর দিগ্‌বলয়ের দিকে চাহিয়াছিল। এ যেন কার ছায়া—কাহার দেহজ্যোতির ক্ষণিক প্রতিবিম্ব! সে কে? কোন্ আকাশচারী? কোন্ দেবতা?

অকস্মাৎ সমুদ্রক্ষুব্ধিত আকাশ-সীমায় পীতচ্ছটা জাগিয়া উঠিল, অতিমৃদু-স্পর্শময় বায়ুপ্রবাহে যেন কানে কি বাজিল—তেমন ভাষা সে কখনো শোনে নাই।

রাজকুমারী বিস্ফারিতনেত্রে একটা শৈলস্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; তারপর পদাঙ্গুষ্ঠে ভর করিয়া, নেত্রপল্লব হইতে নিবিড়কৃষ্ণ চূর্ণকুন্তল সরাইয়া দিয়া, মরাল-গ্রীবা ঈষৎ উন্নমিত করিয়া একদৃষ্টে সেই দিগ্‌বলয়ের পানে চাহিয়া রহিল, পলক পড়িল না। পরক্ষণেই সেই আলোক-রেখা মিলাইয়া গেল, গোধূলির পর শুদ্ধ স্বচ্ছ অন্ধকার জলের উপর ঘনাইয়া আসিল—শ্রান্ত-ক্লান্ত সাগরোর্ম্মি নীরব বেদনায় কূলের উপরে রাজকন্যার চরণোপান্তে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

(৩)

রাজকন্যা আর গৃহে ফিরিল না। সেই যে আলোক সে আর স্বপ্ন নহে, আজ সে তাহাকে দেখিয়াছে, তাহার ভাষা শুনিয়াছে। যে-চক্ষু আলোকের পরিচয় পাইয়াছে সে যে অন্ধকারে অন্ধ হইয়া থাকিবে। সে তখন সেই বালু-শয্যায় আপনার মৃণালনিন্দিত বাহুখানির উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। তরল স্বচ্ছ অন্ধকার—তবু দৃষ্টি চলে না। সে অন্ধকারে স্বপ্নের কুহক আছে,

তপ্ত নীড়ের মত একখানি বুকের মধ্যে আঁখি লুকাইতে ইচ্ছা হয়—নিদ্রানিমগনার অধরসীমায় একটি অপরূপ তৃপ্তি হাসির মত লাগিয়া থাকে।

কিন্তু ঐ আলোক? রাজকুমারীর বক্ষ শীতল, চক্ষের আলোক-তৃষা ললাট উত্তপ্ত করিয়াছে—নিদ্রাহীন নয়নপল্লব স্বপ্নরসে আর ঢুলিবে না।

তখন তাহার মনে এক কল্পনার উদয় হইল। সেই দ্বীপের এক প্রান্তে একটি মেঘস্পর্শী পর্ব্বতচূড়া ছিল, সে উঠিয়া ধীরে ধীরে সেইদিকে চলিয়া গেল। দিনের পর দিন শিখর হইতে শিখরে আরোহণ করিল, গোধূলি যেন ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে যখন সে সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দিক্‌চক্রবালের সেই আলোক তাহার মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—ঐ দুর দিগন্তসীমায় কি অপূর্ব্ব অরুণোদয়! কিন্তু এক দুঃখ—সে বড় দূর, বড় ক্ষণস্থায়ী।

* * *

নিম্নে প্রবাল-দ্বীপ যখন গোধূলিকালে গোলাপ-রক্তিম হইয়া উঠে, শত শত হৃদয় অব্যক্ত কলগুঞ্জনে পূর্ণ হইয়া যায়, সমুদ্র আতট-উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হইয়া উঠে, এবং প্রণয়ী যখন প্রিয়জনের বক্ষে মাথা রাখিয়া তাহার মুখের দিকে মদিরালস-নেত্রে চাহিয়া থাকে,—তখন অতি-উর্দ্ধে, পর্ব্বতচূড়ায়—নিঃসঙ্গ-যৌবন তাহার সারাদেহ একখানি আঁখিতে পরিণত করিয়া ক্ষণ-দীপ্ত আলোকে স্পন্দিত হইতে থাকে।

সেই প্রবাল-দ্বীপ সন্ধ্যার দেশ, সেই রাজকন্যার নাম—সন্ধ্যাতারা।

১৩১৮

চতুঃসন্ধ্যা

(১)

শরৎ-প্রভাত। সূর্য্য এইমাত্র উঠিয়াছে, প্রকৃতির পূজাগৃহে সুবর্ণের আলিপনা; ফুলের নৈবেদ্য; মন্দপবনে ধূপগুগ্‌গুলসৌরভ। আকাশ নীল, স্বচ্ছ অম্বুদ্বেল অসীম সাগর; মধ্যে শুভ্র অভ্রদ্বীপ। এই অন্তহীন আলোকপথে দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হইয়া দুগ্ধফেননিভ মেঘগুলির উপর এলাইয়া শ্রান্তি দূর করে। পাখী উড়িয়াছে, অফুরন্ত আলোক ও বায়ুর হিল্লোলে তাহার পুচ্ছ কাঁপিতেছে। বৃক্ষপত্র শিশিরার্দ্র; অঙ্গনে শেফালিশয্যা; দিঘির জলে কুমুদকহলার; মাঠে দূরবিসর্পী হরিৎ-সুষমা।

আজ যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এ-রূপ যেন আমার দৃষ্টিকে চুম্বন করিতেছে, আমার অঙ্গে অঙ্গে আলোক-পুলক জাগিয়া উঠিতেছে। কি চন্দন-স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ! বায়ুতে আমি যেন অবগাহন করিতেছি, আমি যেন ইহা পান করিতেছি; আমি বায়ুবিহার করিতেছি। আমার ললাটে কে রাজটীকা পরাইয়াছে, এই নবাবিষ্কৃত রাজ্যের আমিই ভূপতি। শরৎ-প্রভাতের অরুণিমা আমার ললাট-কিরীট; অরণ্যানীর বিশাল বৈতালিকসম্প্রদায় আমার বন্দনাগান করিতেছে। বেণুকুঞ্জের মৃদুমর্ম্মর শুনিতে পাইতেছি—তাহারা আমাকে মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করিতেছে; জগৎ মধুময়, জীবন অনন্ত, তৃণস্তরে আনন্দের স্বর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

আমি ফুল তুলিব, উহারা বড় সুন্দর। মালা গাঁথিয়া গলায় পরিব, মস্তকের কেশগুচ্ছে চূড়া বাঁধিব। পাতাগুলি কি সবুজ! পথের ধূলিস্তর কি কোমল! রাখাল গোচারণে চলিয়াছে—কি গান গাহিতেছে! আমি শুনিব, আমি উহাকে ভালবাসিব। গাভীগুলির নেত্রপল্লব কি দীর্ঘ, কি সুন্দর গমনভঙ্গি—দেহগুলি কেমন দুলিতেছে, খুরোত্থিত ধূলিকণায় সুচিক্কণ পুচ্ছকেশ ধূসর হইয়া যাইতেছে। আমি মাঠে যাইব, হরিৎশ্যামল শস্যশীর্ষ দুই বাহু ভরিয়া আলিঙ্গন করিব। নীলরঙের ঐ পাখীটি বুক ফুলাইয়া উড়িয়া গেল, আমি উহাকে ধরিব। ফুলের

পাপড়ির মত বিচিত্রবর্ণের ও কি উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে? প্রজাপতি?—আমার হাতের উপর আসিয়া বসিবে না?

সকলই সুন্দর। আকাশ নীল, পৃথিবী শ্যামল, আলোক হিরণ্ময়। এই মধুর আলোকে, এই শ্যামলিমার উপর, ঐ নীলের মধ্যে আমি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ করিব? না, ঐ দিগন্তের শ্যাম চক্রবালে ছুটিয়া যাইব? আমি নদীর স্রোতে অন্তহীন পথে ভাসিয়া যাইব—তটতরুচ্ছায়া, আলোকহিল্লোল, সলিলাবর্ত্ত ও শীতোর্ম্মিবিক্ষেপ আমাকে বিমুগ্ধ, পুলকিত ও রোমাঞ্চিত করিবে; মুখের উপর অনন্ত নীলিমা, কর্ণে জলগীতি, অপাঙ্গে বায়ুবিকম্পিত কূলাবলম্বী কাশকুসুমের গুচ্ছ। কি মধুর!

না, আমি ঐ নীল সাগরের নীচে, ঐ শ্যামতরুর ছায়ায়, ওই কলমর্ম্মরা কেদার-বাহিনীর তটে, হরিৎ শষ্পের উপর বসিয়া শরৎ-প্রভাতের গান গাহিব।

শরৎ-প্রভাতের গান, সে কেমন? উদার, মুক্ত, আলোকময়, অস্ফুটকলগীতি-মুখর নবজীবনের গান। অতিপেলব বর্ণচিত্র, সরল পথ, সুরভি সমীর; জলতলে নবপ্রস্ফুটিত কুবলয়-মুকুলের মত অতিপবিত্র, অতি সুকুমার, অতি মোহময় আশা-দলরাজি। নবারুণ এখনও পুষ্পপুটলীন শিশিরাক্ষমালা গণিয়া লয় নাই। ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া শেফালিরা হাসিতেছে; সরল সতেজ ধান্যশীর্ষ বায়ুস্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছে; প্রসন্ন নদীজলে কি স্নিগ্ধ শান্তি—শব্দ নাই, চাঞ্চল্য নাই, কেবল মুখের উপর সদ্য-প্রতিফলিত কনক-প্রীতির অরুণ-রাগ!

(২)

বসন্তের মধ্যাহ্ন। বাতাস গন্ধভারাকুল। আম্রমুকুল মধুস্রাবী ও মক্ষিকা-সমাকুল; আকাশ গাঢ়নীল, প্রখরোজ্জ্বল। অশোক-কিংশুকের রক্তচ্ছবি, চম্পকের মদিরগন্ধ স্নায়ুসকল উত্তেজিত করে।

বনভূমির শীতল ছায়ায় শয়ন করিয়াছিলাম। উপরে পত্রপল্লবরাজির মধ্যে ক্বচিৎ বিহঙ্গকাকলি, ক্বচিৎ বায়ুমর্ম্মর। দূর দূরান্তরে ঘুঘু ডাকিতেছে। সময়ে সময়ে বহু বিহঙ্গের কলকাকলিতে অরণ্য সচকিত হইয়া উঠিতেছে। নিম্নে মৃত্তিকার উপর বিচিত্রপত্র লতাগুল্ম ও উদ্ভিদের ঘনসন্নিবেশ। আমার শিয়রে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে তাহার কণ্ঠাশ্লিষ্ট লতাবধূ নীল-পুষ্প ধারণ করিয়াছে—প্রায়ান্ধকার বনকুঞ্জে তাহারা মণির মত দীপ্তি পাইতেছে।

আমি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কি ভাবিতেছিলাম? কবে কাহাকে দেখিয়াছি, কোন্ পথে, কোন্ কুটীরপ্রাঙ্গণে, কোন্ নদীতীরে? সন্তস্নাতা; নয়নপল্লবের ঘন পক্ষ্মরাজির উপর জলবিন্দু তখনও কাঁপিতেছিল; মুক্ত-স্রস্ত আর্দ্র কেশপাশ বাহিয়া রৌদ্ররঞ্জিত বিন্দুগুলি মুক্তাফলের মত গড়াইয়া পড়িতেছিল! বর্ষার মেঘ-মেদুর অম্বরতলে সে কি বিদ্যুৎরেখার মত মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল? না, শরৎপ্রভাতে শেফালিতরুতলে পুষ্পাহরণচঞ্চল দুইখানি মোহন করপল্লব দেখিয়াছিলাম? মনে নাই। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার অধর ও নয়নের স্মৃতি আমাকে ক্ষণিক আনন্দে বিহ্বল, ও ব্যর্থজীবনের শোকে অবসন্ন করিতেছে। সারাদেহ অবশ হইয়া আসিল। স্বপ্ন দেখিলাম।

* * *

অতি ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল অকূল বারিরাশির উপর দিয়া কোন্ বেলাভূমে আসিয়াছি। সূর্য্যাস্ত-শেষ আলোকে সিকতাভূমি নির্জ্জন। সূর্য্যাস্তশেষ? না সূর্য্যোদয়ের সূচনা? অতিদূর আকাশপ্রান্তে একটা জ্যোতিঃ; তাহা কনকবর্ণও নয়, উষার আবীরচ্ছটাও নয়। যখন তীরে উঠিলাম, আমার ছায়া সাগর-বালুকার উপর অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সাগর-জলধৌত উন্নত-প্রাচীর একটি পুরী, তাহার উপবন-বাটিকায় বিচিত্রমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে; সে ধ্বনি বহুদূরে সমুদ্রবক্ষে উর্ম্মিমালায় লুটাইয়া পড়িতেছে। দূর হইতে এ স্বর শুনিয়াছিলাম; তাই ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষেপনীচালন করিয়াছি—তথাপি, সাগরের অন্তঃস্রোতই আমাকে এইখানে উত্তীর্ণ করিয়াছে।

* * *

উপবন মধ্যে শৈলগৃহ; অতি শীতল, অতি স্নিগ্ধ। বিহগকাকলি, নির্ঝর-ঝঙ্কার, নূপুর-নিক্কণ। সে গান আর শুনিতে পাইতেছি না; ইন্দ্রিয়সকল মদিরালস। আমার সম্মুখে, আমার পার্শ্বে, আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া উহারা কারা?—নৃত্যোন্মত্তা যাদুকরী পরীর দল! তাহাদের মধুকরশ্রেণীদীর্ঘ কটাক্ষ আমার উপর আরোপ করিয়াছে; তাহাদের শিথিল কবরী হইতে অতিসূক্ষ্ম বসনপ্রান্ত খসিয়া যাইতেছে; তাহাদের মর্ম্মরশুভ্র বাহুবিক্ষেপ বিদ্যুৎবিলসনের মত; তাহাদের দেহান্দোলিত সুরভি বায়ুহিল্লোলে শিহরিয়া উঠিতেছি। আমার নেত্রে পলক পড়িতেছে না; দৃষ্টি যেন মন্ত্রবদ্ধ—অনবরত অস্ফুট স্বরে গুঞ্জন করিতেছি।

কিন্তু হায়, সে কোথায়? কোন্ অভ্রংলিহ বলভিগৃহে, কোন্ মণিমাণিক্যখচিত

অলিন্দতলে মায়া-সেতার কোলে করিয়া সে বসিয়া আছে? সে কেন গান গায়? সাগরকূলবাসিনী মোহিনীর স্বরলহরী তরুণার্কের অংশুমালার ন্যায় সমুদ্র পার হইয়া জগতের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ধূলিরাশির উপর স্বর্ণমায়া বিস্তার করে। জীবন-সমুদ্রে এ পূর্ণিমার উচ্ছ্বাস কেন? নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা! উদ্বেল বারিরাশির কি উন্মত্ত হাহাকার! পদে পদে দীর্ঘ শৃঙ্খল বাজিয়া উঠিতেছে, তথাপি কি উদ্দাম গতি!

আমি সমুদ্রসৈকতে বালুশয্যায় পড়িয়া আছি। আবার সেই গান শুনিতে পাইতেছি। আমি আর চাহিব না, আর শুনিব না; আমি অন্ধ হইব, বধির হইব। ওষ্ঠপ্রান্তে কেমন করিয়া বক্ষশোণিত ছুটিয়া আসিতেছে। স্নিগ্ধ-শীতল শীকরস্পর্শে নয়নপল্লব মুদ্রিত হইয়া গেল।

(৩)

হেমন্তসন্ধ্যা। গ্রামপথ। আকাশ নীল—রক্তপীত—ক্রমে লাল হইয়া আসিতেছে; যেন জ্বরশীর্ণ তরুণ যুবার যবাঙ্কুরপাণ্ডু কপোলতল ক্ষণে ক্ষণে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে—কখনও বা দুঃসহ যাতনায় নীল হইয়া যাইতেছে। বনরাজি আসন্ন অন্ধকারে ছায়াঙ্কিত। অতি-উচ্চ তালতরুশিরে এখনো আলোর আভাস রহিয়াছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। বায়ু বহিতেছে না—বনভূমি অসাড়, নিস্পন্দ। দিবাবসান হইল, ধরণীর মুখ বিবর্ণ; আলোক-উৎসব শেষ হইয়া গেল।

দূরে ও কে আসিতেছে? না, কেহ নয়, স্বচ্ছ তরল অন্ধকারে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। শৃগাল দুইটা বনান্তরে চলিয়াছে। একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। ও কিসের শব্দ? বাতাসের শব্দ; অশ্বত্থ শাখা নড়িয়া উঠিল, একটা বৃহৎ শকুনি এই মাত্র আসিয়া বসিয়াছে,—অন্ধকারে তাহার অবয়ব আরও বৃহৎ দেখাইতেছে।

বাহিরের বায়ুস্তরের মত আমার হৃদয় শীতল হইয়া আসিতেছে। আমি এই তৃণভূমির উপর বসিব—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের অতীত হইয়া এই হেমন্ত-সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্ষণেক ডুবিয়া থাকিব। আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে, আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে, আশা এবং নৈরাশ্য তাহাদের মোহযবনিকা অপসারিত করিয়াছে, অতীত মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু হৃদ্স্পন্দন থামে নাই—এ কি নূতন অনুভাব? —ভয়! সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইতেছে। রজনীর অন্তরালে, এ অন্ধকারের পরপারে কোন্ নূতন দৃশ্যের সমাবেশ হইতেছে? সারাদিন আলোক-জ্বরে অচেতন ছিলাম,

শীতল অন্ধকারে সে প্রদাহ প্রশমিত হইয়াছে। এখন সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব করিতেছি; মস্তিষ্কের মধ্যে অসহ্য যাতনা হইতেছে। পৃথিবীর উপর আর এক পৃথিবী, জীবনের উপর আর এক জীবন ছায়াপাত করিয়াছে। অন্তহীন শূন্য, অসীম অন্ধকার, বিপুল নীরবতা ও অচৈতন্য আমাকে ভীতিবিহ্বল করিতেছে।

গোপপল্লীর গোশালা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। দুগ্ধদোহন-শব্দ থামিয়া গেল। তারপর সেই শব্দ—শ্মশানের গান; অতি নীরব অন্ধকার হিমমণ্ডিত আকাশ ভেদ করিয়া সন্তবিয়োগবিধুরা পুত্রহারা জননীর বিলাপ-সঙ্গীত উঠিতেছে। আকাশ-বাতাস চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কেন কাঁদিতেছে? মৃত্যু আশীর্ব্বাদ, ক্রন্দনের শেষ, জীবন-জ্বরের পূর্ণ বিরাম। আমি মরিলে কেহ কাঁদিও না, মৃত্যু অপেক্ষা এই ক্রন্দন অধিক আতঙ্ক সঞ্চার করে। মৃত্যু কি সত্যই সর্ব্ব আপদের অবসান, সকল বাসনার পরিসমাপ্তি, জীবনাগ্নির মহানির্ব্বাণ? না, ওই অন্ধকার তরুশিরে, মসীলিপ্ত প্রান্তরের উপর, বিজন প্রেতভূমে—কখনও নীরব, কখনও অস্ফুট, কখনও বা অতিতীব্র আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে নিরুদ্দেশ নিশীথ-বায়ুর সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইতে হইবে? না, নদীবক্ষে সন্ধ্যাবায়ুর মত ঘুমাইয়া পড়া? সূর্য্যাস্তের বর্ণরেখার মত নীরবে মিলাইয়া যাওয়া? ওই নির্নিমেষ নক্ষত্রের মত অনাদি অনন্ত সন্ধ্যান্ধকারে দাহহীন স্নিগ্ধ জ্যোতি লইয়া অনন্তকাল চাহিয়া থাকা? —কে বলিবে? মানুষ না কি অমর, আমি নাকি অমৃতের পুত্র! মরিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—এ অভিশাপ কে দিয়াছিল? এ অভিশাপের কথা ভুলিয়া থাকা যায় না? কে বলিয়াছে—মানুষ অমর? সব মিথ্যা! আমি এই ধূলির মত নির্জ্জীব হইয়া যাইব; না, বালুকণা হইব—ধূলি হইলে তাহা হইতে নব-শাদ্বল উদ্গত হইতে পারে। মরিয়া যাওয়া, মহাশূন্যে পরিণত হওয়া, চেতনাহীনের পরমানন্দ লাভ করা এত কঠিন! আমি মৃত্যুভয়ে অবসন্ন হইতেছি—জীবন-বিয়োগের ভয় নহে, পরজীবনের ভয়।

(৪)

বর্ষণমুক্ত নিশীথ-আকাশ—রাত্রি দ্বিপ্রহর। কূলপ্লাবিনী ভাগীরথীবক্ষে তরণীর উপর ভাসিতেছি। অসিত পক্ষ, বর্ষাপগমে আকাশ প্রায় পরিষ্কার, রজনী নক্ষত্র-মালিনী। নদীকূলে একদিকে তুঙ্গতটে খদ্যোৎখচিত পাদপশ্রেণী, অন্যদিকে বিশাল দিগ্বলয়স্পর্শী প্রান্তরভূমি। আমি চাহিয়া আছি—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। কি দেখিতেছি তাহা বুঝাইতে পারি না। কেবল প্রাণের ভিতর একটা শান্তির

ভাব আসিয়াছে ; বিদ্রোহের উদ্ধত পতাকা আজ নিম্নমুখ, সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। উচ্ছল বারিরাশির কলকলধ্বনি, শব্দহীন মেদিনীর বিপুল রহস্যভার, দিগন্তের কিঞ্চিদূর্দ্ধে সপ্তর্ষি-নির্দ্দিষ্ট নিশ্চল ধ্রুবতারকার অম্লান জ্যোতি আজ আমাকে বিনীত করিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলাম। তখন পূর্ব্বদিক্‌প্রান্তে চন্দ্রোদয়ের সূচনা হইয়াছে—অল্পে অল্পে একটা আলোক প্রকাশ পাইতেছে। ক্ষণপরে বৃহৎ শশিকলার উদয় হইল। সেই আলোকে অম্বরপথে দিশাহারা মেঘদল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের বর্ণ ধৌত-অঙ্গারের ন্যায়, স্তরগুলি নিম্নদিকে রজতাভ হইয়া গেছে। মনে হইল, শ্মশান-শয়ন চন্দ্রচূড়ের অঙ্গারবর্ণ জটাজাল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, ও তন্মধ্যে সুরতরঙ্গিণীর রজতোজ্জ্বল ফেনলেখা শোভা পাইতেছে। আমি কম্প্রবক্ষে প্রণাম করিলাম, হৃদয় যেন নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল।

কোথায় জীবন, কোথায় মৃত্যু ! এই অসীম বিরাট্ সত্তার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন, আমার তুচ্ছ হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল ! আমি চাহিয়া আছি ; ঐ আকাশের মত বিরাট্, এই তটতরুচ্ছায়ার মত রহস্যময়, এই জল-কল্লোলের মত দুর্ব্বোধ অথচ মহান্, সুন্দর ও সঙ্গীতময় এক চেতনা আমাকে আবিষ্ট করিতেছে। এ শক্তি পুষ্পস্বপ্নের মত মায়াময়ী নহে, ইহা প্রাণের ভিতর প্রেমের দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে না, ইহার বংশীধ্বনিতে নয়নকোণ অশ্রুসিক্ত হয় না। ইহা নির্ম্মমভাবে আত্মাকে জীবন ও মৃত্যু উভয়ের বন্ধনপাশ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া মহাকালের চরণে বলি প্রদান করে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র অণুর অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু, বেদনা-বাসনা সকলই প্রলাপ-বচনের মত মনে হয়। আমি সেই বিরাট্‌কে বরণ করি। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনবিন্দু পুষ্পদলচ্যুত শিশিরকণার মত কবে ভাগীরথীর সাগরাভিমুখ জলতরঙ্গের সহিত নিঃশব্দে মিশিয়া যাইবে !

১৩১৯

স্বপ্ন-মহানাটক

[নাটকখানির নাম স্বপ্ন-মহানাটক, জাগর-রঙ্গভূমিতে ইহার অভিনয় হয়, দর্শন হয় স্বপ্নে। কবির নাম নাই—বড় প্রাচীন রচনা—অব্দ কালের অতীত! কিন্তু কবি যে আদিকবি ও মহাকবি, তাহাতে সংশয় নাই।

রচনাটি সর্ব্বকালসম্মত, তাই নিত্য, আবার স্বপ্ন ভাঙ্গিলে ইহার অর্থ হয় না, তাই অনিত্যও বটে! অনিত্য বলিয়াই, লোকোত্তর চমৎকার—নিত্য-নবীনতার বিস্ময়-রস ইহাকে চিরসুন্দর করিয়াছে। এ কাব্যের কল্পনা-মূলে নীতি নাই, বরং দুর্নীতি আছে এমন কথাই উঠিতে পারে—স্বপ্নদ্রষ্টা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং জাগরিত হইলেই তৃপ্তি বোধ করে। কিন্তু যাহার প্রাণ স্বপ্নেও জাগিয়া থাকে, সে অপলক নেত্রে ইহার অভিনয় দেখে, তাহার পক্ষে স্বপ্ন-জাগর এক হইয়া যায়। যে অনুভাব নিরভিধান, যে আনন্দ নির্ব্বিকল্প তাহারি মধ্যে সে জাগিয়া ওঠে, দ্রষ্টা নয়—আপনাকেই স্রষ্টা বলিয়া মনে করে, নাটক ও নাটকের অভিনয় শেষ হইয়া যায়।

অভিনয়গত দেশ-কালের সীমা নাই, নায়ক দুইটি, নায়িকা একটি—প্রধানতঃ এই তিনটিকে লইয়াই পাত্র-পাত্রী। এই যুগ্ম-নায়কের একটির নাম 'জীবন,' অপরটির নাম 'মৃত্যু'। নায়িকার নাম নাই—ইহাই বিচিত্র! এই নামহীনার নাম 'কামনাদেবী' রাখিলে মন্দ হয় না।

অভিনয় স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া দুরূহ। পণ্ডিতজনের নিকট ইহার অর্থ দুরবগাহ, কিন্তু সহৃদয় সামাজিকবর্গের ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভিনয়-ভূমি জাগর-ক্ষেত্রে, দর্শকের স্থান স্বপ্নে, স্বপ্ন-দৃশ্য জাগর-বর্ণে রঞ্জিত না করিলে বর্ণনা করা যায় না। এ কারণ, এই নাটকের পরিচয়-প্রসঙ্গে সুপরিচিত পটভূমিকা ও সুপ্রসিদ্ধ কবি-ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাতে গৌরবহানি না হইয়া বরং বাস্তবচিত্রের বর্ণবাহুল্যে এই স্বপ্ন-দৃষ্ট নাটকখানির বস্তুপরিচয় রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।]

(১)

দক্ষিণ বারিধিতীর। তাম্বূলবল্লীবলয়িত পূগশ্রেণী ও এলালিঙ্গিত চন্দনতরুর দেশ। নদীর নাম তাম্রপর্ণী, সে নদী সাগরসঙ্গমে মুক্তা প্রসব করে।

প্রথম অঙ্কের নাম 'নিদ্রানিমগনা'। চন্দনবনসমীরিত সুরভি বায়ুবীজনে শ্যামান্ধকার উদ্যানবাটিকায় কামনাদেবী ঘুমাইয়া আছে—চিত্রলিখিত প্রদীপের মত। মৃত্যু তাহার চারিপার্শ্বে ছায়াগণ্ডী রচনা করিয়া তাহার সুপ্ত দেহকান্তি উজ্জ্বল করিয়াছে,—নায়িকার নিদ্রা যেন তাহারই সুকোমল আলিঙ্গন-ছলনা! দীর্ঘ-রাত্রি যে তাহাকে বুকে করিয়া জাগিয়াছে, নিজের শীতল হাতখানি তাহার বক্ষতলে উরজমূলে স্থাপন করিয়া, সে তাহার মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে আপন প্রভাব

বিস্তার করিয়াছে। ক্রমে নিদ্রানিমগনার নগ্নকান্তি প্রভাতপ্রায়া শর্ব্বরীর ললাট-ভূষা শুকতারকার মত শোভা পাইতে লাগিল—তেমনি নির্ম্মল, তেমনি নগ্ন! মৃত্যু নির্নিমেষ নয়নে সেই রূপ দেখিতেছে। সে তাহার পক্ষ্মশ্রেণীর অন্তরালে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র-তারকার পানে আর একবার চাহিল, তাহার শ্রবণমূলে কলগুঞ্জন করিল, সাড়া পাইল না। পরিশেষে তাহার নেত্রে অশ্রুর আভাস, অধরোষ্ঠে অতৃপ্তির মোহন ভঙ্গি, এবং বক্ষতলে অগ্নিগিরির রুদ্ধ আবেগ লুকাইয়া রাখিল। রাত্রিশেষে মৃত্যু অহিফেন-ফুলের মালা গাঁথিয়া, অস্তমান তারার বিদায়-সঙ্গীত গাহিল। তারপর ছায়ার মত মিলাইয়া গেল। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে বধূর বাম-প্রকোষ্ঠে হরিদ্রাবর্ণ বিবাহ-সূত্র বাঁধিয়া গেল, সে কাহারও চক্ষে পড়িবে না।

তখন বহিরাকাশে মুক্তাবর্ণ পাণ্ডুর আলোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সে যেন শিশুর হাসি!—ক্ষীরাম্বুগন্ধি অধরে অস্ফুট চেতনার আনন্দজ্যোতিঃ! সেই আলোকের মত সদ্যস্ফুট কুসুমগুচ্ছ হস্তে লইয়া, মৃত্যু-প্রেয়সীর শয়ন-মন্দিরের কক্ষদ্বার উন্মোচন করিয়া জীবন আসিয়া দাঁড়াইল। সে তাহাকে স্পর্শ করিল না। কেবল সেই পুষ্পস্তবক দিয়া, তাহার নয়ন অধর ও বক্ষস্থল মার্জ্জনা করিয়া দিল, এবং নিদ্রানিমগনার চরণাভিমুখ পূর্ব্ববাতায়ন-কপাট খুলিয়া দিল। তারপর শুভ্রশয্যা প্রদক্ষিণ করিয়া হিরণ্য-জ্যোতির আবাহন-মন্ত্র পাঠ করিল। তাহাতে নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা যেন একটু চঞ্চল হইল, কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। কেবল অধর কাঁপিয়া উঠিল, গণ্ডদ্বয় ঈষৎ আরক্তিম হইল, নিশ্বাস যেন মন্থর হইয়া আসিল। জীবন অপেক্ষা করিয়া রহিল—কামনার কপোলতল হইতে আঁখি-পল্লবের দীর্ঘ পক্ষ্মচ্ছায়া কখন অপসারিত হয়, একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল।

(২)

দ্বিতীয় অঙ্কের নাম 'স্বপ্নোত্থিতা'। চন্দ্রপাদোজ্জ্বল নিশীথে, সপ্তপর্ণ-বেদিকায় শয়ন করিয়া কামনাদেবী স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার শিয়রে জীবন বসিয়া আছে—একটি পুষ্পবহুল মদগন্ধী সপ্তপর্ণশাখা লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছে। বধূর মুখে, তাহার পীবর স্তনযুগে—ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্নার পত্রকরচনা। তাহার দুই নেত্রকোণে দুইটি বৃহৎ অশ্রু-মুক্তা ম্লান চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যেন জাগিতে বিলম্ব নাই—তথাপি জীবন তাহাকে জাগাইবে না। এখনি জাগিলে, এই পাণ্ডুর আলোকে তাহার বরবেশ মানাইবে না; তাহার পিপাসা-রঞ্জিত অধর,

ললাটের দৃপ্ত-গরিমা, নয়নের বাসনা-বহ্নি, এ সকল কিছুই সেই প্রথম দর্শনে নিদ্রোত্থিতার নয়নে-মনে গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠিবে না। তাই মদগন্ধী সপ্তপর্ণ-শাখার আন্দোলনে সে তাহার অর্দ্ধ-জাগ্রত চেতনা স্বপ্ন-রসে ডুবাইয়া দিতেছে। নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী এই স্বপ্ন-বিলাস অভিনয়ের গুণে স্পষ্ট হইয়া উঠে। —কোনও ভাষা নাই, কেবল ছায়া-আলোকের খেলা! তাহার সহিত অদূর-প্রবাহিত সাগরোর্ম্মির কলোচ্ছ্বাস, এবং তালীবনরাজির তন্দ্রামর্ম্মর যে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, তাহাতে এই স্বপ্নাভিনয় দর্শকের হৃদয়ে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। যেন নায়িকার স্বপ্ন শুধু নায়িকারই নহে, দর্শকগণও সে স্বপ্ন দেখে। তাহাতে মাদক-বিষ আছে, তথাপি মধুর! সে যেন চন্দন-বনের সৌরভ, তাহাতে বিষধর-নিশ্বাস জড়িত আছে বলিয়াই এমন আবেশময়! সে যেন ওই জ্যোৎস্নার মত নয়নরঞ্জন, কিন্তু মসীকৃষ্ণ ছায়া-কলঙ্ক আছে বলিয়াই এমন চিত্তহারী! সে ওই দূরশ্রুত সাগর-সঙ্গীতের মত, কিন্তু তাহার অন্তরালে তরীমগ্নের আর্ত্তরব, সর্ব্বনাশের হাহাকার আছে বলিয়াই এত হৃদয়গ্রাহী! সে ওই শাণোল্লিখিত মণিগণবৎ নক্ষত্রমালার মত —এত সুদূর, এত দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই এমন মনোমোহকর!

কামনা এখনও নয়ন উন্মীলন করে নাই, কিন্তু জাগিয়াছে। মৃত্যু যে অচেতন-ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে, জীবনের এই বিমোহন-চেষ্টায় সেই ব্যথাই জাগিয়াছে মধুর হইয়া! রজনী-প্রভাতে তাহার হৃদয়ের শতপত্র বিকশিত হইল, প্রথম দৃষ্টিপাতে সেই ব্যথার মাধুরীকেই সে যেন সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখিল। তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে; উন্নত ললাটে রক্তরশ্মি-প্রতিভা ধারণ করিয়া, বিস্তৃত বক্ষ-কবাট প্রসারিত করিয়া জীবন তাহাকে বরণ করিল। কামনার দুই নেত্রে তখনো স্বপ্ন-জড়িমা,—বিস্ময়-বিমূঢ় মরণ-বধূ প্রিয়তম দয়িত-জ্ঞানে জীবনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল!

(৩)

তৃতীয় অঙ্কের নাম 'উন্মদনা'। এই অঙ্কের অভিনয়ে পারিপাট্য নাই, কিন্তু দৃশ্যাবলীর নিপুণ সমাবেশ, ও কবি-কল্পনার উচ্ছল রসাবেশ এই অংশটিকে স্বতঃই নয়নমনোহর করিয়াছে। প্রথমে জীবন,—পরে জীবনের ছায়াসহচররূপে মৃত্যু, নানা মূর্ত্তি ও নানা অবস্থানে, কামনার যৌবন-শ্রী, বিলাস-ব্যসন ও মর্ম্মান্ত-পিপাসা উদ্রিক্ত করিতেছে।

সিন্ধুতীরে, সুবিশাল হর্ম্ম্যচূড়ার অলিন্দতলে বসিয়া সে নিদাঘ-যামিনী যাপন করে। দূরে, দিক্‌চক্রবালে, যেখানে তারকাগণ অবগাহন-স্নান করিয়া নীল নভস্তলে আসিয়া দাঁড়ায়—সেইখানে সে তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করে, এবং এই বিরাট্ নৈশ-লীলার সাক্ষীরূপে আপন মহীয়সী মহিমা হৃদয়ঙ্গম করে। আবার যখন পূর্ণিমা-রাত্রে, স্ফুটফেনরাজি তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল সিন্ধুজল স্বর্ণসিকতাময়ী বেলাভূমিকে আলিঙ্গন করে, দ্বীপান্তরানীত লবঙ্গপুষ্পের সৌরভ মলয়সমীরণে উচ্ছ্বসিত হয়, তখন সেই বলভিগৃহের মণিকুট্টিমে লুটাইয়া পড়িয়া সে তাহার রুদ্ধ আবেগ উন্মুক্ত করে—শীতল শিলা-চত্বরে তাহার তুষারসন্নিভ বক্ষের আগ্নেয় জ্বালা প্রশমিত করে, ভৃঙ্গনীল কুন্তলদাম বিস্রস্ত হইয়া তাহার অধোমুখ দেহখানির কটি পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠিত করে। সে তখন জীবনকে ভর্ৎসনা করে, ক্ষুদ্র সুখ তাহার তুচ্ছ বোধ হয়। ওই মহোচ্ছ্বাস বারিধিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, শুক্লপক্ষ বিহঙ্গের মত অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া, সে দিগ্‌বলয় অতিক্রম করিতে চায়! জীবন তাহার সেই মিনতি শুনিয়া শঙ্কিত হয়; নিদ্রা-নিমগনার অধরপুটে মৃত্যুর সেই চুম্বনের কথা সে জানে,—সে যে অজ্ঞান-পরিণীতা মরণ-বধূ, তাহার মরণ-কামনা কে ঘুচাইবে? তথাপি মৃত্যুর স্বতন্ত্র মূর্ত্তিকে কুৎসিত করিয়া সে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করে, কামনা আকুল হইয়া জীবনকেই জড়াইয়া ধরে—'লতারূঢ়িক'-আলিঙ্গনে আনন উচ্ছ্রিত করিয়া, আপনার লোহিত অধর জীবনের ওষ্ঠে অর্পণ করে।

তথাপি জীবনের আশঙ্কা দূর হয় না। সে কামনা সুন্দরীর নিভৃত বিলাস-কুঞ্জে কেলিকুঞ্চিকারূপে বাসন্তী-প্রকৃতিকে পাঠাইয়া দেয়। অশোকপুষ্পের শোণিতরসে সে তাহার পদতল রঞ্জিত করে, লোধ্রপ্রসবের শুভ্র পরাগে আনন মণ্ডিত করিয়া দেয়, এবং কেশরদামে মেখলা গড়িয়া তাহাকে রহস্যসখীরূপে নিতম্বোর্দ্ধে স্থাপন করে। মধ্যদিনের আতপ্তশ্বাসে ক্লান্ত হইয়া, মৃদু প্রবাল-পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া কামনা দেখিতে পায়—রতি-সঙ্কেতনীত পারাবতমিথুন কুঞ্জ-বাতায়নে বসিয়া কূজন আরম্ভ করিয়াছে; তাহাদের অঙ্গ অমৃতফেনের ন্যায় শুভ্র, কেবল চঞ্চুপুট ও নখরশ্রেণী প্রবালবর্ণ! সে জীবনের এই অভিসার-সঙ্কেত গ্রহণ করে, এবং চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বেই সিন্ধুতীরে আসিয়া জীবনের সহিত সঙ্গতা হয়। শীতলশীকরবাহী সাগর-সমীরণে তাহার রতিদুঃখশীলতার লাঘব হয়; কিন্তু বাসনাবসানে সে উর্দ্ধাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পানে চাহিয়া থাকে, এবং সাগরবালুকায়

জীবনের পার্শ্বে যে দীর্ঘচ্ছায়া নিরীক্ষণ করে, তাহার দিকে চাহিয়া, জন্মান্তরস্মৃতির মত একটা অনুশোচনায় তাহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠে।

একদা অর্দ্ধরাত্রে, স্তিমিত-প্রদীপে সুখসুপ্তা কামনাসুন্দরীকে মৃত্যু আসিয়া ডাকিল; এবারে আর ছায়া নয়, একেবারে আপনার মূর্ত্তিতেই দেখা দিল। ললাটের চারিপার্শ্বে অহিফেনের রক্তপুষ্পমালা, নয়নে স্বপ্ন, অধরে হাসিটি লাগিয়া আছে! কামনা দুয়ার খুলিয়া সহসা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ করিল, এ যেন মুকুর-বিম্বিত তাহারই মুখচ্ছবি! —অথবা এ যেন তাহার হৃদয়ের অতল হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু পরক্ষণে সেই নির্জ্জন-নিশীথে, তারালোকিত অন্ধকারে সে শিহরিয়া উঠিল, মৃত্যু তাহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিতেই সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—'না! তুমি মৃত্যু! —তোমার স্পর্শ বড় শীতল! জীবনের বাহু শোণিতোষ্ণ, তাহার আলিঙ্গন বড় সুখকর। তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি তাহার ছায়া! তোমার দেহ ধূম্রনীল, রক্তহীন—তুমি জীবন-শত্রু, চিতাগ্নির সহচর! তোমার সঙ্গে থাকিলে আমি অঙ্গার-কৃষ্ণ হইয়া যাইব!' শুনিয়া মৃত্যু হাসিল, সে হাসিতে অন্ধকার-রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!—বলিল, 'প্রাণাধিকে! তুমি আমায় চিনিলে না! আমি জীবনের ছায়া নই, আমি তাহার কিরণ-কিরীট! আমারি ছায়ায় জীবন এত সুন্দর! আমি অন্তরালে থাকিয়া জীবনকে যে শোভায় মণ্ডিত করিয়াছি তুমি তাহারি অনুরাগিণী—তুমি আমারই প্রেয়সী। মুগ্ধে! আমায় বরণ কর।' কামনা দ্বারদেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; মৃত্যু চলিয়া গেল।

এতক্ষণে নাটকের চরম ঘটনা ঘটিল—বধূ বরকে চিনিয়াও প্রত্যাখ্যান করিল! এখন হইতে সে আত্মপরায়ণা, পুষ্পাসবঘূর্ণিতনেত্রা স্বৈরিণী! আগে সে জীবনকে ভালবাসিত, এখন ভয় করে,—তাহার অপ্রীতিভাজন হইতে সাহস করে না। সে এখন ছলনাময়ী, মিথ্যাচারিণী। সে এখন অন্ধ হইয়াছে, জীবনের পার্শ্ব হইতে মৃত্যুর ছায়াকে পর্য্যন্ত বহিষ্কার করিয়াছে! এখন নর্ম্মসখী বাসন্তী-প্রকৃতি বাহিরে বসিয়া রোদন করে, বহির্জ্জগৎ শ্রাবণী-ধারায় ভাসিয়া যায়!—আর কামনাসুন্দরী, সাগর-বক্ষোবাসিনী পৌর্ণমাসীর কথা বিস্মৃত হইয়া, অন্ধকার-কক্ষে মণিদীপ জ্বালিয়া তাহারই আলোকে, জীবনের করধৃত পানপাত্রে, নিজমুখবিম্বিত কবোষ্ণ যশোধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করে,—এমনি করিয়া সে মৃত্যুকে ফাঁকি দিবে!

(৪)

চতুর্থ অঙ্কের নাম 'মূর্চ্ছান্তচেতনা'। এই অঙ্কের অভিনয়দর্শন-কালে মনোবৃত্তি-সকল স্তম্ভিত হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় পীড়িত হইয়া উঠে। কামনার তপ্তশ্বাসে বায়ুমণ্ডলে মরীচিকার সৃষ্টি হয়, নিদাঘ-সন্তাপে বসন্তশোভা ঝরিয়া যায়। মৃত্যুচ্ছায়ামুক্ত জীবন আর সুন্দর নয়। ঐশ্বর্য্যের উপকরণ-ভারে সে বিব্রত, অবসন্ন; কামনার অতৃপ্ত চুম্বনে তাহার ওষ্ঠ কালিমাময়—নিত্যনব ভোগ-ভাবনায় তাহার প্রশস্ত ললাট বলি-অঙ্কিত! জীবনের সর্ব্বশোভা হরণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে বহ্নিস্ফুলিঙ্গের মত রত্নরাজি পরিধান করিয়া রাজরাজেশ্বরীবেশে কামনা বসিয়া আছে। সেই রসাতল-গৃহে স্নেহহীন দীপপাত্রে নানা বর্ণের বাসনা-বহ্নি জ্বলিতেছে; ধূপধূম্রের মাদক-সৌরভে কক্ষবায়ু ভারাক্রান্ত। সেই ধূসর আলোকে কামনাসুন্দরীর ভূষণ-জ্যোতি ও লোহিত হাস্য প্রেক্ষণীয় হইয়াছে!—মোহমূর্চ্ছিত জীবন কামনার চরণ-সকাশে শতদললগ্ন ভ্রমরের মত মৃদু গুঞ্জন করিতেছে!

এই দৃশ্য দেখিবার কালে দর্শকের মানসনেত্রে পট-পরিবর্ত্তন হয়; মনে হয়, যাহা দেখিতেছি তাহা যথার্থ নয়, তাহার অন্তরালে যেন একটি করুণ কাহিনী রোদন-সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সেই ভূষণ-দীপ্তি, সেই বাসনার দীপশিখা, সেই অধর-শোণিমা ও অদ্ভুত হাসি—যেন অসহ্য বেদনার, নিদারুণ আর্ত্তনাদের—রূপক-রূপ। জীবনালিঙ্গিত কামনা যেন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছে—তাহার গণ্ডে কজ্জলময় অশ্রুচিহ্ন। সে কি চায়, কাহাকে চায়—জানে না। তাহার তীব্রোৎকণ্ঠা কাহাকে নিবেদন করিবে? জীবনের আলিঙ্গন-পাশ তাহার সর্ব্বশরীর দহন করিতেছে। স্নিগ্ধশীতল শান্ত-সুন্দর কোন্ পরমদয়িতের বিরহে সে আজ মুহ্যমানা। তাহার সেই রোদন-রাগিণী ভাষার অতীত! তথাপি দেশকাল-পাত্র ছাড়াইয়া একটি পরম-রমণীয় বাণীর মত কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। সে যেন বলিতেছে—

"যে বর আমার কৌমার হরণ করিয়াছিল তাহারি বাহুবেষ্টনে বদ্ধ রহিয়াছি; সেই চৈত্ররজনী আজিও হাসিতেছে, উন্মীলিত-মালতী-সৌরভ হরণ করিয়া প্রৌঢ় কদম্বানিল আজিও বহিতেছে, আমিও সেই আমি,—তথাপি রেবার কূলে বেতসী-তরুতলে প্রিয়সঙ্গমে আমার মন আজ এমন করিতেছে কেন?"

—তাহার ক্রন্দন-কথা যেন এমনি—এত সরল, অথচ হৃদয়দ্রবকারী! স্বৈরিণী যেন সতীকুণ্ডে স্নান করিয়াছে!

এবার সত্যই পট-পরিবর্ত্তন হইল। অরণ্যপ্রান্তে একটি ভূর্জ্জতরুতলে নিয়মক্ষামমুখী একবেণীধরা কামনা বসিয়া আছে; তাহার অঙ্গে পরিধূসর বল্কল-বাস, সে নির্নিমেষ নয়নে সম্মুখে কাহার পানে চাহিয়া আছে!—সে দৃশ্য আলোক-সম্ভব! সে যে জীবন ও মৃত্যুর যুগ্মচ্ছায়া! মৃত্যুর রূপ নবজলধরশ্যাম, তাহার মাথার উপর ঘনপল্লব তরুশাখা—সেই পত্রাবলীর মধ্যে মধ্যে, নিদ্রায় স্বপ্নের মত কদম্বমঞ্জরী! তাহার চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, অধরে বেণুযষ্টি, চরণে নূপুর। জীবনের দেহকান্তি মর্ম্মরশিলার ন্যায় শুভ্র—তাহার রূপ মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিষহ! তাহার হস্তে মণি-বিজড়িত হেমময় রাজদণ্ড, ললাটে রক্ততিলক, তদূর্দ্ধে মুকুট-চূড়া! কামনা একবার অপাঙ্গে মৃত্যুর দিকে চাহিতেছে, সে-রূপ যেন ভালো করিয়া দেখিতে পারিতেছে না—নয়নপল্লব ঢুলিয়া আসিতেছে। আবার জীবনের রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতেছে! মৃত্যু যখন বংশীবাদন করে, জীবন তখন ভ্রুকুটি করে—মরণের শ্যামদেহের পীতধটী, জীবনানুরাগিণীর চক্ষে নিশীথান্ধকারে চিতাগ্নির পিঙ্গলশিখার মত জ্বলিতে থাকে। ক্রমে জীবনের ভ্রুকুটির ভয় আর রহিল না; মরণের পানে কামনা যতবার চাহিয়া দেখে, ততই তাহার সাহস বাড়িয়া যায়! অবশেষে বাঁশীর সুরে তাহার দেহ বিবশ হইয়া আসিল, জীবন ছায়ার মত হইয়া মৃত্যুর পিছনে লুকাইল। তখন মৃত্যুর রূপ দেখিয়া বধূর জীবনব্যাপী মূর্চ্ছার অবসান হইল। ব্রীড়বেপথুমতী নবলাজ সম্বরণ করিয়া বরের সহিত নয়নে-নয়নে চাহিল। মৃত্যুও মন্ত্র পাঠ করিয়া, আপনার পাণিতলে কামনা-সুন্দরীর স্বিন্ন করাঙ্গুলি স্থাপন করিল। তারপর, যখন সে তাহার শিখিচূড়া, পীতধটী ও মোহন বেণু ফেলিয়া দিয়া, জ্যোতির্ম্ময় নিরাভরণ শুভ্রদেহে—মেঘের মত ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ ললাট হইতে সরাইয়া দিয়া, বাহু বাড়াইয়া নববধূর আলিঙ্গন যাচ্ঞা করিল, তখন পুলক-বিস্ময়ে স্ফুরদ্‌বালকদম্ব-কল্প কলেবরে কামনা বলিয়া উঠিল, 'এ কি! তবে কি তুমি মৃত্যু নও! এ যে জীবনেরই নববেশ!' মৃত্যু হাসিয়া বলিল, 'সুন্দরি! জীবনের দ্বারা আমিই তোমার মনোহরণ করিয়াছি। জীবন ব্যথা—জীবন বিরহ-বেদনা; আমিই মিলন, আমিই আনন্দ! আমার চুম্বনে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাই তোমাকে বিবাহ করিয়া জীবনের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এই দেখ, সেই বিবাহসূত্র এখনো তোমার প্রকোষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছে; এইবার ইহা খুলিয়া দিয়া তোমার সহিত অনন্ত বাসররাত্রি যাপন করিব।' এই বলিয়া মৃত্যু বধূকে বক্ষে ধরিয়া তাহার

মস্তকের উপর আপন বাম গণ্ড স্থাপন করিল ও সীমন্তে চুম্বন করিয়া তথায় একটি চিরমন্দার পরাইয়া দিল।

(৫)

শেষ অঙ্কের নাম 'বাসর-বিলাস'। কামনা মৃত্যুর অন্তঃপুরে নববরের উৎসঙ্গে বসিয়া, কণ্ঠাশ্লেষ-চুম্বনে সকল দুঃখ ভুলিয়াছে—কামনা মরিয়াছে। সে নিভৃত মিলনের একমাত্র সাক্ষী—তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী প্রকৃতি। সেই রস-নিপুণা মদিরেক্ষণা যুবতীর মায়াবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে যে কটাক্ষ-ইঙ্গিত বর্ষিত হয়, তাহারি সাহায্যে এই পরম কৌতুকময় বাসর-বিলাসের গোপন রহস্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

তাই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নাই; কেবল আকাশ ধরণী ও সাগর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অপূর্ব্ব আলোকে মণ্ডিত হইতে থাকে, দৃশ্যপটে নব নব বর্ণালোক বিলসিত হয়। দর্শকের মানসমধ্যে স্বপ্ন-জাগর এক হইয়া যায়, দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সকল ব্যবধান ঘুচিয়া যায়; মনে হয়, যাহা দেখিতেছি তাহা আমারই মধ্যে ঘটিতেছে, দৃষ্টি যাহা দেখায় তাহা যেন মনেরই সৃষ্টি।

প্রথমেই সন্ধ্যা। সাগরসঙ্গমে তাম্রপর্ণী তাহার সুবিস্তীর্ণ জলবেণী এলাইয়া দিয়াছে, কুন্তলশোভী মুক্তাকলাপ কোন্ অতলে হারাইয়া গিয়াছে! পশ্চিম দিগন্ত-শিয়রে, অধরচুম্বিতা নববধূর লজ্জারাগের ন্যায় স্নিগ্ধলোহিত স্থলকমলরাজি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে সায়ন্তন তমঃপুঞ্জকে কবিগণ পল্বলোত্তীর্ণ বরাহযূথের সহিত উপমিত করিয়াছেন, সে যেন প্রণয়ীপীড়িত প্রিয়তমার কবরীস্রস্ত কেশপাশ!

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। আকাশে তোরণশোভিনী মালার মত একটি নক্ষত্রহার দেখা যাইতেছে। নিম্নে সেই পূগতরুবেষ্টিত উদ্যান-বাটিকার সম্মুখে সাগর-সৈকতে একটি চন্দন-নির্ম্মিত চিতা জ্বলিতেছে। আকাশের সেই নক্ষত্রমালা এবং সাগর-সৈকতের সেই চিতালোক—যেন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যনিহিত চিরশ্রুত বিয়োগিনী-বৃত্তের চিত্রকল্পনা! দেবর্ষির বীণাভ্রষ্ট যে পারিজাতমালা রাজ-প্রেয়সীর বক্ষে মৃত্যু হানিয়াছিল, সেই অমর কুসুমাবলী আজিকার এই বাসর-নিশায় দীপমালা হইয়া জ্বলিতেছে! আর সেই চিতাগ্নির আলোক যেন মরণালিঙ্গিতার অনঙ্গ দেহকান্তি!—নীলাভ ধূমবল্লী যেন মৃত্যুদেবতার কর্ণোৎপল!

আবার পট-পরিবর্ত্তন হইল। এবার ধরণীপৃষ্ঠে, দূর-দূরান্তরে, স্বচ্ছ-তরল মন্দান্ধকার ভেদ করিয়া অগণিত সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, এবং চক্রবালরেখার

কিঞ্চিদূর্দ্ধে অস্তাচলশায়িনী সন্ধ্যাতারাটির দিকে চাহিলে মনে হয়, যেন তাহারি রশ্মিস্পর্শে ওই মৃত্তিকার দীপগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে! এই সময়ে নেপথ্য হইতে ঐক্যতান-সঙ্গীত উত্থিত হইল, যেন নিখিল কবিকুল কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন—

"হে মৃত্যু, তুমি পরমসুন্দর! তোমারই ছায়া আকাশ, ধরণী ও সাগরবক্ষে—কোথাও হরিৎ, কোথাও শ্যামল হইয়া ওঠে! কামনার যে অগ্নিজ্বালা ধরণীর মর্ম্মতলে রুদ্ধ রহিয়াছে—যাহা পুষ্পে, শোণিতে, গিরিশিলায় বেদনার লোহিত রাগে অধীর হইয়া ওঠে—সেই লালসানল ভস্মধূসর হইবার পূর্ব্বেই তুমি তাহা আনন্দের শাশ্বত স্বর্ণালোকে পরিণত কর, সেই নয়ন-সুখকর সর্ব্বরূপ-রসায়ন আলোক তোমারই পীতধটী! তোমার শ্যামদেহের সঙ্গে কামনার আলোকবর্ণ শুভ্রতনু, যখন আসন্ন সন্ধ্যার গোধূলিলগ্নে মিলাইয়া যায়—তখন, তোমাদের সেই মিলন-চুম্বন নীলপাণ্ডু দিগন্তসীমায় একটি বৃহৎ উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দুর মত জ্বল-জ্বল করিতে থাকে। কামনার অধরে তোমার সেই চুম্বন-চিহ্ন যখন সন্ধ্যাকাশে ফুটিয়া ওঠে, তখনই ধরণীর ধূলিপ্রাঙ্গণে অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া ওঠে। কোনটি পূজারতি-মুখর দেবায়তনে ঘৃতপূর্ণ দীপপাত্রে আলোক বিকিরণ করে; কোনটি রাজবধূর শয়ন-শিয়রে কাঞ্চনী দীপযষ্টির আশ্রয়ে গন্ধালোক বিতরণ করে; কোনটি বা দরিদ্র তাপস-দম্পতীর পর্ণকুটিরে, ইঙ্গুদীতৈলপুষ্ট ম্লান-শিখায়, আশায়-আনন্দে, ভয়ে-ভাবনায় কাঁপিতে থাকে। সেই দীপালোকে, কোথাও বা, যৌবন-লাঞ্ছিতা পূজারিণী আপনার আগুল্ফলম্বিত কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া পাষাণ-দেবতার পাদপীঠ মার্জ্জনা করে; কোথাও বা, নিদ্রাহারা মুগ্ধ-প্রণয়ী অতৃপ্ত নয়নে প্রিয়তমার সুপ্তি-শিথিল অনিন্দ্য দেহভঙ্গি নিরীক্ষণ করে; সেই আলোকেই যথাকাল-প্রবোধিতা জননী অর্দ্ধরাত্রে শিশুর ক্ষুধিত অধরপুটে আপন পয়োধর বিন্যস্ত করে।

হে মৃত্যু! তুমি ভুবনমোহন! তুমি সকল রূপের অতীত হইয়া সকল সৌন্দর্য্যের অন্তরালে বিরাজ করিতেছ! তুমি নিয়তি, তুমিই অসীমের সীমা-সুষমা! যে লালসাকে মোহ বলিয়া জানি, তাহার অন্তরালে তুমি আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাই শিবসুন্দর! যাহাকে পাপ বলি, তাহাই তোমার মোহনস্পর্শে নিরতিশয় ক্ষেমঙ্কর! তোমার বধূরূপে কামনা আজ ভুবনমোহিনী। তাহার কলহংসলক্ষণ বধূদুকূল এবং ললাট-চন্দনের শোভা যেমন সুন্দর, তেমনি করুণ! তাহার সূক্ষ্ম মুখাবগুণ্ঠন, অবনত আঁখিপল্লব, অতিপিনদ্ধ নিচোলবাস, সংযত

মেখলা এবং অমুখর-নূপুরাকলিত চরণযুগ দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, রমণীয় ধরণী বরণীয় হইয়াছে! কামনার এই সতীমূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি। সে-রূপ বন্দনা করিবার কালে বাণী আপনা-আপনি ছন্দোময়ী হইয়া ওঠে। জীবন যাহাকে জয় করিতে পারে না, মৃত্যু যাহাকে জয় করিতে গিয়া আপনিই পরাজিত হয়, আমরা সেই মরণমোহিনী কামনার পুণ্যমহিমশ্রী কীর্ত্তন করি।"

রজনী গভীর হইল। অন্ধকার সাগরবক্ষে অদৃশ্য সলিলরাশি উথলিয়া উঠিল, এবং তন্মধ্যে অযুত নক্ষত্রচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিয়া মনে হইল—সে যেন অসীম বেদনার স্নানোদক! সহসা দিগ্‌দেশহীন বায়ুপ্রবাহে ধরণীর দীপ-শিখাগুলি নিবিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদিক্‌প্রান্তে পীতাবশেষ সুধাপাত্রের মত ক্ষীণ চন্দ্রখণ্ডের উদয় হইল। তখন পৃথিবী-গাত্রে সেই অন্ধকারলীন জ্যোৎস্না বড় মধুর দেখাইল—সে যেন রোদনোচ্ছ্বসিতনেত্রা রূপসীর মুখলাবণ্য! এতক্ষণে, এই মধুর-করুণ বর্ণপটের অন্তরালে কবিগণের নেপথ্যরাগিণী নীরব হইল।

সমগ্র নাটকের অভিনয়শেষে যে প্রশ্ন স্বপ্নদ্রষ্টাকেও চঞ্চল করে, এই সঙ্গীতে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে, উত্তর নাই। কামনার পূর্ণপরিচয় যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল না। এই অঙ্কের শেষ-দৃশ্যে কবি তাহাই করিয়াছেন। যেমন সেই পরিচয় স্পষ্ট হয়, অমনি শান্ত আনন্দরসে দীর্ঘ অভিনয়ের অবসান হয়। তখন জীবন, মৃত্যু ও কামনার স্থান স্বপ্নে, এবং দর্শকের স্থান জাগরক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। এই শেষ দৃশ্য অনির্ব্বচনীয়। যিনি এই অভিনয়লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন, কামনা কে।

কামনা মহাকাল-গেহিনী শর্ব্ববল্লভা শর্ব্বাণী।

মন-মর্ম্মর

১

জীবন-প্রভাতে

[১৩১৯-১৩২৮]

জগৎ—সত্য ও মিথ্যা

শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ" ; বৈষ্ণব বলেন—

"ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিকশেখর।"

কিন্তু এই লীলায় যোগ দিতে হইলে যে-রসিকতার প্রয়োজন, তাহা শক্তিমানেরই আছে ; সাধারণ মানুষেরা উহার উপকরণ-রূপে সেই রসপুষ্টির সহায়তা করে, সেই রস আস্বাদন করিবার শক্তি তাহাদের নাই। জার্মান দার্শনিক Schiller যখন বলিয়াছিলেন—'to play is to live', তখন তিনিও বোধ হয় এই তত্ত্বেরই আভাস পাইয়াছিলেন। ঐ মহাক্রীড়ার আনন্দ—ঐ 'artist's joy'—একাধারে বাসনা-মুক্তি এবং আনন্দ, দুই-ই। যে-জগৎ দুর্ব্বল মানুষের কারাগার, তাহাই শক্তিমানের আনন্দবাজার।

* * *

দুঃখই মিথ্যা ; যাহা আনন্দে অনুস্যূত তাহাই সত্য। আমরা এই আনন্দ বা রসের সন্ধান পাই না, তাই জগৎ আমাদের নিকট মিথ্যা—কারণ, উহা দুঃখময়। দেবতাদের নিকটে ঐ দুঃখ মিথ্যা, তাই জগৎ সত্য—কারণ, উহা আনন্দময়।

সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গকে তীর্থদর্শনের মত বলা হইয়াছে—কিম্বা তাহারও অধিক। এই শাস্ত্রবাক্যটি বড় সত্য। তীর্থদর্শন মানুষ কায়ক্লেশে বা অর্থব্যয় করিয়া করিতে পারে, উহা কতকটা তাহার ইচ্ছা বা পুরুষকারের অধীন। কিন্তু সাধুসঙ্গ? আমি যোগী-সন্ন্যাসী বা ঐ শ্রেণীর কোন পুরুষের কথা বলিতেছি না। কত সাধু বা মহৎচরিত্র পুরুষ আমাদের এই পরিচিত সমাজেই অপরিচিত হইয়া বাস করিতেছেন, আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না, দেখিয়াও চিনিতে পারি না।

অতএব, ভাগ্যবান্ সে-ই—যে ঐরূপ মহৎ ব্যক্তিকে, শুধু দেখা নয়—দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছে।

প্রথম পর্ব্বত-দর্শনে

সেদিন শিলিগুড়িতে প্রথম পর্ব্বত-শোভা দেখিলাম—সে রূপ ভুলিবার নয়। পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া আশা মিটে নাই; এবার পাহাড় দেখিলাম, আশা যেন কতকটা মিটিল। দূর হইতে পাহাড়ের যে-রূপ—তাহা প্রাণ ভরিয়া চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছি; পর্ব্বতের রূপসম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহাতে নিরাশ হই নাই—আমার "Yarrow Visited" সার্থক হইয়াছে। নিকটের সৌন্দর্য্য—আরোহণের আনন্দ—অবশ্য ইহা নয়, কিন্তু সে যে কি তাহা ত' জানি না, কাজেই কোন অভাব বোধ করি নাই।

অতিদূর আকাশপটে তরঙ্গায়িত স্তম্ভিতগতি নীলাম্বু-প্রবাহ; নিম্নে নিকট-পর্ব্বতশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন—ধূমলবর্ণ। সমতলভূমি যেখানে পর্ব্বতের তলদেশে মিশিয়াছে, সেখানে অতি খর্ব্বাকৃতি বৃক্ষশ্রেণী; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি কখনো আলোকময়, কখনো সদ্য-মেঘোদয়ে—অথবা, ক্ষণ-বর্ষণে—ধূসর হইয়া যাইতেছে! পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশে মেঘের কি বিচিত্র লীলা! অতি গভীরবর্ণ প্রান্ত-রেখা কুঞ্চিত কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিতেছে—ঘোর নীল সেই মেঘ-প্রান্ত হইতে শ্বেতবর্ণ ফেন-পুষ্পের মত ধূমবল্লী উদ্‌গত হইতেছে!—মেঘমণ্ডিত গিরিশ্রেণী বিক্ষুব্ধ সাগরের মত চঞ্চল হইয়াছে। সে-দৃশ্য জড় নয়, প্রত্যক্ষ চেতনাময়—নেত্রপথে চৈতন্যকেও স্পর্শ করে।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন শিলিগুড়ি হইতে যাত্রা করিলাম তখন পর্ব্বতমালা অন্ধকারে অস্পষ্ট; আমি মুক্ত প্রান্তরসীমায় কুটীর ও বৃক্ষশ্রেণী দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। পর্ব্বত-পৃষ্ঠে তখন কুহেলি-লীলা, বৃক্ষপত্রাদি নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু পাদদেশে বৃক্ষ ও কুটীরশ্রেণীর অবকাশে এক অতি অপূর্ব্ব আলোক সঞ্চারিত হইয়াছে, সে আলোক অতি নির্ম্মল স্বর্ণ-বর্ণ—এবং অতিশয় কোমল। যেন জ্যোৎস্না ও সূর্য্যরশ্মি এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার আলোকে সমুদয় স্থানটি ঝলমল করিতেছে! আমি ক্রমাগত পর্ব্বত হইতে দূরে—দক্ষিণাভিমুখে—প্রয়াণ করিতেছিলাম, পর্ব্বতভূমির জন্য মনে অতিশয় আক্ষেপ হইতেছিল; একদিনের পরিচয়ে, মুহূর্ত্তের দর্শনে, আমি এই পার্ব্বতী নিসর্গ-শোভাকে হৃদয় দান করিয়া আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখে বড় কাতর হইয়া পড়িলাম।

যে-পথে যাত্রা করিলাম, তেমন পথ ভারতবর্ষে বোধ হয় অতি অল্পই আছে। অতিশয় প্রশস্ত পাকা পথ, দুই পার্শ্বে দীর্ঘ বৃক্ষ-বীথি—অধিকাংশই কদম্ব; এই পথ নাকি দার্জ্জিলিং হইতে পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গঙ্গার কূলে পৌঁছিয়াছে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সহিত যুক্ত হইয়াছে। প্রভাত-কাকলি-মুখর, সদ্য-রবিকরোজ্জ্বল, মলয়ানিল-হিল্লোলিত এই তরুবীথির মধ্য দিয়া অতি মন্থরগতি মহিষ-যানে যখন পথ অতিবাহন করিতেছিলাম, তখন সেই পর্ব্বত-স্বপ্ন চোখের সম্মুখে যতই মিলাইয়া যাইতে লাগিল, মনের মধ্যে ততই গভীর ও স্ফুটতর হইয়া উঠিল। আকাশের অতি সন্নিকটে রম্য গিরি-নিবাস কৈলাসের কথা মনে হইল; ঝরণা ও ফার্ণ-পত্রের শোভা, মেঘের খেলা, কত বর্ণের কুজ্ঝটিকা! মনে হইল সেই সকল তুষারমণ্ডিত শৈল-সোপান—যেখানে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে গৌরীর হাত ধরিয়া মহেশ পাদচারণা করেন। একদিকে অতলস্পর্শ খদ, অপর দিকে অভ্রংলিহ শিখরমালা; ক্ষণে ক্ষণে মেঘ-মৃদঙ্গের সুগম্ভীর স্নিগ্ধ-নির্ঘোষ; আলো ও ছায়ার লুকাচুরি, হেম-মরকত-পদ্মরাগের রঙমহাল!—কত অলোকসুন্দর অলকা-চিত্র আমার মানস-পটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আমার কল্পনা যেখানে সবচেয়ে বেশী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে ওই পর্ব্বত-পৃষ্ঠ নয়—নিম্নে গিরিপাদ-মূলে যে সমতল ভূখণ্ড দেখা যাইতেছে—যেখানে তরুশ্রেণী কখনো বর্ষণ-ধূসর, কখনো আচম্বিত রবিরশ্মিসম্পাতে সমুজ্জ্বল—সেই স্থানটি বড়ই মধুর, বড় মনোমোহকর বোধ হইতেছিল। ওইখানে যে-জীবন যাপন করা যায় সে কেমন? পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত উদার মূর্ত্তির সম্মুখে, কর্ষণ ও গো-মেষ-চারণ-যোগ্য ভূমিতলে, মেঘ ও রৌদ্রের লীলা-নিকেতনে, বিরল-বসতি, মুক্ত-নির্জ্জন প্রান্তরপ্রদেশে, বন্ধুরগাত্রী ধরণী-জননীর উৎসঙ্গে যে মানব-সমাজ বাস করে, তাহাদের হৃদয় কি তেমনই সরল, প্রফুল্ল ও উদার—মানসপটে আলোক ও ছায়ার এমনই চকিত গতি? অশ্রু ও হাসির ধারা তথাকার রৌদ্র ও বর্ষার মতই ক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন? চিন্তার জটিলতা বা আকাঙ্ক্ষার বক্রতা নাই—স্বভাব-সুন্দর, অসভ্য-সরল, আচার-মুক্ত জীবন; বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য, প্রতিশোধের ভীষণতা, ও প্রেমের অকুণ্ঠতা উহাদিগকে কিরূপ সুখ-দুঃখের অধিকারী করিয়াছে? গাছে যেমন ফুল ফুটিয়া, ফল ধরিয়া পাকিয়া ঝরিয়া যায়, উহারা তেমনই স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট জীবন যাপন করিয়া শেষে কাল-ধর্ম্ম পালন করে। আমার মনে হয়, শুধুই দেহের নয়—মনের স্বাস্থ্য উহাদেরই আছে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া ঐ ভূস্বর্গ হইতে এখনও নির্ব্বাসিত হয় নাই।

রোমান্স

প্রাচীন বৃক্ষ, বৃহৎ জঙ্গল দেখিলে আমার ভাবাবেশ হয়। মনে হয়, কত ইতিহাসপ্রথিত ঘটনার ইহারা নীরব সাক্ষী, অথবা রঙ্গভূমি! বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদিগকে মনে পড়ে—পদচিহ্ন-গ্রাম, মহেন্দ্র ও কল্যাণীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়, সন্তানদিগের দুর্গম অরণ্যনিহিত মঠ। কেন জানি না, আমার একাল ভাল লাগে না—বোধ হয়, কর্ম্মবিমুখ, অলস-স্বভাব বলিয়া। আমার প্রাণের মধ্যে সেকালের জন্য একটি চিরোত্থিত ক্রন্দন আছে। দেবসেবা, অতিথিসেবা, গৃহলক্ষ্মীদের পরিজনসেবা, সান্ধ্য-সঙ্কীর্ত্তন, গ্রাম্য উৎসব—ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালাপ, যুবকের মল্লক্রীড়া, পূজামণ্ডপ, ঝুলনমঞ্চ,—বাউল ও কীর্ত্তনের পদাবলী, মন্থরগতি তরণীযোগে বিদেশ-যাত্রা, নিবিড় শান্তি ও সুচির বিশ্রাম—এ সকলই আমাকে স্বপ্নাবিষ্ট করে। সেই ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মৈত্রী, পূজ্যজনের পূজা, সতীর আত্মোৎসর্গ, গৃহস্বামীর বহুপোষ্য-প্রতিপালন—সেই সামাজিকতা—সে কোথায়! ভাল লাগে না কেবল পতি-পত্নীর সম্বন্ধটা—কেমন যেন আড়ষ্ট বদ্ধ-ভাব! সেকালে কি প্রেম ছিল না?—পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গীর কালো কোঁকড়া চুল, জোড়া ভুরু—এসব বিফলে যাইত? বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়—সেকালে পরকীয়া-প্রীতি একটু বেশী ছিল—হায়, সেকাল!

লক্ষ্মীহীন

সেদিনের একটা কথা কেবলই মনে হইতেছে, তাই লিখিয়া রাখিলাম। শহরের বাসায় একদিন বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া চাকরের হাতে দিতেছি, এমন সময়ে বন্ধু বলিলেন, "ও টাকাটা রেখে দিন—দেখচেন না, সিঁদুর-মাখা লক্ষ্মীর টাকা! কার লক্ষ্মী ছেড়ে গিয়ে আপনার কাছে এসেছে।" আমি আগে লক্ষ্য করি নাই, দেখিলাম, সত্যই ত! তখন একটু আমোদ বোধ করিয়া আর একটা টাকা দিলাম—সে টাকাটা দিলাম না। তারপর একদিন হঠাৎ দেখি সে টাকাটা নাই, আবার কোন্ সময়ে দিয়া ফেলিয়াছি—সাবধান হই নাই। মনে পড়িল, তাহার একটা দিক যেমন সিঁদুরে লেপা ছিল, অপর দিক্ তেমনই একেবারে পরিষ্কার, তাই এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া চোখ এড়াইয়া গেছে। তবে কি কুসংস্কার সত্য? ঐরূপ টাকার সঙ্গে কোন দৈব-শক্তি যুক্ত আছে?

থাক্ বা না থাক্, আমার কল্পনা উধাও হইয়া গেল। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে টাকা রাখা আমাদের কুললক্ষ্মীদের একটি বড় প্রিয় অভ্যাস, তাহা জানিতাম;

সে টাকা রক্ষা করাও তাঁহাদের ধর্ম্ম। "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী"-নামক উপন্যাসে ইহাকেই অবলম্বন করিয়া এমন একটি কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—আমার মনে হয়, সমগ্র পুস্তকে ওই ঘটনাটির মত হৃদয়দ্রাবী আর কিছু নাই। তখন তাহাই স্মরণ হইল—মনে হইল, সে কোন্ অভাগিনী, কোন্ লক্ষ্মীহীনের গৃহলক্ষ্মী, যে একদিন সাশ্রুনেত্রে তাহার পবিত্র কপর্দ্দক-মঞ্জুষা হইতে কমলার এই অভিজ্ঞান-বস্তু বাহির করিয়া দিয়াছে! সে-দিন বুঝি আর কাটে না, পতি অথবা পুত্র অভুক্ত থাকিয়া যান। তাই-বা কতক্ষণ? যে অবস্থায় ঐ টাকাও বাহির করিতে হয়, তাহার অল্পকালের মধ্যেই, মান অথবা প্রাণ দুইয়ের একটা ছাড়িয়া যাইবেই।

আমার মনে হইল, আমি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি,—অতিশয় শুষ্ক মলিন শোককাতর মূর্ত্তি; কত দুঃখের দিন বাঁচাইয়া অবশেষে ওই চরম অবস্থা! লক্ষ্মী অনেকদিন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আজ একেবারে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া অন্য ঘরের সন্ধানে চলিয়াছেন। হঠাৎ পথ ভুলিয়া আমার বাক্সে! কিন্তু এখানে টেঁকা ভার, তাই অন্য কাহারও সন্ধানে, খিড়কির দরজা খুলিয়া কখন বাহির হইয়া গেছেন, জানিতেও পারি নাই। —পরের হাতের সিঁদুর পরিয়া আমার ঘরে কেন? দেখিলে ত'—আমি সে লোক নই!

জ্যোৎস্না-গোধূলি

চন্দ্রালোকের একটি বিশিষ্ট-মধুর প্রকৃতি এই যে, উদয়কালে এই জ্যোৎস্না কেমন অলক্ষিতে ও অতর্কিতে পৃথিবী প্লাবিত করে! গোধূলির স্বল্পক্ষণস্থায়ী স্বচ্ছ অন্ধকার কখন যে অন্তর্হিত হয়, কখন যে পত্রান্তরালে পথের উপর সুধাধবল অংশগুলি ফুটিয়া উঠে, তাহা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। স্নেহের, প্রেমের ধর্ম্মও এইরূপ—এমনই অতর্কিতে জয় করিয়া লয়, তাহাতে বিজিতের কি আনন্দ! এই আচম্বিত শশিরশ্মিপাত আমাকে চিরদিন বিস্ময়ানন্দে বিভোর করে।

বাঙালীর মেয়ে

বাঙালীর মেয়ের সৌন্দর্য্য কেমন?—সন্ধ্যার মত; লজ্জা, কোমলতা ও নম্রতার ছবি। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষু ডাগর, চাহনি অবনত; চুল কালো, কোঁকড়া, একরাশ; দেহ উন্নত নয়, পা' দুখানি ছোট; সব চেয়ে চমৎকার তার চাহনি—বিদ্যুন্ময় নয়, স্নেহদীপ্ত। কপালের টিপটি হইতে পায়ের আলতা.

পর্য্যন্ত কোনখানে শ্লীলতা ও সৌকুমার্য্যের অভাব নাই। আমি খাঁটি বাঙালীর মেয়ের কথাই বলিতেছি—পল্লীবাসিনী গৃহস্থবধূর কথা, নাগরিকাদের কথা নয়। কালিদাস যে শকুন্তলার ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা যদি কোথাও থাকে তবে বাঙালীর ঘরেই আছে—কালিদাস কি বাঙালী ছিলেন? বাঙালীর মেয়েকে দেখিলে সৌন্দর্য্যশরাহত হইয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িতে হয় না বটে, কিন্তু স্নেহভরে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়; দাম্পত্য-সুখে বাঙালীর মত সৌভাগ্যবান কেহ নাই।

ফুলের হাসি

গেলাসের আকৃতি বেগুনি-নীল ফুলগুলি আমার বড় ভাল লাগে। সকলের নাম জানি না, প্রায়ই বন্যলতায় ফুটিয়া থাকে, দেখিলেই ভাবাবেশ হয়। আজকাল মাঠে-ঘাটে—বিশেষতঃ জলাভূমিতে একরূপ ঐজাতীয় (ইংরাজী Ipomea) ফুল দেখিতে পাই—ছোট, অল্প-নীল, গোলাপী রঙের কল্‌মী-ফুল। সেদিন দেখিলাম, এক জায়গায় জল শুকাইয়া, মাটি শক্ত অথচ ভিজা রহিয়াছে; মাঠের মধ্যে খাত কাটিয়া পথ, তাহারই এক স্থানে এক পার্শ্বে একটিমাত্র ঐ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—একেবারে একটিমাত্র! বাতাসে একটু একটু দুলিতেছে। আমার তাহাকে সোহাগ করিতে ইচ্ছা হইল; ভাবিলাম, ছিঁড়িয়া বুকে গুঁজিয়া রাখি, কিন্তু পারিলাম না—দেখিলাম, সে অনুরাগ নিঃস্বার্থ। সে মূরের "Last Rose of Summer" নয়, বরং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Fair as a star when only one is shining in the sky." সুন্দর শিশুর মুখ আর ফুল দেখিতে একই-রূপ। শিশু কেন হাসে? ফুলও ঠিক তাই। যে-হাসি চিন্তালেশহীন তাহাই প্রকৃত আনন্দের হাসি, আমরা তাহাকেই অচেতন ও নিরর্থক বলি। সে-হাসি কোন-কিছুর ভাষা বা Expression নয়—জানাইবার কি আছে? কাহাকে জানাইবে? সে যে আপনার মনেই আপনার বিলাস—যেন প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া হাস্য-জ্যোতি ধারণ করিয়াছে! প্রকৃতির প্রাণেও যেখানে মাধুর্য্য স্পর্শ করে, সেইখানেই ফুল-হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ঐ গেলাসের মত নীল ফুলগুলি আমার বড় ভাল লাগে—যেন কোন জন্মান্তর-সৌহৃদের অভিজ্ঞান বলিয়া মনে হয়।

জ্যোৎস্না-রাতে

জ্যোৎস্নারাতে বড় বড় তারাগুলি ফুটিয়া উঠে, ছোটগুলি কোথায় যায়? সুখে অধিকার বুঝি সকলের নাই! তাই সুখের দিনে ছোট-বড় ভেদ করিতেই

হইবে। দুঃখের অন্ধকারে বড় ছোটকে সহিতে পারে, তখন আর মান-জ্ঞান থাকে না; এখন এত-বড় আকাশেও সকলের স্থান হইল না, অমা-নিশীথে স্থান-সঙ্কুলানের ভয় নাই!

চন্দ্র ও চন্দ্রালোক

যখন পশ্চিম আকাশ গোলাপী থাকিতে থাকিতে চন্দ্রোদয় হয়, তখনই তাহার শোভা অনির্ব্বচনীয়! এই নির্জ্জন মাঠের উপর কতবার সেই শোভা দেখিয়াছি। কিন্তু যখন চন্দ্রকলা আসন্ন-পৌর্ণমাসী হইয়া উঠে, তখন বড় দুঃখ হয়—মনে হয় শীঘ্রই এ শোভা হইতে বঞ্চিত হইব; কারণ, কৃষ্ণপক্ষের প্রথম কয়েক রাত্রির চন্দ্রালোক পর্য্যাপ্ত হইলেও আমার মনোহরণ করে না—মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের পর চাঁদের সেই মুখ পীড়িত ও ভয়গ্রস্ত দেখায়। আবার গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকও আমি উপভোগ করিতে পারি না। তখন ধরণী সুষুপ্ত,—সেই নিস্তব্ধতা ও স্তম্ভিত চেতনার মধ্যে কোন সৌন্দর্য্যই স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। রাত্রি 'নিশুতি' হইলে, প্রকৃতির ভাব যেন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; অন্ধকার রাত্রে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, এইরূপ আলোকে তাহাই অদ্ভুত—অস্বাভাবিক দেখায়। যেন সমুদয় প্রকৃতি কোন যাদুকরের মায়ামন্ত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া আছে, চরাচরের অন্তঃপুরে কোন্ মহা-রহস্যের অভিনয় হইতেছে! মানুষ যদি হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া সেখানে উঁকি দিতে যায়, তাহা হইলে তখনই পাগল হইয়া যাইবে!

উদয়াস্ত

সূর্য্য যখন উদয় হয়, তখন পূর্ব্ব-আকাশ আরক্তিম হইয়া উঠে, পশ্চিম ধূসর থাকে—ভোরের রক্তরাগ পশ্চিম-আকাশ জানিতে পারে না। কিন্তু অস্ত-কালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকই লাল হইয়া উঠে—পশ্চিম ক্রমে গভীরতর বেদনায় আপ্লুত হয়, কিন্তু পূর্ব্বের আঁখিও যেন ভাবারুণ না হইয়া পারে না। প্রভাত যেন মাতা—বালারুণকে কোলে করিয়া হাসিতে থাকে, আবার অস্তের সময়ে মায়ের প্রাণ দূরে থাকিয়াও জানিতে পারে—প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সন্ধ্যা—সতী পত্নী, স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরে; প্রভাতের সেই উদয়-বার্ত্তা সে কেমন করিয়া জানিবে?

নির্জ্জন-বিলাপ

সেদিন মাঠের মধ্যে দূর হইতে অস্ফুট ক্রন্দন-রোল শুনিয়া নিকটে গিয়া দেখি, একটা নিম্নভূমিতে, মুখ বসনাবৃত করিয়া, এক পল্লীরমণী বিলাপ করিতেছে—সেই

চিরপরিচিত অতিশয় নিরানন্দকর শোকধ্বনি—ইংরাজীতে 'moan' বলিলে যাহা বুঝায়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সম্প্রতি তাহার একটি পুত্র মারা গিয়াছে। আর একদিন দেখিলাম, ঠিক সেইখানে বসিয়াই ঠিক সেইভাবে সে কাঁদিতেছে। ঠিক সেইখানে কাঁদিতে আসে কেন, বুঝিলাম না; বোধ হয় ঐখানে তাহার পুত্রের কবর হইয়াছে, কিন্তু তাহারও ত' কোন চিহ্ন নাই! হয় ত' নির্জ্জন বলিয়াই সেইখানে বসিয়া কাঁদে। আমাদের গভীর দুঃখ বা গভীর শোক কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছা করে না, কারণ সেখানে মানুষ সত্যই বড় একা; সে শোক অপরে বুঝিবে না—বুঝিতে পারে না, তাই কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছা করে না। মানুষের যে-দুঃখ পরে দেখিতে পায়, এমন কি অতিশয় আত্মীয় জনের নিকটেও যাহা প্রকাশ পায়, সে দুঃখ খুব বড় বা গভীর নয়।

চোখঢাকা বলদের মত

কলুবাড়ীতে 'ঘানি-গাছ' দেখিতেছিলাম। কলটা দেখার পূর্ব্বেই দূর হইতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম—গরুটা কাহারও তাড়না, এমন কি উপস্থিতি ব্যতিরেকেই আপনা-আপনি চক্রাকারে ঘুরিতেছে, সে ঘোরার বিরাম নাই। তখন বুঝিলাম—তাহার চোখ ঢাকা কেন; সে মনে করিতেছে, মনিব নিকটেই আছে, হয়ত' গাছের উপরেই শুইয়া আছে (যেমন কখন কখন থাকে), একটু থামিলেই পিঠে বাড়ি দিবে,—দেখিতে পাইতেছে না যে, কেহ নাই, অতএব সে ভয় নাই। তখন রামপ্রসাদের সেই গান মনে পড়িল—"মা আমায় ঘুরাবি কত—চোখঢাকা বলদের মত"। আমারও চোখে জল আসিল—সাধক-কবিও একদিন ঠিক আমারই মত এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন; কিন্তু আমার ভাবনা ও তাঁহার ভাবনায় কত তফাৎ! আমি ভাবিতেছি—মা, তুই আমার চোখে ওই ঠুলি দিলি না কেন? জীবনের ঘানিগাছে যখন জুড়িয়াছিস, তখন ঠুলি নহিলে চলিবে কেন? চোখে ঠুলি না থাকিলে কি কেহ অমন করিয়া ঘুরিতে পারে? আমি যে কেবল থমকিয়া দাঁড়াইতেছি, আর পিঠে তোর হাতের বাড়ি পড়িতেছে! হয়, এ ঘানিগাছ থেকে খুলে নে, আর নয় ত'—বেশ একজোড়া ঠুলি ভাল ক'রে পরিয়ে দে।

ডিভাইন কমেডি

সেদিন মাঠের উপর দিয়া এক চাঁদা হইতে আর এক চাঁদায় যাইতেছিলাম, এমন সময় নিকটে একটা নিশান (অনেক দিন বসানো হইয়াছে)—বাতাস নাই,

কিছু নাই—হঠাৎ পড়িয়া গেল। জমি জরিপ করিবার সময়ে এইরূপ চিহ্ন (চাঁদা) ও নিশানের প্রয়োজন হয়, এ দৃশ্য নূতনও নয়; কিন্তু সেদিন হঠাৎ উহা দেখিয়া আমার মনে হইল, উহার আর কষ্ট সহ্য হইল না, আর পারিল না—তাই, আমাকে দেখিয়া মুক্তি-ভিক্ষা করিয়া পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু তথাপি মুক্তি কোথায়! যেমন ছিল তেমনই করিয়া ওইখানে দিন-রাত্রি খাড়া থাকিতে হইবে। সকলে চেঁচাইতে লাগিল, "নিশান পড়িল! নিশান পড়িল!" একজন ছুটিয়া আসিয়া পুঁতিয়া তুলিয়া দিল। সকল জীবন—সমস্ত জগৎ ভরিয়া এই ভীষণ শাস্তি; 'আর পারি না, মুক্তি দাও!'—এই চির-পুরাতন ক্রন্দনধ্বনি মহাকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। ইহাই 'Divine Comedy'! দান্তের মহাকাব্যের ওই নাম যে অর্থেই সত্য হউক,—সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হইল, ইহাই সেই কাব্যের প্রধান রস—তাহার সেই Inferno-ই সত্য, আর সকলই অবান্তর। ঐ Inferno বা নরকের বর্ণনায়—ভীষণ শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কল্পনায়, দান্তের কবি-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। কোন আত্মা ইন্দ্রিয়-লালসার শাস্তিস্বরূপ প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বায়ুতে অনন্তকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেন না, জীবদ্দশায় সে এমনই ভাবে প্রবৃত্তি-ঝড়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল; কেহ বা মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত-পদ হইয়া বৃক্ষের মত অসহায়ভাবে বাহুবিক্ষেপ করিতেছে। এমন ভীষণ যন্ত্রণা ও শাস্তির বর্ণনা আর কেহ করে নাই। এই নরক-বর্ণনাতেই জীব-জীবনের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাই 'ডিভাইন কমেডি'র ওই নরক-বর্ণনা মানব-হৃদয়কে এমন অভিভূত করে—পৃথিবীর সাহিত্যে সে এক অপূর্ব্ব বস্তু! দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব, পাপ ও তাহার শাস্তি, এবং সে পাপ ও তাহার সেই শাস্তি হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই—এই আইডিয়া মধ্যযুগের সেই ইতালীয় খ্রীষ্টান-কবিকে ঋষিমন্ত্রের মত দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিল। আমি সেদিন দান্তের সমগ্র ভাবকল্পনা একমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিলাম; জগতের রঙ্গমঞ্চে নিত্যকাল যে নাটকের অভিনয় হইতেছে—যাহাকে আমরা Human Tragedy বলি, তাহাই Divine Comedy; তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া মহাকবি তাঁহার Divina Comedia রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ কবিরাই ঋষি।

জন্মান্তরীণ

অতৃপ্ত-প্রেমের মূলে আছে পূর্ব্বজন্মের association বা অনুষঙ্গ-প্রভাব। এ জন্মে সেই জন্মান্তর-সুহৃদকে চেনে না, খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু স্মৃতিজড়িত সেই

প্রেম আছে, সেই সঙ্গ-পিপাসা আছে, অথচ 'সে' নাই; যাহাকে অন্ধ-আবেগে জড়াইয়া ধরে সে আরেক জন—কাহার প্রেম দিয়া সে কাহাকে ভাল বাসিতেছে! তাই প্রেমে এত অতৃপ্তি, তাই প্রেমের রহস্য এত গভীর। ঐ জন্মান্তরীণ association-ই অনেক ট্র্যাজেডির কারণ হইতে পারে।

দুঃখের ভগবান্

সুখ বা দুঃখ যখন প্রাণের গভীরে প্রবেশ করে তখন দুই-ই এক হইয়া যায়—দুই-ই প্রেমময়ের প্রেম-পত্র; একটি—আশীর্ব্বাদ, অপরটি—ভৎর্সনা। ভৎর্সনাও ভালবাসার, কারণ, "He whom God smiteth hath God with him", অর্থাৎ "ভগবান্ যাকে মারেন, তার খুব কাছে-কাছেই তিনি থাকেন।" কিন্তু দুঃখ যখন দারুণতম হয় তখন অপূর্ব্ব করুণার স্পর্শ পাই, মনে হয়, তাঁহার চক্ষু দিয়াও জল ঝরিতেছে। আজ খ্রীষ্টের মূর্ত্তিতে তোমার সেই প্রেম-মূর্ত্তি দেখিতেছি—সেই ক্রুশ-যাতনার করুণাময় মূর্ত্তি!

চির-বালক

আমার বাল্য না যাইতেই যৌবন গেল, খেলাঘরে জরা উঁকি মারিতেছে! আমার মধ্যে যে যৌবন আসিয়াছে তাহা প্রকৃত যৌবন নয়—কৈশোরের স্বপ্ন-মরীচিকা! আমার প্রাণের মধ্যে এখনও তালপাতার বাঁশি বাজিতেছে—কিন্তু কাল যেন জোর করিয়া আমাকে যৌবনের মধ্যে, জীবন-সংগ্রামের কঠিন দায়িত্বের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। যেমন বাধ্য হইয়া ছোট ছেলেকে বড় বোঝা টানিতে হয়, আমিও তেমনই জীবনের এই বড় বোঝা টানিতেছি। এখনও সেই সকাল ও সন্ধ্যা—সেই অতিতুচ্ছ হাসি-কান্না, ভয়-ভাবনা আমার প্রাণকে টানিয়া আগুলিয়া রাখিতেছে। এখনও বাল্য-কৈশোরের সাধ মিটে নাই—সেই পূজার ছুটির সেই আনন্দ, সেই রাস-দোলের মেলা-দেখা, সেই যাত্রাশোনার আকুল আগ্রহ, সেই নিষিদ্ধ লোভনীয়ের প্রতি সভয় লোভ, লুকাইয়া নাটক-নভেল পড়া, ঘুড়ি-ওড়ানো, মাছ-ধরা—সেই সর্ব্ববিষয়ে ভয়-ভক্তি ও বিস্ময়—তাহাই যেন এখনও আমার পক্ষে সহজ ও সুখকর। নারী এখনও আমার কাছে উপন্যাসের নায়িকার মত সুদূর-দুর্লভ স্বপ্ন হইয়া থাকুক, আমি তাহার আগমনের আশামাত্র করিয়া বসিয়া থাকিব; সেই স্বপ্নই মধুর, সেই আশাই সুখ। কিন্তু সে জীবন কোথায় গেল? সে সব মুখই বা কোথায়! কোন শৈশব-সঙ্গীর পুত্রকন্যা হইয়াছে শুনিলে আমি ভয়ে বিরক্তিতে সঙ্কুচিত হই; সকলেই আপন-আপন যথাকাল-প্রাপ্ত অবস্থায় বেশ

অসন্দিগ্ধচিত্তে সন্তুষ্ট আছে বলিয়া মনে হয়; কেবল মাঝে মাঝে মুখে বলে বটে, "সে একদিন ছিল—কি সুখেই ছিলাম!" কিন্তু বেশ বোঝা যায়, এখনও কিছু মন্দ নাই। সকলেই পথ চলিতেছে, আমি কেবল পড়িয়া আছি।

যৌবন আমার দেহে আসিয়াছে, অথচ মন বালকের মত। সকলেই আমাকে সব বিষয়ে অবুঝ, এমন কি স্বার্থপর মনে করে; আমার কোন-কিছুতেই সেই আসক্তি নাই, যাহা হইতে একরূপ দায়িত্ব-বোধ জন্মে। সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তিরা যাহাকে কর্ত্তব্যজ্ঞান বা কর্ম্মনিষ্ঠা বলে তাহা আমার নাই—যে-বন্ধনকে ভালবাসা বলে, তাহাও হয় ত' আমার নাই, আমি যে বালক! এ যে আমার বাল্যজীবন! পরজীবনে যদি যৌবন আসে তবে সবই হইবে—মন, শোক করিও না, তোমারও সব হইবে—পরে। লোকে এক-জীবনে তিন-জীবন যাপন করে, তাহারা বড় তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করে। আমি এ জীবনে কেবল বাল্যই যাপন করিলাম। ক্ষতি কি?

জীবন-ধর্ম্ম

জীবনের ধর্ম্ম কি? কি উপায়ে জীবন সার্থক হয়?—অর্থাৎ, জীবনের পুরা মূল্য আদায় করা যায়? জীবনের মূলে আছে কাম, বা ভোগ-প্রবৃত্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রবৃত্তিমার্গই জীবনের ধর্ম্ম-মার্গ, কারণ সেইপথেই জীবনের পূর্ণতা বা অবসান ঘটে। শক্তিমাত্রেই স্বাস্থ্য—জীবনের শক্তিও এই প্রবৃত্তির শক্তি। যে-মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, যত দুর্দ্দমনীয়—সেই মানুষই তত জীবন্ত, তত স্বাস্থ্যবান; যাহার আকাঙ্ক্ষা যত ক্ষুদ্র, সেই তত অসুস্থ। মানুষ-মাত্রেরই ভোগলিপ্সা আছে, কিন্তু সকলের শক্তি নাই, সাহস নাই, তাই তাহারা সর্ব্বপ্রকার নীচতা ও শঠতার শরণাপন্ন হয়; তাহারাই অধার্ম্মিক, তাহারা জীবনের অবমাননা করে। যশ, অর্থ বা প্রভুত্ব যদি কাম্য হয়, তবে তাহার কল্পনাও বিরাট্ হওয়া চাই, তাহা হইলে সে কামনাও মহৎ হইবে। জীবনকে যে এমন করিয়া ভোগ করিতে পারে, সে মৃত্যুকেও জয় করে; তাহার কামনা শেষে মর্ত্ত্যলোক ছাড়াইয়া যায়,—প্রবৃত্তির বেগ যত বাড়িয়া যায় ততই তাহার ইন্ধন আর মেলে না; তখন সে জীবনের শেষ দেখিতে পায়, তাই মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে। জীবনধারণ করিয়া যে এই ভোগের শক্তি হারাইয়াছে, সে আজীবন মরিয়া আছে, নূতন করিয়া আর কি মরিবে? এই

জীবন-ধর্ম্ম যাহার মধ্যে যত প্রবল তাহার হৃদয়ও তত প্রশস্ত; আশ্চর্য্য এই যে, ত্যাগও এই ভোগেরই রূপান্তর মাত্র—এই কামই প্রেমের জন্মদাতা! কিন্তু শুধুই আকাঙ্ক্ষা নয়—ওই প্রবৃত্তির বেগ, ওই লুটিবার শক্তি চাই; কামনার সঙ্গে খুব বড় কল্পনার যোগ চাই—নহিলে, শক্তিহীন কামনার মত অভিশাপ আর কি আছে?

ভ্রাতৃবিয়োগে

কবে কোন্ জন্মে, অনন্ত জীব-যাত্রার কোন্ পথের বাঁকে, তৃষাতুর শ্রান্ত পান্থকে মুহূর্ত্তের সমবেদনায় একটু যত্ন, একটু সেবা করিয়াছিলাম—সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কে কাহাকে মনে রাখে? দু'দণ্ডের দেখা, দু'দিনের কাতরতা, ক্ষণিকের চিত্তবিনিময়—ইহাই ত' জগৎ! কিন্তু যে দেয় সে ভুলিলেও, যে পায় সে কখনও ভোলে না; স্নেহঋণ শোধ করিবার অতিমধুর আগ্রহ বোধ হয় জন্মজন্মান্তরেও ঘোচে না। এমন বন্ধন—চিরবিযুক্ত চির-বিক্ষিপ্ত হৃদয়-জনতার মধ্যে এমন আকর্ষণ-সেতু আর নাই! অনেক পথ ঘুরিয়া অনেক সন্ধান-অনুসন্ধানের পর সে একদিন আমার দুয়ারে পৌঁছিল,—জানাইতে আসিল যে, সে ভোলে নাই। গৃহ-প্রাঙ্গণে কত লোক! কাহারো সঙ্গে সম্বন্ধ আছে—পরিচয় নাই, কেহ বন্ধু, কেহ আত্মীয়; সে তাহাদেরই মধ্যে আপনিই আপনার স্থান করিয়া লইয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিল। সে জানে, আমি তাহাকে চিনি,—নূতন পরিচয় কি দিবে? তাই তাহার মূক-মৌনী ওষ্ঠাধরে কোন বাণী নাই। কিন্তু আমি তাহাকে চিনিলাম না; পাঁচজনের একজন হইয়া সেও আত্মপ্রচার করিল না। তথাপি তাহার স্নেহ কতভাবে কতদিকে আমাকে স্পর্শ করিল! আমি যে তাহার কোন হিসাব রাখিলাম না, তাহাতে সে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না—সে ত' হিসাব-নিকাশ করিতে আসে নাই! যখন তাহার যাইবার সময় হইল, তখন, যেমন অলক্ষিতে আসিয়াছিল, তেমনই অলক্ষিতে চলিয়া গেল,—কেবল যাইবার সময়ে দুয়ারে তাহার নামটি লিখিয়া গিয়াছে।

মৃত্যু

মরণ অনিবার্য্য; মরণের পরে যে অবস্থা—তাহা ভাবিতেও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। অন্ধকার শব্দহীন শূন্যতার মধ্যে প্রেত কি যাতনা সহ্য করে! আমি স্বপ্নে তাহা অনুভব করিয়াছি—একরূপ শীতল নিস্তব্ধ অন্ধকার, প্রাণের স্পন্দন-শব্দও

নাই—তাহারই মধ্যে একটা বায়ুস্রোতে অবিরাম ঘুরিতেছি; দিক্ নাই, দেশ নাই—কেহ নাই, কিছু নাই! তবু মনে পড়িতেছে, মানুষের ঘরে কত আলো, কত হাসি—কত মেলা-মেশা! সে কোন্ জগৎ? তাহারা কোথায়! সে কি সত্য, না তাহাও স্বপ্ন? যদি সত্য হয়, তবে তাহারা ত' এখনই ভুলিয়া গিয়াছে; যাহারা একবেলা অসুখ হইলে কত ভাবিয়াছে, তাহাদের কান্নাও দুইদিনে ফুরাইয়াছে, আবার পূর্ব্বের মত হাসিমুখে সংসার করিতেছে। আমি আর তাহাদের কেহ নই—তাহারা আমার মা, আমার ভাই, আমার পরমাত্মীয়! এ অবস্থা কল্পনা করিতে পারো? প্রেতের সেই অসদ্‌গতির কথা ভাবিয়া ভয় পাও? তাহা হইলে জীবনে মমতাহীন হইবার সাধনা কর; ভালবাসিও না, কেবল কর্ত্তব্যপালন কর—জীবনকে মরণান্তর অবস্থার উপযোগী করিয়া লও; কারণ, জীবন ত' ক্ষণিক, মৃত্যুর পর যে অবস্থা তাহাই অনন্ত। জীবন ভুলাইয়া রাখে বলিয়াই ত' মরণের রাজ্যে এত দুঃখ।

কিন্তু তথাপি সেই অগতির ভয়ে আমি আমার এই প্রাণকে সংকুচিত, স্তম্ভিত করিতে পারিব না। জীবনের দানই শ্রেষ্ঠ দান—জীবন যাহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দেয়, মরণ তাহাকেই প্রণতি করে। যে সত্যই স্নেহশীল, পরার্থপর, প্রেমিক, সে মরণের কথা চিন্তাও করে না; আমি তাহা নই, তাই মৃত্যু-বিভীষিকা আমাকে এমন ব্যাকুল করিয়াছে—জীবনকেও দোষী করিতেছি। যাহারা প্রেমিক নয়—তাহারাই 'মায়া'র—বন্ধনের—ভয় করে, স্বার্থপর কামনার দুর্ব্বলতা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, এবং যে-ভালবাসার শক্তি তাহাদের নাই, তাহাকে ধিক্কৃত করিয়া আপনার মরণান্তর-দশার ভয়ে জীবনেই বৈরাগ্যসাধনা করে। আমি কি করিব?

মৃত্যু ও মাতৃস্নেহ

মরণ জয় করিতে পারে না কেবল মাতৃস্নেহকে—সেই একজনের কাছে মৃত্যুও হার মানে। আর সকলের মনে স্মৃতিমাত্র থাকে; যখন স্মরণ হয়; তখন ব্যথাও জাগে; কিন্তু মৃত-সন্তানের—কেবল স্মৃতি নয়—প্রত্যক্ষ জীবন্ত অনুভূতি মায়ের প্রাণে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। যেন সন্তান মরিয়াও মরে নাই; আর সকলের নিকটে যে মরিয়াছে, মায়ের বুকে সে বাঁচিয়া থাকে। হয়ত' সে-সন্তানের অতি শৈশবে মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু মায়ের মুখে তাহার কথা শুনিও—মনে হইবে, সে যেন

আজিকার কথা! তাহার সেই মূর্ত্তি, তাহার সেই শিশু-জীবন এতটুকু অস্পষ্ট হয় নাই, ফটোগ্রাফ বা তৈলচিত্র তাহার নিকটে তুচ্ছ।

তাহার কথা বলিতে মায়ের কি আগ্রহ—বলিবার সে কি ভঙ্গি!—অপরে হয়ত' বিরক্ত হয়। মাতৃস্নেহের এই অবুঝ অন্ধতা—মৃত্যুর মত এমন কঠিন সত্যকেও স্বীকার করিতে চায় না যে-স্নেহ—তাহাই আমাদের কবির চিত্তে অতি গভীর বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মূলে আছে এই মৃত্যুজয়ী মাতৃস্নেহের বিস্ময়।

সাধারণ মানুষ

অধিকাংশ মানুষের কথাবার্ত্তা—তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাদিগকে একপ্রকার পশু বলিয়াই মনে হয়, ইহাদের মধ্যে বেশীদিন বাস করিলে বুদ্ধি ক্রমেই জড়তা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের আকাঙ্ক্ষাই বড় ক্ষুদ্র, অথচ সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্ম-চেতনাও আছে, অর্থাৎ—পশুর মত অজ্ঞান নয়। তাই ইহারা এমন অদ্ভুত জীব। কে বলিবে—ইহারাও দেহধারী পরমাত্মা, স্বর্গচ্যুত দেবতার জাতি! একথা মানি যে, এইরূপ মানুষের মধ্যেও যিনি সেই এক-আত্মার দর্শন পান, তিনিই জ্ঞানী ও প্রেমিক। কিন্তু তাহাতে ইহাদের লাভ কি? ইহাদের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুধা, সেই ভিখারীসুলভ উল্লাস ও হতাশা দেখিলে সহজবুদ্ধিতে মনে হয়, ইহারা মানুষ ও পশুর মধ্যবর্ত্তী—আমাদের দশ অবতারের প্রথম দিকের কোন একটির সঙ্গে তুলনীয়। মনে হয়, ইহাদের চিত্ত না থাকিলেই ভাল হইত, চিত্তহীন পশুও এমন মানুষের তুলনায় মহৎ। সারা জীবন ধরিয়া ইহারা যে কলরব করে তাহা একই প্রকার—অতিশয় অর্থহীন, কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকা, যেন-তেন-প্রকারেণ জীবিকা-সংগ্রহ এবং বংশ-বৃদ্ধি—এক কথায়, আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ছাড়া, নিছক জীব-ধর্ম্ম ছাড়া, ইহাদের আর কোন ধর্ম্ম নাই সবচেয়ে কুৎসিত ও কদর্য্য দেখায়—যখন সেই চরিত্রকে একরূপ শৌখিন বিদ্যার পালিশে মাজিয়া, কতকগুলি কথার পোষাক পরাইয়া, ইহারাও পরস্পরের সহিত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করে। ইহারা পশুর উপরে, এবং মানুষের নীচে—দুইয়ের কোনটাই নয়। ইহাদের জীবন অপেক্ষা উদ্ভিদ্-জীবনও পবিত্র। আমার মনে হয়, বৃক্ষ অভিশপ্ত হইলে পশুযোনিপ্রাপ্ত হয়, পশু অভিশপ্ত হইলে এইরূপ মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

ভূতে-পাওয়া

মানুষকে যেমন ভূতে পায়, আমি কি তোমাকে তেমনই পাইয়া আছি? আমাকে ভালবাসিতেই হইবে, না বাসিয়া থাকিতে পার না, উপায় নাই—আমি ভাল না বাসিলেও, এমন কি, তোমাকে সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিত করিলেও, তোমার একি মোহ! এ যেন ধর্ম্মান্ধতার মত অন্ধ অনুরাগ! অধিকাংশ হিন্দু-পত্নীর জীবনে এমন দেখা যায়। যৌবনের চন্দ্রালোকে বিবাহ একটি অন্ধকার গণ্ডি-রচনা করিয়াছে; গণ্ডির বাহিরে অজস্র আলো, মন তাহার জন্য হয় ত শোক করে; কিন্তু ঐ অন্ধকার গণ্ডির কি দৃঢ় মমতা-বন্ধন! সেই অন্ধকারে একান্তে বসিয়া দুইটি শ্যেন-চক্ষুর সম্মোহন দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। যখন মরিয়া যাইব, তখনও তোমার নয়ন-পুত্তলীর মধ্যে সেই দৃষ্টি মুদ্রিত করিয়া যাইব, নিদ্রায়-জাগরণে তাহা মুছিবে না। স্বেচ্ছায় বাঁধা পড় নাই, কিন্তু বাঁধিয়াছি—এ বন্ধন হইতে অব্যাহতি নাই; জীবনের পরিপূর্ণ-চন্দ্রালোকে এক পাশে অমানিশীথ রচনা করিয়া, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া এই প্রেতের পিপাসা মিটাইতে হইবে, অনিচ্ছায় নহে—ইচ্ছায়; ইহাকেই বলে ভূতে-পাওয়া।

বুঝা ও না-বুঝা

বুঝিতে পারার যেমন আনন্দ আছে, তেমনই না-বুঝিতে-পারার আরেক প্রকার আনন্দ আছে—যাহা অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয়, রহস্যময়, তাহার সেই রহস্যময়-তাই একটি সুগভীর আনন্দের কারণ। একটাকে বুদ্ধির দ্বারা জয় করি, তাহাতে আত্ম-চেতনা বাড়ে, তাই আনন্দ হয়; আরেকটাতে আত্মবিস্মরণ হয়—সে যেন হারিয়া-যাওয়ার আনন্দ; একটা জ্ঞানের, অপরটা প্রেমের।

বন্ধন-মুক্তি

মানব-সভ্যতার এই গৌরবময় যুগে মানুষ প্রায় সর্ব্ববিষয়ে বন্ধন-মুক্তি দাবি করিতেছে—সেই স্বাধীনতা-ভোগের নানা যুক্তি ও নীতিবাদ, নব্যদর্শন ও বিজ্ঞানের, এবং ইতিহাসেরও নূতনতর ব্যাখ্যার দোহাই দিতেছে। কিন্তু ব্যক্তির অধিকার-সীমা আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধন; সত্যকার স্বাধীনতা বা মুক্তি সাধারণ মানুষ কখনও ভোগ করিতে বা দাবি করিতে পারে না। মানুষমাত্রকেই মহামানবের আসনে বসাইয়া তাহাকে সর্ব্ববিধ বন্ধন বা নীতিসংস্কারের বশ্যতা হইতে মুক্ত-করা একটা খুব বড় কবি-কল্পনা হইতে পারে। কিন্তু ব্যাবহারিক

জীবনের দিক্ দিয়া এত বড় অসত্য বা দুর্নীতি আর নাই। এইজন্যই সেইরূপ কবি—যত বড় হউন—মানবসমাজের গুরু হইতে পারেন না; হইলে সে-সমাজ ধ্বংস হইবেই।

নিরাবরণ সত্যের আলোকে 'evil' বা পাপ নাই বটে, কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে 'evil' আছেই, তাই আর্টের স্বাধীনতা জীবনে অচল। যেখানে will আছে—কার্য্যের সু ও কু-প্রবৃত্তি আছে—কর্ম্ম আছে, ও কাম আছে—সেখানে morality বা পুলিশের শাসনও আছে। এই will-এর নির্ব্বাণই ছিল বুদ্ধের সাধনা; এই will-এর সংশোধন ছিল খ্রীষ্টের লক্ষ্য। খ্রীষ্টও কখনো সত্যকে নিরাবরণ হইতে দেন নাই, তাই কথায় কথায় "O ye of little faith !" বলিয়া শিষ্যগণকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। একমাত্র Divine Will বা perfect will-এ—অর্থাৎ, ভাগবতী কামনায় evil নাই, তার কারণ, তাহাতে অনন্ত জ্ঞান আছে। অতএব, আর্টের রাজ্য যেমন 'Beauty-Truth'-এর রাজ্য, তেমনই—মানুষের সমাজ 'Beauty-Good'-এর রাজ্য; দুইটা চিরদিন পৃথক্ থাকিবে। ব্যক্তির ব্যক্তি-অধিকার বা আত্মার অবাধ-স্বাধীনতার দুইটিমাত্র পন্থা আছে, এক—বুদ্ধের শরণ-গ্রহণ বা প্রব্রজ্যা; দুই—আর্ট বা সৌন্দর্য্যচর্চ্চা।

২

জীবন-মধ্যাহ্নে

[১৩৪১-১৩৫০]

বাল্য-জীবন

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন বাল্যের তীর্থস্থানগুলি—অতীত-জীবনের সেই সমাধিক্ষেত্র দেখিয়া বেড়াইতেছি। একেই তো জীবন ক্ষণভঙ্গুর, নিমেষ ফেলিতে কোথায় যে মিলাইয়া যাইব তাহার ঠিকানা নাই, তার উপর, এই নিমেষের মধ্যেই কত নিমেষপাত! ইহার মধ্যেও অতীত!

আমি সেই বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছি। সে যেন কালিকার কথা, কিন্তু এখনই চির-অতীতে বিলীন হইয়াছে! বিলীন হয় নাই—কেবল সেই স্থানগুলি। জানি, সেই স্থানগুলি এখনও আছে, কিন্তু সেই মুখগুলি? পৃথিবীতে কোন স্থানই লুপ্ত হয় না, কিন্তু যাহাদের সহবাসে সেই স্থানগুলি হৃদয়ের বাসস্থান হইয়াছিল, তাহারা কোথায়? সে যে আর সত্যকার বাসস্থান নয়—স্মৃতির শ্মশানমাত্র! সেই মুখ আর নাই, সে দিন আর নাই—সেই জীবনও কি আর আছে!

পাপের শাস্তি

ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ যেমন উৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তুর অধিকারী হয়েও তা ভোগ করতে পারে না, তেমনি পাপগ্রস্ত মানুষও আত্মার উৎকৃষ্ট পানীয় মুখের কাছে পেয়েও তা' পান করতে পারে না; নিজেকে সে বঞ্চিত করবেই, সাধাসাধি করলেও ঠেলে ফেলে দেবে—অমৃতও তার কাছে বিষ! পাপের এত বড় শাস্তি আর নেই।

প্রেমের সত্য

প্রেম—সত্য—শক্তি। প্রেম যদি সত্য হয়, তবে তাহা শক্তিমান হইবে—ভাব-গদগদ, sentimental প্রেম সত্য নয়; সে-প্রেমের বক্ষে বল, বাহুতে শক্তি নাই—তাহা কর্ম্মের অগ্নিতাপ বা বজ্রবন্ধন সহ্য করিতে পারে না। সে প্রেম Realist নয়, বরং Idealist হইতে পারে—অর্থাৎ, অতি উচ্চ ও সূক্ষ্মভাবে স্বার্থপর। "অহিংসা"ও একরূপ Idealism—উহার মত অ-প্রেম আর নাই।

আত্মীয়—বন্ধু—প্রেমিক

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা সম্বন্ধের মধ্যে তিনটি প্রধান, কিন্তু আমরা অনেক সময় এই তিনটির পার্থক্য ভুলিয়া নানা বিড়ম্বনা ভোগ করি। এই তিন সম্বন্ধ—আত্মীয়, বন্ধু, প্রেমিক। যাহার সঙ্গে আমরা সাংসারিক বা পারিবারিক স্বার্থবন্ধনে বদ্ধ, তাহারই নাম আত্মীয়। এই আত্মীয়তা বাস্তব-জীবনে বড়ই প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহার মধ্যে মহৎ কিছুই নাই।

যে নিঃস্বার্থ ভাবে আমার হিতসাধন করে, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে কোন দাবী-দাওয়ার সম্বন্ধ নাই, যাহার সহিত সম্বন্ধ হৃদয়ের স্বাধীন সহজ প্রেরণার বস্তু,—তাহারই নাম বন্ধু। ইহাও মূলে সাংসারিক স্বার্থজড়িত বটে, কিন্তু দুইপক্ষের মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব নাই।

যাহার সঙ্গে সাংসারিক বা বৈষয়িক স্বার্থবর্জ্জিত প্রীতির সম্বন্ধ, তাহার নাম প্রণয়ী বা প্রেমিক। প্রেম অহৈতুক; যেখানে দুইজনে পরস্পরের সহৃদয়তায় আনন্দ সৃষ্টি করে, এবং সেই আনন্দ দুই জনে মিলিয়া সমান ভোগ করে, সেইখানেই প্রেমের সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ একহিসাবে আত্মার, ইহা জীব-জীবনের প্রয়োজনের বহির্ভূত।

সৃষ্টি-চক্রের চক্রান্ত

যাহার শক্তি নাই, যে দুর্ব্বল, তাহাকে শক্তিমানের অধীন হইয়া পুতুল-নাচের পুতুলের মত চলিতে হইবে; কারণ, এই জীবন-নাট্যশালায় কেহই জড় নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারিবে না—হয়, নিজের শক্তিতে, নয় পরের শক্তির আধার হইয়া সৃষ্টিচক্রের নাগর-দোলায় দুলিতে হইবে। এই শক্তি একটা নিছক গতিবেগ; ইহাতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, স্বার্থ-পরার্থ প্রভৃতি কোন বিচার-বুদ্ধির অবকাশ নাই। সকলকেই কেবল চলিতে, চালাইতে অথবা চালিত হইতে হইবে। সেই চলাচলির মধ্যে আমরা আমাদেরই সুখ-দুঃখ বা 'অহংমমেতি'-সংস্কারের বশে নানা আদর্শ খাড়া করিয়াছি। যাহা স্পষ্টতঃ স্বার্থ-ঘটিত, সেই সকল ব্যাপারে এই শক্তির ক্রিয়া সহজেই ধরা পড়ে—শক্তিমান শক্তিহীনকে নিজের কাজে লাগাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে নিঃস্বার্থ প্রেমের ব্যাপার, সেখানেও শক্তির ঐ একই নিয়ম অব্যাহত আছে—স্থূলদৃষ্টিতে তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। নিজে কিছুই চায় না, প্রেমাস্পদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য নিজেকে

নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে—এমন যে আশ্চর্য্য আত্ম-নিবেদন, ইহার ফলে সেই দুর্ব্বল প্রেমাস্পদ (হয়ত প্রেমহীন ও উদাসীন) যে-ভাবে জীবনযাপন করে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে-জীবন আর একজনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই যে একজন অপরের জীবনে এতখানি অধিকার বিস্তার করিয়াছে—নিয়তির মতই তাহাকে বাঁধিয়াছে, সে কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চায় না, নিজের সর্ব্ব-স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, এমন কি, মহাদুঃখ বরণ করিয়া তাহার সেই প্রেমাস্পদের সেবা করিতেছে। কিন্তু তথাপি একজন অপরের অধীন, একের দ্বারা অপরে চালিত হইতেছে। অতএব জগতের সর্ব্ব ব্যাপারের মূল তত্ত্ব—শক্তি; শক্তিমান ও শক্তিহীন এই দুইয়ের যোগে এই বিরাট্ নাট্যাভিনয় চলিতেছে; ভাবিয়া দেখিলে স্বার্থ-নিঃস্বার্থ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের কোন বিচার তাহাতে নাই।

যৌবন-শেষে

যখন যৌবন ছিল তখন তুমিই খোসামোদ করিয়াছ—আমার যাহা-কিছু সবই সুন্দর দেখিয়াছ, স্বৈরিণী হইয়াও তোমার অসন্তোষের ভয় করি নাই—আমার সেই লীলাবিলাসই তুমি উপভোগ করিয়াছিলে। তখন না চাহিয়াও তোমার কৃপা লাভ করিয়াছি, তোমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় নাই। আজ আমার সেই যৌবন-লাবণ্য নাই—তোমাকে অগ্রাহ্য করিবার মত সেই মত্ততা-শক্তিও নাই; আজ আমাকেই তোমার খোসামোদ করিতে হইতেছে। আজ আমার ভয় হইয়াছে—আমিই একান্তভাবে তোমার শরণাপন্ন। যৌবনে তোমাকে না চাহিয়াও পাইয়াছি, আজ তোমাকে চাহিয়াও পাইব কি?

না-পাওয়ার দুঃখ

জীবনে আমরা অনেক না-পাওয়ার দুঃখ করি। যেন বিধাতার কার্পণ্যদোষে বা নির্ব্বিচার-দান-দোষে আমরা অনেকেই জীবনে নানা বিষয়ে বঞ্চিত হই। কথাটা যদিও বা কোন অর্থে সত্য হয়, তথাপি না-পাওয়ার আরও বড় কারণ আছে। পাওয়ার মূলে কেবল দাতার বদান্যতাই নয়—গ্রহণ করিবার শক্তিও চাই। জীবনের পশ্চাৎদিকে চাহিলে, এমন কি, বর্ত্তমানেও দেখা যাইবে—অনেক বস্তু হাতের মুঠায় আসিয়াছিল বা এখনও লব্ধ হইয়াই আছে, কিন্তু তাহার মূল্য আমরা বুঝি নাই, পাইয়াও পাই নাই। হাতের মুঠায় রহিয়াছে বলিয়া—

দুর্লভ সুলভ হইয়াছে বলিয়া—তাহার দিকে আমরা চাহিয়া দেখি না, সুদূর-দুর্লভের জন্য হা-হুতাশ করি,—যেন কে আমাদিগকে পাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াও বারবার বিফল হইয়াছে, আমি আমারই দোষে পাইয়াও পাই নাই। এই কথা ভাবিলে না-পাওয়ার দুঃখ আরও বড় হইয়া উঠে,—ইহার মত ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে ?

পাকা-খেলোয়াড়

পরিচিত বা অপরিচিত, আত্মীয় বা অনাত্মীয়—সকলের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ মূলে এক, দেনা-পাওার সম্বন্ধ। সেই দেনা-পাওনায় ঠকিলেই যত গণ্ডগোল। অনুরাগ ও ভক্তি যে-কারণে, কলহ-বিবাদও সেই একই কারণে—একটু ভিতরে তাকাইলেই দেখা যাইবে, একজন অপরের কাছে ঠকিয়াছে। স্বেচ্ছায় ঠকিলে, তাহার নাম ভালবাসা; নহিলে, যে ঠকায় সে বড় মন্দ, এবং তাহাও একজনের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। যে বুদ্ধিমান্ সে ঠকে না, তাহার কাছে মানুষ ভালও নয়, মন্দও নন—ব্যবহার্য্য বস্তু মাত্র। যাহারা বুদ্ধিমান্, অর্থাৎ যাহাদিগকে কেহ ঠকাইতে পারে না, তাহারা মানুষকে সহজচক্ষে দেখে; যখন বন্ধুত্ব করে তখন তাহাতে প্রেম থাকে না, যখন শত্রুতা করে তখনও তাহাতে বিদ্বেষ থাকে না; যাহাতে ঠকিতে না হয়, তজ্জন্য যেখানে যেমন আবশ্যক, সেইরূপ ব্যবহার করে। মানুষকে তাহারা দুষ্ট মনে করে না—বরং নির্ব্বোধ মনে করিয়া খুসী হয়। ভাবপ্রবণতা একটা ব্যাধি, তার কথা স্বতন্ত্র; যে পাকা খেলোয়াড় তাহার কাছে সবাই সমান।

সাহস ও ভীরুতা

যে সব মানুষ সত্যই বড় সদাশয়, সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা, তাহাদিগকে দেখিলে আমি লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হই, নিজেকে দুর্ব্বল মনে হয়। কিন্তু যে সব মানুষ অতিশয় নীচ, ভণ্ড ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে দেখিলে আমার যেন সর্ব্বশক্তি জাগিয়া উঠে—এই ক্ষুদ্র আমিও এক দিব্য আবেগে মহৎ হইয়া উঠি!

দুঃখ চাই

মানুষের কাছে দুঃখের চেয়ে লোভনীয় আর কিছু নাই। দুঃখ তাহার চাই-ই, নহিলে সে একদণ্ড বাঁচিতে পারে না। দুঃখের সহিত লুকাচুরি খেলিবার জন্যই সে সুখের আরাধনা করে, তাই সুখ ও দুঃখ—একটা অপরের প্রতিবাদী মিথ্যা

হইলেও, দুই-ই তাঁহার কাছে সমান সত্য; এক মিথ্যার বিরোধেই অপর মিথ্যা সত্য হইয়া উঠে! দুই-ই যদি উড়াইয়া দিই, তবে যাহা থাকে তাহা শূন্য। যতক্ষণ জীবনকে চাই ততক্ষণ ঐ মিথ্যাকেই সত্য মনে করিতে হইবে; মানুষের সঙ্গে শত্রুতা ও মিত্রতা করিতে হইবে, কষ্ট দিতে ও পাইতে হইবে, কাঁদিতে ও কাঁদাইতে হইবে। আসল কথা, ঐ দুঃখটাকে চাই-ই।

আমার নয়

এত যে ধূলা-আবর্জ্জনা সৃষ্টি করিতেছি তাহার মধ্যে তোমার পদরেণু এককণা যে কোথাও লুকাইয়া আছে—এ বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু সে কৃতিত্বও আমার নয়, কারণ—"Our best thoughts are given to us"।

প্রাণে ও মনে

মনে বুঝা ও প্রাণে বুঝা—বুঝা এই দুই রকমের। মনে বুঝিতে পারিলে পণ্ডিত হয়, প্রাণে বুঝিলে মানুষ হয়। যাহারা মনে না বুঝিয়া প্রাণে বুঝে—সেই শক্তি যাহাদের খুব বেশি, তাহারাই মহাপুরুষ; কিন্তু যাহারা প্রাণে না বুঝিয়া কেবল মনের দ্বারা বুঝিতে পারে, তাহারা সহজ বা সুস্থ মানুষ নয়; এই শক্তি যাহাদের অধিক মাত্রায় আছে, তাহারাই—আর্টিষ্ট বা শিল্পী।

নারী-সম্পর্ক

যে নারীকে প্রগাঢ় স্নেহ বা সত্যকার শ্রদ্ধা করে না—পত্নীরূপেই হোক, আর প্রণয়িনীরূপেই হোক—নারীকে ভোগের বস্তু করিবার অধিকার সেই পুরুষের নাই; যদি করে, তবে সে মহাপাপিষ্ঠ, তাহার শাস্তিও অনিবার্য্য। আর কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম বা নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

ভগবান্ নাই

ভগবান্ মানুষের মধ্যেই বাস করেন। যে-দেশে, যে-কালে সমাজে 'মানুষ' আর নাই, সেখানে ভগবানও নাই; অতএব, সেখানে পাপের শাস্তি, ন্যায়-বিচার, সত্যের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আশা করাই ভুল। এ সকল করিবে কে? ভগবান্ যে নাই!

কাব্য-নির্ম্মাণ

কবিকে যদি ভাস্করের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, কাব্য-রচনা ও মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ শিল্পকর্ম্ম-হিসাবে একই। ভাস্করের শিল্প-উপাদান যেমন

—প্রস্তর, কবিরও শিল্প-উপাদান তেমনই—মনুষ্য-হৃদয়ের কামনা-বাসনা; আর, ভাস্করের ছেদনী (chisel)-মুখে যেমন পাথরগুলা সুচ্ছন্দ ও সুডৌল রূপ ধারণ করে, তেমনই কবির অতি কঠোর সংযমী-মন সেই উপাদানগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া একটি নিখুঁত রূপ গড়িয়া তোলে।

কবির স্বার্থ

কবিমাত্রেরই কাব্যরচনায় একটা গূঢ়তর আত্মতৃপ্তি হইয়া থাকে। কবিতার মধ্যে যে-কামনার আবেগ থাকে, সেই কামনা অপরের চিত্তে উদ্রেক করিতে পারিলে একটা সহানুভূতির সুখ পাওয়া যায়—কত অপরিচিত, অদৃশ্য নরনারীর প্রাণের দোসর হওয়া যায়। তেমন কবিতা পাঠ করিয়া তাহারা কবিকে নিশ্চয় স্মরণ করিবে, তাহার সহিত গভীর আত্মীয়তাবোধ করিবে; সেও একরূপ ভালবাসা। সাক্ষাৎ সম্পর্ক ব্যতিরেকে ঐ যে ভালবাসা লাভ করা—উহা কল্পনা-জীবী ব্যক্তির পক্ষে যেমন উপাদেয়, তেমনই নিরাপদ।

পুনর্জ্জন্ম

পূর্ব্বজন্মের কথা যদি সত্য হয়, তবে একটা প্রশ্ন না উঠিয়া পারে না, অন্ততঃ তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। আত্মার বয়স নাই,—শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও জরা সে ইচ্ছামত ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলে প্রতিবারই কি আত্মা সর্ব্বসংস্কারমুক্ত, নির্ম্মল ও নগ্ন হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়? ঐ দেহটার সঙ্গে তাহার কি এমনই সম্পর্কহীনতা? পূর্ব্বজন্মের—অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদেহের সংস্কার যদি তাহাতে না লাগিয়া থাকে, তবে তো কর্ম্মবাদের কোন অর্থই হয় না; নিশ্চয়ই এ-জন্মের কামনা-বাসনা ও অভিজ্ঞতার একটা সূক্ষ্ম আবরণ সে পরজন্মেও বহিয়া থাকে। তাহা হইলে, যে জরাজীর্ণ অতিবৃদ্ধ তাহার ঐ দেহটা ত্যাগ করিল, তাহার আত্মা কি এ জীবনের সেই শুষ্ক-কঠিন স্থবিরতা, মনের সেই রুক্ষতা ও নীরসতা কিছুমাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবে না—'বায়ুর্গন্ধা-নিবাশয়াৎ'? যাওয়াই তো সম্ভব। তাহা হইলে সে আবার শিশু হয় কেমন করিয়া? আবার কৈশোরের সরলতা ও যৌবনের অবিমৃষ্যকারিতা আসে কোথা হইতে? মনে কর, এই যে বুড়াকে চিতাশয্যায় শোয়াইলাম, সে তখনই আরেক দেহে শিশুর মন লইয়া সরল মধুর হাসি হাসিতেছে! তবে কি জন্ম হইতে জন্মান্তরে মানুষের আয়ু ও বয়স বাড়িতেছে না—সে কি কোন পক্বতা বা পরিণতি লাভ করিতেছে

না? ঐ নবজাত শিশুকে দেখিয়া মনে হয় না তো যে, সে দশ হাজার বৎসরের বৃদ্ধ! পূর্ব্বজন্মবাদের বিরুদ্ধে নিত্য-নবজন্মবাদের যে যুক্তি তাহা কি এই কারণেও সহজ বলিয়া মনে হয় না?

জানি, ইহার জবাব আছে—ভাল জবাবই আছে। আত্মার সেই জন্মান্তরীণ সংস্কার নূতন শিশুদেহে বীজরূপে বিদ্যমান থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিকাশ পায়। দেহের সাধারণ ধর্ম্ম—শৈশব, যৌবন, জরা প্রভৃতির সঙ্গে এই বিকাশ-ক্রিয়ার কোন বিরোধ নাই; অতএব জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে ঐ যুক্তি চূড়ান্ত নহে।

মানিলাম, তবু ঐ শিশুর মুখপানে চাহিয়া সেই বৃদ্ধের কথা ভাবিতেছি—এ যেন একটা গভীর ছলনা বা বিরাট পরিহাস বলিয়া মনে হইতেছে। পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস না করাই ভাল।

ভাবুকতা ও ভাব-সিদ্ধি

কোন ভাব-সত্য যেমনই হোক—তাহাতে অধিকার লাভ করা বড় দুরূহ; কেবল মনে জানিলে বা বুঝিতে পারিলেই সেই সত্যের অধিকারী হওয়া যায় না। কেবলমাত্র ভাবনার দ্বারা অনেকেই তাহাকে ধরিতে পারে—ভাবুক ব্যক্তি কত নূতন ভাব-সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করে, কিন্তু তাহাতেই সেই বস্তু তাহার সত্যকার সম্পত্তি বা প্রাপ্তি হইয়া উঠে না। বরং এমনই হইয়া থাকে যে, আমরা তাহাকে জানি মাত্র, সেই জানার অহঙ্কারও করিয়া থাকি—কিন্তু তাহাকে মানি না, বিশ্বাস করি না, আমাদের কার্য্যই তাহার প্রমাণ। অতএব, Idea বা ভাব যত সুন্দর বা উচ্চ হউক, তাহার অভিমান যেন কেহ না করে,—তাহাকে নিজের অধিকারে আনিতে হইলে কঠিন সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু ইদানীং ঐরূপ সাধনাহীন সত্যের মিথ্যা-আস্ফালনে সাধু-অসাধুর ভেদ, দুর্ব্বল ও শক্তিমানের ভেদ, এমন কি জ্ঞানী ও মূর্খের ভেদও অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রাণ বড়, না মন বড়?

'আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বোঝে না', এবং 'আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না'—কোন্‌টা ঠিক? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শেষেরটাই ঠিক। প্রাণই বোঝে না; প্রাণ যদি বোঝে, তবে মন কি করিতে পারে?

তত্ত্ব ও বাস্তব—পুরুষ ও প্রকৃতি

কেবলমাত্র ভাব বা Idea-র জোরে প্রকৃতিকে বশ করা যায় না, সেখানে চাই দেহের ও মনের জোর; ভাবের মাধুরীতে ভবের 'ভবী' ভুলিবে না। যদি নদীতে

ঝড় উঠে, তখন প্রাণ বাঁচাইতে হইলে খুব ভাল ভাল ভাবের ও সুরের গান গাহিলে ঝড় শান্ত হয় না।

অর্থাৎ matterকে material শক্তির দ্বারাই জয় করা যায়; সেখানে নগদ টাকার কারবার—কাগজেও নয়, ধারেও নয়। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে পুরুষ ও প্রকৃতি—দুই তত্ত্বেরই বিচার আছে; প্রকৃতি—matter, পুরুষ—soul, mind। এই তত্ত্বটি, অর্থাৎ ঐ দুয়ের সম্পর্কঘটিত যে সত্য, তাহা সর্ব্বঘটে, সর্ব্বব্যাপারে প্রযোজ্য। সাধারণ নারী ও পুরুষের সম্বন্ধেও উহা খাটে। নারীকে প্রকৃতি-শক্তির মানুষী প্রতীক ধরা হইয়া থাকে, এবং পুরুষকে ঐ mind-এর। তাহাতেও পুরুষ ভাব বা Idea-র উপাসক, নারী বাস্তব-সত্যের একান্ত অনুরাগী,—তাহার সন্তান-স্নেহ ও স্বামী-প্রেম এই দুইয়েরই মূলে রক্তমাংসের বা হৃদয়ের ক্ষুধা আছে। কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব, ভাবের পারমার্থিক মূল্য বা মস্তিষ্কের যাদুশক্তি তাহার সেই ক্ষুধা নিবারণ করে না। নারী—Realist, পুরুষের মত Idealist নয়; যেটুকু হাতের মুঠায়, বাস্তবের আকারে পাওয়া যায়, তাহাকেই সে প্রকৃত প্রাপ্তি মনে করে। পুরুষকেও সে উচ্চ ভাব-চিন্তার জগৎ হইতে টানিয়া নামাইয়া এই বস্তু-জগতে বাঁধিয়া রাখে, সেজন্য তাহাকে বড় কলা-কৌশল করিতে হয়; তাহার সেই স্বপ্ন না ভাঙাইয়া, বরং তখন তাহারই পরিচর্য্যা করিয়া সে পুরুষকে এই বাস্তবের অন্ন-পান ভোগ করাইয়া লয়,—যেন সেই নির্ব্বোধকে ভুলাইয়া তাহাকে স্বহস্ত-প্রস্তুত পরমান্ন খাওয়াইয়া সে সুখী হয়। সে যে তাহার কি সুখ তাহা সে-ই জানে! পুরুষকে শিকার করিবার জন্য সে কত ফাঁদই পাতে! আপনাকেই দুঃখের তীক্ষ্ণ বড়শীতে 'টোপ'-রূপে বিঁধাইয়া সে পুরুষ-মৎস্য শিকার করে, নিজেকেই বিলাইয়া, ধরা দিয়া, সে পুরুষকে ধরে! পুরুষ সেই 'টোপ' গিলিয়া মনে করে—সে নারীকে আপন অধিকারে পাইয়াছে,—নারী অপেক্ষা সে-ই শক্তিমান্, সে তাহার প্রভু হইয়াছে; কিন্তু আসলে সে যে ভয়ানক বোকা বনিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারে না।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। নারী—প্রকৃতি, তাহার সহিত ভাব-তত্ত্বের কারবার চলে না। সেখানে দেহ ও মন (দুই-ই দেহ)—হৃদয় ও হিসাব-বুদ্ধি দুইয়েরই প্রয়োজন খুব বেশি; দেহধর্ম্মী বা রীতিমত সংসারী, বিষয়ী হইতে হইবে। যত কিছু বৈষয়িক সম্পদ্—ধন, মান, প্রভুত্ব—সকলই প্রকৃতির উপাসনা, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, ভাব-সত্যের বাতিকগ্রস্ত না হইয়া প্রকৃতির নিয়মাধীন বা প্রকৃতিস্থ হইতে হইবে।

তথাপি, শক্তিমান্ পুরুষের পক্ষে ইহাও একটা খেলা ; প্রকৃতির সহিত প্রেম-করা সত্ত্বেও যে আত্মস্থ থাকিতে পারে, সেই পুরুষ প্রকৃত রসিক, প্রকৃত শক্তিমান্। অর্থাৎ, পুরুষকে একই কালে বদ্ধ ও মুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যে কেবল ভাব-বিলাসী, Idealist—সংসারে তাহার মত অপদার্থ, এমন কি, অনেক সময়ে ঘোর অনিষ্টকারী আর কেহ নাই। যাহার ভোগপিপাসা আছে, অথচ ভাবই যাহার একমাত্র সম্বল—মিথ্যাচারী বলিয়াই তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া থাকে।

* * *

কিন্তু অতি-উচ্চ ভাবও শক্তিযুক্ত হইলে বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। সেই শক্তিও পুরুষের নিজস্ব সম্পদ্—তাহারই আত্মশক্তি। সেখানে সেই ভাবকে একটা বস্তুর মত হাতের মুঠায় বদ্ধ করিতে পারা চাই, কোন ভাব বা Idea-কে যদি তেমন করিয়া ধরিবার সামর্থ্য থাকে, তবে তাহাকেও প্রকৃতির বৃক্ষশাখায় ফলাইয়া তোলা অসম্ভব নয়। অনেক শক্তিমান্ পুরুষ তাহা করিয়াছে—বড় বড় ভাব-বীজকে প্রকৃতির বক্ষে বপন করিয়া তাহাকে ফলবান করিয়াছে। যাহা একটা ভাবমাত্র, অর্থাৎ পুরুষের মস্তিষ্কজাত একটা অ-প্রাকৃতিক তত্ত্ব, তাহাও যে এমন বাস্তব-সত্যের রূপ ধারণ করে, ইহাতে প্রমাণ হয়, শেষ পর্য্যন্ত ঐ প্রকৃতি-পুরুষ mind ও matter মূলে একই ; বাস্তব যেমন সত্য, সত্যও তেমনই বাস্তব। ইহার ব্যতিক্রম হয় তখনই, যখন তাহা শক্তিযুক্ত হয় না। প্রকৃতিতে শক্তি নিত্যযুক্ত, তাই তাহার সর্ব্বদাই একটা বাস্তব-মূল্য আছে ; কিন্তু ঐ Idea বা Ideal তাহা নহে ; এজন্য তাহাতে আত্মশক্তি বা প্রকৃতি-শক্তি যুক্ত না হইলে তাহা একটি ব্রহ্মডিম্ব বা বায়ুবিম্ব মাত্র।

একমাত্র

পাপ করিতেও দোষ নাই, যদি তাহাতে পুণ্যের ভান না থাকে। চাই সত্য ; সত্য পাপেও আছে, আবার পুণ্যেও না থাকিতে পারে। আসল কথা, সবকিছু করিবার অধিকার মানুষের আছে—নাই কেবল ভণ্ডামি করিবার।

স্বামী-স্ত্রী

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজভেদে ও শাস্ত্রভেদে বিভিন্ন আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দাম্পত্যের মধ্যে নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক বা সেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলবৎ থাকিলেও, পুরুষ ঐ প্রকৃতিকে আপন ভাব-চিন্তার দ্বারা যে একটা ধর্ম্মের অধীন করিয়াছে

—প্রথমে ঐ সমাজ, পরে তাহার আত্মার প্রয়োজনে, বিবাহ-বিধিকে একটা বড় মর্য্যাদা দান করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীকে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ, দুইয়ের কল্যাণ অন্যোন্যসাপেক্ষ; ভাগ্য যেমন একসূত্রে গ্রথিত, তেমনই, একের শুভাশুভ অন্যের হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ নহে। তত্ত্বের দিক্ দিয়া যদি বা ইহা সত্য হয়, তবু কার্য্যতঃ ঐ দুইজনকে এক করা যায় কেমন করিয়া? নারী ও পুরুষ—দুইয়ের প্রকৃতি-ধর্ম্ম সমান নয়, আবার, কেহই কাহারও তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়; তাহা হইলে দুইয়ের অধিকার এক হইতে পারে না, এবং যুগ্ম-জীবনের কোন অর্থ হয় না। দম্পতির একজন যদি অপরকে কিছুমাত্র পিছনে বা নীচে রাখে, তবে তাহার নিজের সাধনাও নিষ্ফল হইবে, স্বামী-স্ত্রীর যুগল-জীবনে যে সিদ্ধিলাভ আত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল, তাহা হইতে উভয়ে বঞ্চিত হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই হয়, অতি অল্প ভাগ্যবান্ পুরুষ ও নারীর জীবন তেমন সার্থক হইতে দেখা যায়।

ঐ তত্ত্ব ব্যাবহারিক জীবনে সত্য হইবার উপায় আছে, যদিও সহসা বিপরীত বলিয়াই মনে হয়। ব্যাবহারিক জীবনে দম্পতির একজনকে অপরের অনুবর্ত্তী হইতে হয়; ভিতরে সেই সম্পর্ক প্রেম, স্নেহ ও শ্রদ্ধার পূর্ণ সাম্যের উপরে যতই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, বাহিরে, সংসার-সংগ্রামে, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বে, স্ত্রীকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ ছন্দানুবর্ত্তিনী হইতে হয়—অন্ততঃ শেষ দায়িত্ব তাহার উপরেই ছাড়িয়া দিতে হয়। স্ত্রী যদি প্রকৃত সহযোগিনী হইবার মত শক্তি ও বুদ্ধিশালিনী হয় তবে সমস্যা মিটিয়া যায়; কিন্তু নারীর প্রকৃতি ও শক্তি স্বতন্ত্র, পতিকে পত্নী যে সাহায্য এবং শক্তি দান করে তাহা মস্তিষ্কজাত নয়, তাহা স্নেহের শক্তি, প্রেমের শক্তি, অসীম বিশ্বাসের শক্তি; সেই বুদ্ধিও হৃদয়জাত, তাই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব-ভাব নাই—আছে সেবা ও আত্মোৎসর্গ। অতএব, বাহিরে স্বামীর ঐ যে কর্ত্তৃত্ব বা প্রাধান্য, তাহার মূলে থাকা চাই পত্নীর ঐ আত্ম-নিবেদন; উহা প্রেমমূলক, তাই উহাতে যেমন হীনতা বা অধীনতা নাই, তেমনই সেই যুগল-জীবনের সাধন-বেদিকায় পত্নীর ঐ আহুতিই এক অর্থে অধিকতর গরীয়ান্।

এই ভিতরের দায়িত্ব নারীর, পুরুষের দায়িত্ব বাহিরের। অধুনা এই দায়িত্ব-ভাগ না মানিবার যে অধীরতা নারী-বিদ্রোহের কারণ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এখানে কোন মন্তব্য করিব না, কেবল ইহাই বলিব যে, দায়িত্ব উভয়েরই সমান,

সে বিষয়ে নারীর হীনতাবোধের কোন কারণ নাই। এই দায়িত্ব-স্বীকারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ধর্ম্মপালন অপেক্ষাকৃত সহজ—যদি সে তাহার সেই প্রকৃতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করে। প্রকৃতির কথা বলিতেছি এইজন্য যে, নারী ও পুরুষ এক-জাতি নয়, এজন্য সর্ব্ববিষয়ে দায়িত্ব ও অধিকার সমান হইলেও, উভয়ের ক্ষেত্র এক হইতে পারে না,—শক্তিও যেমন একপ্রকার নয়, কর্ম্মও তেমনই এক হইতে পারে না। নারী সর্ব্বদা পুরুষের পাশে দাঁড়াইবে—ইহার অর্থ এই নয় যে, সে সমানধর্ম্মা ও সমানকর্ম্মা হইবে ; সমানকর্ম্মা হইলে ঐ মিলন সম্পূর্ণ বা সার্থক হয় না, কারণ, তাহাতে সেই সহযোগিতাও প্রতিযোগিতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। অতএব, আমি যাহাকে প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট বলিয়াছি তাহা যদি মিথ্যা বা অসঙ্গত হয়, তবে নর-নারীর যুগল-জীবন ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে—সমাজ ও সংসারের খিলান ভাঙিয়া যায়, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই উগ্র হইয়া উঠে। এইরূপ ভাঙিয়া ফেলার প্রয়োজনই যদি মানিতে হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্কের আলোচনাই অনাবশ্যক।

যাহা বলিতেছিলাম। উপরে যে দায়িত্বের কথা বলিয়াছি, ভাবিয়া দেখিলে সেই দায়িত্ব শেষপর্য্যন্ত পুরুষেরই। এ যেন, দুইজনের একজন বলিল, আমার যাহা কিছু আছে—শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ্ সব তোমাকে নিঃস্বত্ব হইয়া দান করিলাম, তুমি যেমন আবশ্যক ও উচিত বিবেচনা কর, যুগল-জীবন-যজ্ঞে তাহা নিয়োজিত কর ; তোমার কল্যাণ আমা হইতে পৃথক্ নয়, এবং আমি বিশ্বাস করি, সে কল্যাণ তোমার দ্বারা কখনো ক্ষুণ্ণ হইবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই 'মহাদান' বা সর্ব্বসমর্পণ নারীরই অসাধারণ শক্তিতে সম্ভব—এ শক্তি পুরুষের নাই। কিন্তু নারী সেই মুহূর্ত্তেই নিশ্চিন্ত হইল, তাহার আর কোন ভাবনা রহিল না। কিন্তু অতঃপর পুরুষের কি অবস্থা! ভিতরের দায়িত্ব নারী পালন করিল, পুরুষকে প্রেমের ও বিশ্বাসের শক্তিতে শক্তিমান্ করিল। এইবার পুরুষকে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে হইবে আর এক শক্তির দ্বারা—বুদ্ধি, বিবেক এবং পৌরুষ বা কর্ম্মশক্তি ; সংসারে বা বহির্জীবনে একাই দুইয়ের সকল ভার বহন করিয়া, বড় সতর্ক ও দৃঢ়পদক্ষেপে তাহাকে চলিতে হইবে—পাছে কোন কারণে পদস্খলন হয় ; তাহা হইলে শুধু নিজের নয়, আরেক জনেরও সর্ব্বনাশ হইবে! এ কত বড় দায়িত্ব! যদি সে মানুষ হয়—সত্যকার পৌরুষ ও ন্যায়ধর্ম্মবোধ তাহার থাকে, তবে, শুধুই নিজের নয়, আরেক জনের সর্ব্বনাশ করায় ভয় তাহাকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিবে। অথচ এ দায়িত্ব তাহারই ; পুরুষের পক্ষে উহা যদি

গৌরবেরও হয়, তথাপি উহার মত গুরুতর ও দুরূহ আর কিছুই নাই ; এ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করাই ভাল। অতএব, সত্যকার দাম্পত্য-জীবন যেমন সুখের জীবনই নহে—একপ্রকার তপশ্চর্য্যা বলিলেও হয়, তেমনই, পতি ও পত্নীর মধ্যেও অধিকার লইয়া যে বিবাদ, তাহাও অর্থহীন।

অদ্ভুত আনন্দ

প্রিয়জনের নিকটে বিদায় লইবার সময়ে (হয় তো তাহাই চির-বিদায়) কেহ কেহ হাসিমুখে, যেন আনন্দোৎফুল্লভাবে তাহা করিয়া থাকেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, ঐ ব্যক্তি হৃদয়ের গভীর ব্যথা দমন করিবার জন্যই জোর করিয়া আনন্দের ভান করিতেছেন, পরে অসাক্ষাতে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবেন। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, ঐ ব্যথা যত গভীর, তাহার হৃদয়ের শক্তিও তত অসীম—দারুণতম দুঃখে যে হাসি মুখে ফুটিয়া উঠে তাহা ভান নয়, ভাবগোপন নয়, সত্যই তাহা আনন্দের হাসি। কোন অনুভূতি যখন অতিশয় প্রবল হয়, তখন সেই প্রাবল্যের বেগে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়, যেমন—খুব জোরে টানিলে, বা বন্ধন অতিরিক্ত হইলে, তাহা আপনিই ছিঁড়িয়া যায়। তেমনই, দুঃখ যখন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তখন তাহাতে আর বেদনা থাকে না, প্রাণ সহসা মুক্তি বোধ করে, তাই অদ্ভুত আনন্দ-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাকেই বলে সব-হারানোর আনন্দ।

অ-মানুষ

যে নিজে মানুষ, সে মানুষ ও অ-মানুষ দুইয়ের সঙ্গেই সমভাবে মিলিতে পারে ; যে নিজে অ-মানুষ, সে শুধু মানুষের কাছে টিঁকিয়া থাকিতে পারে, অ-মানুষের কাছে বিষম বিপদ্।

যোগানন্দ

আমার যে-লেখাগুলি আমার মতে উৎকৃষ্ট, সেগুলি কেউ বোঝে না, যেন ছাপা হইয়া আমার নিকটেই ফিরিয়া আসে। তখন আবার সেই লেখাগুলি পড়ি—পড়িয়া যে আনন্দ পাই, মনে হয়,—সে আনন্দের অধিকারী আমিই, আর কেহ নয়। দুঃখ-শোকে যেমন, আনন্দেও তেমনই—মানুষ যখন চরম বা পরমকে পায়, তখন সে অতিশয় একা ; সেই একাকীত্ব, সেই 'একোঽহম্'-জ্ঞানই তো পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ। সে আনন্দ আমারই, আর কেহ তাহার অংশীদার

নয়; তাহাই যোগানন্দ—অপরের সহিত ভোগ করার প্রেমানন্দ নয়। ঐ লেখাগুলির মধ্যে যে সত্য-সুন্দরের রস আছে তাহা আমার 'হ্লাদিনী' আমার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছে—সেই সুন্দরী সতীর কটাক্ষ আর কাহারও জন্য নহে।

ঠুলি-পরা চোখ

যাহারা অতিরিক্ত স্বার্থপর এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান্ তাহারা মানুষের দোষ ও দুর্ব্বলতা উত্তমরূপে বুঝিয়া লয়, অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে; নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা স্বার্থহানির ভয়ে, সেই দোষগুলার সম্বন্ধেই তাহারা সর্ব্বদা সচেতন থাকে। ইহারা মানুষ চেনে বটে, কিন্তু সে চেনায় আসল মানুষটাই বাদ পড়িয়া যায়। আবার ইহাদের 'আত্ম-পর'-ভেদ বড় বেশি বলিয়া, আপনার জনকেও অন্ধভাবে মমতা করে, তাহাদিগকেও চেনে না।

বড়বাজার

প্রকৃতির পণ্যশালায় পুরুষ ক্রেতা, নারী বিক্রেত্রী। পুরুষ তিন শ্রেণীর :—

(১) যে-পুরুষ কিছুই ক্রয় করে না—সুন্দরী পণ্য-বিক্রেত্রীর কোন আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় না।

(২) যাহারা ক্রয় করে, কিন্তু নগদ মূল্যে—অর্থাৎ সকল দেনা-পাওনা সঙ্গে-সঙ্গেই মিটাইয়া দেয়।

(৩) যাহারা নগদ-মূল্য দেয় না—ঐ আপণ-স্বামিনীর নিকটে বহুঋণে ঋণী হইয়া থাকে। এই তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষই দুঃখ পায়, কারণ, ঐ ঋণ হইতে কাহারও নিস্তার নাই, উহা পরিশোধ করিতেই হইবে।

প্রথম শ্রেণীর পুরুষ—উদাসীন, সন্ন্যাসী। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাহারা, তাহারা শক্তিমান্ ভোগী। তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষ দুর্ব্বল, তবু সংসার-সুখ ভোগ করিবে। ইহারা নারীকে বহুপ্রকারে কষ্ট দেয়; নারী তাহা সহ্য করে, অর্থাৎ অকাতরে ঋণ দিয়া থাকে; কিন্তু সেই ঋণ জন্মজন্মান্তরেও তাহাকে শোধ করিতে হইবে। নারী যদি ঐ ঋণ না দিত, তবে এমন দুঃখ পাইতে হইত না।

দুঃখের আসন

দুঃখের আসন মানুষের বুকে : সেই বুক যদি বড় হয়, তবে দুঃখ রাজমুকুট পরিয়া রাজাসনে বসে; আর যদি সেই বুক ছোট হয়, তবে দুঃখ অতি ইতর, কুৎসিত রূপ ধারণ করে।

আত্মাশক্তি

শক্তির প্রকাশ শুধুই বিক্রমে বা দুর্দ্দমনীয়তায় নহে। আমরা বিক্রমকেই শক্তির প্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু যে-শক্তি সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করে বলিয়াই জগৎ টি'কিয়া আছে, তাহার লক্ষণ ঐরূপ বিক্রম বা জয়-গর্ব্ব নয়—তাই প্রত্যক্ষও নয়; এমন কি, তাহাকেই আমরা অশক্তি মনে করিয়া অবজ্ঞা করি। ইহার একটা দৃষ্টান্ত—নারী। আমরা নারীকে 'অবলা' বলিয়া থাকি,—এক অর্থে, অর্থাৎ, সমাজ-ব্যবহারে নারী তাহাই বটে। কিন্তু আমি যে মহাশক্তির কথা বলিয়াছি, নারী-চরিত্রে তাহার পূর্ণ-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আমরা তাহা লক্ষ্য করি না; তার কারণ—অসহিষ্ণুতার সেই বিক্রম, অথবা জয়ী হইবার সেই বীরত্বস্পৃহা তাহাতে নাই। তথাপি, আমাদের মহাজ্ঞানী সাধক-পুরুষদের মতে, নারীই আত্মাশক্তি বা মহাশক্তির অংশ।

দৃশ্য ও দ্রষ্টা

সমস্ত জগৎ—জীব-মানুষ—একটা একই শক্তির স্রোতে, তাহার অধীন হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মানুষ উচ্চতম জীব বলিয়া তাহার কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি যতই স্বাধীন ও আত্ম-সচেতন হউক, সকলেই সেই নিয়মের অধীন,—অর্থাৎ সৃষ্টি-স্রোতের অবশ তৃণখণ্ড। তাহার যতকিছু কামনা-বাসনা, দুর্জ্জয় লোভ—সকলই সেই অন্ধ প্রকৃতিশক্তির অন্তর্ভূত। তথাপি, ঐ মানুষের মধ্যেই এমন শক্তিমান্ পুরুষের উদয় হয়, যাহারা ঐ স্রোত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একটু পৃথক্ থাকিয়া সেই শক্তির লীলাকে পরিদর্শন করিতে পারে। ইহারাই প্রকৃত 'দ্রষ্টা', আর সকলে 'দৃশ্য' মাত্র। এই দ্রষ্টার দৃষ্টিও তিন রকমের হইতে পারে।—

(১) আর্ট-দৃষ্টি; অনাসক্ত ভাবে দেখা, এবং তাহা হইতে একপ্রকার রস আস্বাদন করা। ইহাদের প্রেমও নাই, সত্য-পিপাসাও নাই। ইহারা যথাদৃষ্ট জগৎকে স্বীকার করিয়া লয়, এবং তাহাকে, হয় আত্মভাবমণ্ডিত, নয় আত্মভাব বর্জ্জিত করিয়া—একটা রসরূপে উপভোগ করিয়া থাকে।

(২) প্রেমের দৃষ্টি; জগৎকে শুধুই স্বীকার করে না, তাহার সহিত নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে; নানারূপ নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মানুষের কল্যাণ-সাধন করিতে অধীর হইয়া উঠে। এই নিঃস্বার্থতাই তাহাদিগকে সেই সৃষ্টিধারার শক্তি-পাশ হইতে মুক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাহারা স্বার্থশক্তিমান্,

যাহাদের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি মাত্রাভেদে এই জগতে নানারূপ দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, তাহারা মুক্ত নয়—ঐ সৃষ্টিধারারই অবিচ্ছেদ্য তরঙ্গমালা। ঐ প্রেম উচ্চস্তরে উঠিলে—সেই মানুষ 'জীবন্মুক্ত' হয়।

(৩) জ্ঞানের দৃষ্টি; জগৎকে স্বীকার করে না, তাহার সহিত রসের বা প্রেমের—কোন সম্বন্ধ রাখে না। এইরূপ জ্ঞানী সকল দেশে আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ঐ জ্ঞান একটা বড় সাধনপন্থা,—জীবন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার সাধনা।

বেরসিক

প্রকৃত রসিক যিনি, অর্থাৎ জ্ঞান যাঁর হৃদয়ে পৌঁছিয়াছে, তাঁহার চক্ষে কোন মানুষই মন্দ বা বর্জ্জনীয় নয়; প্রত্যেকেই বিশ্বশিল্পীর এক-একটি শিল্পকর্ম্ম। ভক্তি বা ভালবাসার পাত্র সকলে না হইতে পারে, সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্ভব নয় বটে, তথাপি কোন মানুষের প্রতিই ঘৃণা বা বিরক্তি হইবার কারণ নাই; যাহাদের হয়, তাহারা অজ্ঞানী বা বেরসিক।

৩

জীবন-সন্ধ্যায়

[১৩৫১-১৩৫৭]

শক্তির লীলা

শক্তির তিন লীলা। আদি-লীলার সহায় পশু, অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ—যাহারা অজ্ঞান, প্রকৃতি-পরবশ ; ইহারা সত্যই দুর্ব্বল—বলির পশুর মত দুর্দ্দশা ভোগ করে। মধ্য-লীলার সহায়—বীর, অর্থাৎ, যাহারা বীর্য্যবান্ ও দুঃসাহসী। ইহারা নিজেরা বলির পশু না হইয়া, ঐ প্রথমগুলাকে বলি দেয়, সেই পশুযাগে ইহারাই শমিতা বা ঘাতকের কাজ করে। ইহারাই সংসারের যত স্বার্থপর, বলবান্ ও ক্রূরকর্ম্মা পুরুষ। শেষ এবং শ্রেষ্ঠ লীলার সহায় যাহারা, তাহারা নিজেরাই নিজেকে বলি দেয়—একাধারে বলি ও বলিদাতা। ইহারাই পরম-পুরুষের 'অবতার'—প্রেমিক। অতি উর্দ্ধস্তর হইতে নিম্নতম তল পর্য্যন্ত—ঐ প্রেমই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ; ইহারা না থাকিলে শক্তির কোন লীলাই সম্ভব হইত না।

আমার ভাব-চিন্তা

আমার যতকিছু ভাব ও চিন্তা—আমার পক্ষে তা' ক্ষণিক, আমার জীবনে এদের কোন প্রত্যক্ষ ফল বা প্রভাব নেই। এই ক্ষণিক—আমার চেয়ে যারা পুণ্যবান্—তাদের জীবনে শাশ্বত হ'য়ে উঠুক ; যদি কোথাও এর কোন সত্য তাদের কাজে লাগে, তবে আমি হ'ব তাদের সেই সত্যারোহণের পাদপীঠ মাত্র, এ ছাড়া আমার এই জীবনের আর কোন সার্থকতা নেই।

মধ্যপন্থা

সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বরং ভালো, কিন্তু জীবনকে ফাঁকি দেবার জন্যে আর-কিছুর চর্চ্চা শেষপর্য্যন্ত মানুষকে বাঁচাতে পারে না ; ঋণই বেড়ে যায়, শেষে তার চাপে বিনষ্ট হওয়াই অনিবার্য্য। রাগ ও বৈরাগ্য, এই দুইয়ের মধ্যে রফা করা

চলে না, সংসারে থেকে সংসারকে আড়াল করে' থাকার মত মিথ্যাচার আর নেই ; এর প্রতিশোধ সংসার একদিন নেবেই। সংসার ও সন্ন্যাস, এ দুইয়ের মধ্যে কোন রফা বা মধ্যপন্থা নেই, অর্থাৎ দুর্ব্বলের কোন স্থান এখানে নেই।

বুঝা ও না-বুঝা

যা' বুঝিনে তা' যদি আমরা নিজের কাছে নিজে স্বীকার করতাম—'বুঝি' বলে' কোন অভিমান না রাখতাম, তা'হলে নিজের ও পরের কত দুঃখ ও বিপদ্ নিবারণ হ'ত! কিন্তু সে-ও যে একটা বড় 'জ্ঞান'—তেমন জ্ঞানী ক'জন আছে ?

সভ্যতা

জীবন যত সরল হয়, ততই আত্মার প্রকাশ সহজ হয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা বুঝিতে হইলে, শুধু এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতেই হইবে। আমরা এখন যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহা সেই আত্মার নয়—মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ ; তাহার বড় আড়ম্বর, বড় জটিলতা। ভারতবর্ষ তাহা চাহে নাই, ঐ সভ্যতার মোহ সে প্রাণপণে বর্জ্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। 'আত্মা' ও 'মন'—এই দুইটি এমনই পরস্পর-বিরোধী যে, ঐ দুইয়ের পথই ভিন্ন। তাই বলিয়া ভারতবর্ষ অসভ্য নয়—তাহার সভ্যতা বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী।

ভক্তি ও জ্ঞান

জ্ঞান, শক্তি ও ভক্তি—এই তিন একই তত্ত্বের তিন রূপ। জ্ঞানই যে শক্তির মূল, তাহা সাধারণ অর্থেও আমরা বুঝি ; কিন্তু ভক্তি যে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা তাহা বুঝিতে বহু বিলম্ব হয়। ভক্তিকে সাধারণ সংস্কারে আমরা জ্ঞানের উল্টা বলিয়া মনে করি ; তার কারণ, অজ্ঞানের ও অন্ধবিশ্বাসের যে তামসিক ভক্তি, তাহাই সর্ব্বত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্ঞানের নানা phase, বা ক্রম ও সোপান আছে ; পরম ও চূড়ান্ত জ্ঞান ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন লাভ করা যায় না—সাধকমাত্রেই তাহা জানেন। শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ", ইহার অর্থ, তিনি কৃপা না করিলে, কেবল পুরুষকারের দ্বারা তাঁহাকে, অর্থাৎ সেই পরম তত্ত্বকে লাভ করা যায় না। তাই সাধকের সাধনার শেষ সোপানে—জ্ঞানেরই শেষ সীমান্তে—সকল অহংকার লোপ পায় ; তখনই ভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তিই জ্ঞানের আলো হইয়া উঠে।

জয়লাভ

কোন ব্যক্তিকে বুঝিতে পারা, তাহাকে উত্তমরূপে চিনিয়া লওয়াই তাহার উপরে প্রকৃত জয়লাভ, কারণ, তখন সে আর তোমাকে ঠকাইতে—দুঃখ দিতে বা নিরাশ করিতে পারিবে না।

করুণা

সৃষ্টির মূলতত্ত্ব—করুণা; এই করুণা অপার, অপরিমেয়; মানুষের সংস্কারে ইহার ধারণা অস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ। ইহারই নানা রং—প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি। কিন্তু উহার যে শুভ্র-রূপ তাহাই ভাগবতী করুণা—সমগ্র সৃষ্টির মূল ধর্ম্মধাতু তাহাই। উহাই মানুষের জীবন বা মর্ত্ত্য-বিধানের স্ফটিক-আবরণে বাধা পাইয়া বিচ্ছুরিত হয়—নানা রং ধারণ করে, ঐ রংগুলি যেমন ক্ষণিক, তেমনই মোহকর।

ভাগবতী করুণার কোন রং নাই, তাহা নিরঞ্জনা। সেই করুণা অহেতুক, তাহাতে কোন হিসাব নাই, দেনা-পাওনার বিচার নাই; সে করুণা আপনাকে নিঃশেষে দান করিবার জন্যই যেন কাতর—না, 'কাতর' বলিলেও ঠিক হয় না, কেন না, তাহাতে কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভাববোধ নাই, অথচ সেই করুণা আপনাকে কেবল বিস্তার করিতেই চায়—সে যে কি কারণে, তাহা বুঝিতে হইলে, সেই করুণায় নিজেও করুণ হইয়া উঠা চাই। যাহারা তাহা হয়, তাহারাই ব্যক্তি-চেতনার বাঁধন ছিঁড়িয়া সেই নৈর্ব্যক্তিক ভাব-সাগরে ডুবিয়া যায়—সমাধিস্থ হয়, যেন কি এক অসীম আনন্দে অচেতন হইয়া যায়! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন-তখন এইরূপ হইয়া যাইতেন—ঐ ভাগবতী করুণার বিশ্ব-চৈতন্যে ডুবিয়া যাইতেন।

ইহাকেই বলিয়াছি—'নিরঞ্জনা'; কারণ জাগতিক প্রেম-স্নেহ ইহার বিপরীত, তাহা নিরঞ্জনা নয়—রঙীন। ঐ সব মানবীয় হৃদয়বৃত্তি প্রাকৃতিক-ধর্ম্মের অনুগত, উহা দেহের—আত্মার নয়। একটি প্রকৃতির—অপরটি পুরুষের।

কিন্তু ঐ দুইয়ের মধ্যে একটা গূঢ় সম্পর্কও আছে। ঐ শুভ্রই রঙীন হইয়া মোহের সৃষ্টি করে বটে, তবু ঐ রংকে ধরিয়াই শুভ্র অবস্থায় পৌছিতে হয়। দেহধারণ করিয়া ঐ রংকে অস্বীকার করা চলিবে না; ঐ রঙের খেলায় খুব বেশি মাতিয়া উঠিলে মাঝে মাঝে যে রং-ছুট হয়, তাহাতেই সেই মূল বস্তুটির দিব্যরশ্মি সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং "মোহই মুক্তিরূপে জ্বলিয়া" উঠে।

বস্তুতান্ত্রিক

Ideal ও Real। যে Real-এর মধ্যেই Ideal-কে দেখে সে রসিক; যে Ideal-কে Real হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্‌ভাবে তাহার উপাসনা করে সে গোঁয়ার, বেরসিক; আবার যে Ideal-কে একেবারে বহিষ্কার করিয়া Real-এর ভজনা করে, সেও ভ্রান্ত; সে শুধুই বে-রসিক নয়—কু-রসিক, জীবনকে বড় ছোট করিয়া ভোগ করে; অধিকাংশ স্বার্থপর, বিষয়ী লোক এইরূপ Realist। কিন্তু যাহারা খাঁটি Realist, তাহারা খাঁটি Materialist-ও বটে; তাহারা আত্মাকেও অস্বীকার করে; ইহাদের একটা কঠিন যুক্তিবাদ বা দার্শনিক মতবাদ থাকিলেও ইহারা সাধারণ সুস্থ মানুষ নয়—একপ্রকার 'fanatic'।

মানুষের বন্ধু

মানুষের উপকার করবার স্পর্দ্ধা কেবল তারই সাজে, যে নিজে মানুষ হ'তে পেরেছে; সর্ব্বাগ্রে হৃদয়বান্‌ হওয়া চাই—প্রাণটা মানুষের প্রাণ হওয়া চাই। নইলে, কেবল একটা খুব উঁচু আদর্শের নামে মানুষকে ধমক দেওয়া, সর্ব্ববিষয়ে তার দোষ ও দুর্ব্বলতাকে দায়ী করা, এবং সেই আত্মগত একটা আদর্শকে মানুষের উপরে চাপাবার যে পুণ্যচেষ্টা—সেটা কেবল দম্ভ ও আত্মপ্রচার মাত্র। যার চোখে একবিন্দু জল নেই, তিনি যত বড় মহাত্মাই হোন—মানুষের বন্ধু ন'ন।

মেয়েমানুষ

মেয়েমানুষ একটা বাঁশির মত, যে যেমন বাজাতে জানে, সে তেমন সুর আদায় করতে পারবে, যে ওস্তাদ, সেই সবচেয়ে ভাল বাজাতে পারে—প্রাণের ফুঁ দিয়ে। যারা আনাড়ি, তারা বাঁশিখানাকে নানারকমে বেসুরো ক'রে তোলে, এমন কি, ভেঙে নষ্ট ক'রেও ফেলে।

মহত্ত্বের দুইরূপ

পুরুষ-চরিত্র যত মহান্‌ হয়, ততই তাহার সকল জ্ঞান, সকল শক্তি ও সকল মহিমার অন্তরালে একটি শিশুসুলভ সারল্য ফুটিয়া উঠে। আবার, নারীর প্রকৃত মহিমা আমরা যেখানেই দৃষ্টিগোচর করি, সেখানেই মাতৃভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখি। তাহা হইলে, নারীর ঐ মাতৃরূপ এবং পুরুষের ঐ শিশুরূপ—উহাই মনুষ্যত্বের আদি ও শেষ! পূর্ণ-জ্ঞানে কোন ভয় নাই, সংশয় নাই, লাভ-ক্ষতির

ভাবনা নাই, কাহারও সহিত বিরোধ নাই—সে যেন মায়ের কোলে শিশুর মত বসিয়া আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবস্থা হইয়াছিল। তথাপি ঐ পূর্ণ-মাতৃরূপা যে নারী, তাহার মহিমা যেন আরও অধিক—ঠিক যে-কারণে ছেলের চেয়ে মা বড়। তেমন নারী যদি কেহ দেখিয়া থাকে, তবেই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে।

জানা ও পাওয়া

যতক্ষণ জানি, কিন্তু পাই নি, ততক্ষণই দুঃখ—তার চেয়ে না-জানাও ভাল। কিন্তু জান্‌তে হয়—অথচ, পাওয়া দুরূহ। ঐ জানাটাই দুঃখের কারণ হ'য়ে উঠে। তারপর যখন পেলাম, তখন জানাটা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। তাই এমন কথা বললে ভুল হবে না যে, যে পেয়েছে সে আর 'জানে' না (কারণ জানাটাই তো পাওয়া হ'য়ে গেছে); যে পায়নি সেই জানে—আর ঐ জানা-ই তার শাস্তি: ইহারই নাম জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া। কথাটা সংক্ষেপে এইরকম অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ায়—'যে পেয়েছে সে জানে না, যে পায়নি সেই জানে'।

একটি উপমা

একটি চমৎকার উপমা মনে পড়ল। ভাবছিলাম, এমন কত মানুষ সংসারে অপরিচিত থেকে যায়—ইতিহাসে তো নয়ই, এমন কি সমসাময়িক সমাজেও অখ্যাত থেকে যায়,—অথচ যারা সেইরূপ খ্যাতনামাদের চেয়েও মহৎ। কেউ তাদের জানতে চায় না, তাদেরও জানাবার কোন প্রয়োজন হয় না। আমি অসাধারণ মানুষের কথাই বলছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"The greatest men of the world have always passed away unnoticed"। সেই কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না—এতবড় অবিচার সৃষ্টি-বিধানের পক্ষে একটা কলঙ্ক নয় কি?

ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, বিখ্যাত হওয়াটা কি কোন সত্যের জন্য প্রয়োজন? আবার, সংসারের কারবার তো কোন পারমার্থিক সত্যকে নিয়ে নয়,—তার ধর্ম, তার নীতি আলাদা। আমরা যে-সংস্কারের বশে জীবনের যে-মূল্য ঠিক ক'রে নিয়েছি, তার দিক্ দিয়ে ঐ সব মহাপুরুষের জীবন ব্যর্থ ব'লেই মনে হবে। সে আমাদেরই সংকীর্ণ বুদ্ধির অহংকার—আমরা আমাদের এই সমাজ-জীবনের একটা দম্ভমূলক মাপকাঠি দিয়ে মানুষের ছোট-বড় বিচার করি, খ্যাতিও সেই

কারণে হয়ে থাকে—সংসারের সেই প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। এখানকার এই কীর্ত্তি-খ্যাতি-শক্তি-সম্পদের বাজারে যে একটা বড় ব্যবসায়ের মালিক হ'তে না পারলো, তাকে আমরা কৃপার চক্ষে দেখি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই মনে হবে, মাপকাঠি তো শুধু ঐ একটাই নয়—এমন কি, আমাদের ঐ মাপকাঠিও ভুল। ওটার নাম জাগতিক জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি—ও'তে তো আদি ও সত্যিকার মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাবে না। তখন উপমাটি মনে এল।

ধর, একটা বিশাল রঙ্গমঞ্চের সামনে আমরা—ঐ বিচারকেরা—দর্শকশ্রেণীতে ব'সে আছি। 'মানব-জীবন'-নামক মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে। ঐ রঙ্গমঞ্চে যারা নানান্ ভূমিকায় সেজে দেখা দিচ্ছে, তাদের আমরা যেমন দেখছি—তাদের যে পরিচয় পাচ্ছি, ভিতরের সাজঘরেও তারা কি সেই পরিচয়ের সেই মানুষ? যে রাজা সেজে, বা নায়ক সেজে আমাদের চোখে একটা বিশেষ মহিমা লাভ করছে, সে হয়তো নাটকের সেই ভূমিকার বাইরে একটা অতিশয় সাধারণ মানুষ, তার অবস্থাও হয়তো খুব খারাপ। আবার, যে ভিখারী সেজে অভিনয় ক'রে গেল, সে হয়তো আসলে একজন জমিদার। কিন্তু সে পরিচয় এই নাট্যশালার পক্ষে আদৌ সত্য নয়—ঐ ভূমিকাই সত্য। রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে যে নেপথ্য-গৃহ আছে সেখানে ঐ অভিনেতাদের প্রকৃত পরিচয় সকলেই জানে, কিন্তু তাতে আমাদের এই প্রেক্ষাগৃহের দর্শকগণের কি প্রয়োজন? আমাদের কাছে ঐ রাজাই রাজা, এবং ঐ ভিখারীও ভিখারী ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের ইতিহাসেও ঠিক তেমনি, ঐ অভিনয়-জীবনের ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বই লিপিবদ্ধ হ'য়ে থাকে—আসল মানুষটার পরিচয় তা'তে নেই।

অভিনেতাদের দিক্ দিয়েও যদি দেখা যায়, তবে তাদেরও এই রকম পরিচিত হওয়ার মধ্যে কোন লাভ-লোকসান নেই। রাজা ও ভিখারী দুইয়েরই একমাত্র কাজ—অভিনয় ভাল করে' করা। যে আসলে জমিদার তাকে যদি লোকে ভিখারী ব'লেই স্থির করে, তবে তাতেই তার ঐ নট-জীবনের সার্থকতা। কিন্তু সেই খ্যাতি আসল মানুষগুলোর নয়। সে মানুষ নিজের আসল পরিচয় জানে, সে পরিচয় ঐ রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ করবার কোন প্রয়োজনই যে নেই।

অতএব, যারা সত্যিকার মহাপুরুষ তারা যদি এই পৃথিবীর হাটে—এই মিথ্যা-সুন্দর কাব্যকল্পনার নাট্যনিকেতনে কৃত্রিম আলোকচ্ছটা ও রঙীন বেশ-বাসের

রাজমর্য্যাদা লাভ না করে, তবে দুঃখের কি কারণ আছে? এখানকার যে বিচার তার মূল্যই বা কতটুকু? সংসারে-সমাজে যেমন, ইতিহাসেও তেমনি, কত মানুষ পরের মহত্ত্ব আত্মসাৎ করে, কিম্বা সম্পূর্ণ মিথ্যা খ্যাতির অধিকারী হয়!

প্রতিদান

আমাকে যাহারা ভালবাসে তাহার প্রতিদানে আমি তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারি না; কিন্তু তাহাদের সেই ভালবাসাকে আমি আমার প্রভুর আশীর্ব্বাদ বলিয়া যেন গ্রহণ করিতে পারি।

মানুষকে দেখা

সংসারে, মানুষ মানুষকে যে দৃষ্টিতে দেখে, সে দৃষ্টি অন্ততঃ চার রকমের যথা—

(১) সকল মানুষই মন্দ; ইহাও আবার দুই রকমের—(ক) আমি যেমন মন্দ বা স্বার্থপর, আর সকলেও তেমনই; কেউ ভাল নয়; সাবধানে না চলিলেই বিপদ্। (খ) আমিই ভাল, আর সকলে মন্দ; অন্ততঃ আমার মত ভালো আর কেহ নয়।

(২) মানুষ ভালও আছে, মন্দও আছে; যে আমার আত্মীয় বা হিতকারী—যে আমার আনুগত্য করে বা আমার সমধর্ম্মী—সে ভালো, আর সকলে মন্দ।

(৩) একই মানুষ কখনো খুব ভাল, আবার কখনো খুব মন্দ। এখানে স্বার্থের সম্পর্ক না থাকিতেও পারে; যাহারা sentimental বা Idealist তাহারা মন্দ সহ্য করিতে পারে না, মন্দকেও ভাল মনে করে, এজন্য বারবার ভুল করে, ভালকেও মন্দ মনে করে।

(৪) মানুষ ভাল এবং মন্দ, দুই-ই। ইহাই সত্যদৃষ্টি। এই দৃষ্টির জন্য—যাহারা সংসারী বিষয়ী লোক তাহারাও যেমন সাফল্য লাভ করে, তেমনই, যাহারা উচ্চস্তরের, তাহারাও রসিক বা জ্ঞানী হইয়া থাকে।

পাপ ও পাপী

'পাপ' ও 'পাপী' সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল সংস্কার আছে। মানুষ যতক্ষণ পাপবোধ না করে, ততক্ষণ সে পাপী নয়,—যখন তাহার সেই পাপ-বোধ হয়, তখনই সে পাপী। আমরা যখন তাহাকে 'পাপী' বলি, সে তাহা গ্রাহ্য করে না, না করিবারই কথা; কারণ, তখন সে দুর্ব্বল নয়—যতক্ষণ পাপাচরণের শক্তি থাকে

ততক্ষণ কোন ভাবনাই সে করে না; যতক্ষণ সে নিজেও তাহা না মানে, ততক্ষণ সংসারেও সে পদস্থ থাকে। আবার, অপরাধীকে বিচারক দণ্ড দিলেও, সে যদি অন্তরে অপরাধ স্বীকার না করে তবে তাহার পক্ষে ঐ দণ্ডও বৃথা; তাহাতে সমাজের প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার চিত্ত আরও কঠোর হইয়া উঠে। যতদিন তাহার পাপ করিবার শক্তি আছে ততদিন সে পাপকে মানে না, তাই সে 'পাপী' নয়।

কিন্তু অধ্যাত্ম-জগতের নিয়ম এমনই যে, ঐ শক্তিরও প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য, তাহার ফলে একদা সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে—অন্তরে-বাহিরে আশ্রয়হীন হইয়া বড় কান্না কাঁদে। এই অবস্থাই 'পাপীর' অবস্থা। কারণ, তখন doing-এর অবস্থা নয়—suffering-এর অবস্থা; তখন সে শক্তিহীন, তাই পাপী। শক্তিহীনও পাপ করে; তখন পাপ-বোধ মাত্র জাগিয়াছে, শক্তিহীন হইলেও সে তখন প্রবৃত্তির বশ। এই অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য।

পরম অনুভূতি

যাহা কিছু পরম-অনুভূতি তাহাই সত্য, সত্য না হ'লে পরম-অনুভূতি হয় না; সেই অনুভূতির বিষয় যেমনই হোক, প্রত্যয়টা একইরূপ; যেন সকল উৎকণ্ঠা সকল সংশয় নিবৃত্ত হয়, সারাপ্রাণ আশ্বস্ত হয়, তাহাতেই বুঝি যে, উহা সত্য। এইরূপ পরম-অনুভূতি বড়ই বিরল, যে-কোন আবেগময় অনুভূতিই পরম-অনুভূতি নয়, তাহা মনের একপ্রকার উদ্দীপনা মাত্র—তাহাতে মিথ্যাকেও সত্য মনে হইতে পারে।

শক্তিতত্ত্ব

ভোগ বা ত্যাগ দুইয়েতেই শক্তি চাই, এই শক্তির মূলে আছে—অহংসংস্কার, আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা। যাহার সেই শক্তি নাই সে তামসিক অবস্থায় আছে, যাহার ঐ শক্তি প্রবল তাহার অবস্থা রাজসিক। ঐ শক্তিটাই আসল, উহাই রজোগুণ; উহা moral বা immoral নয়, কারণ শক্তিটা সর্ব্বত্র সেই একই শক্তি—শক্তির কোন গুণভেদ নাই। যে-ব্যক্তি নিজের সুখ-সাধনায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করে না, সেও যেমন রজোগুণের অধিকারী, তেমনই যে-ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণে অতিশয় উৎসাহী তাহারও সেই এক রাজসিক প্রকৃতি; আমরা যাহাকে 'moral' বলিতে শিখিয়াছি, তাহাও আসলে একটা অহং-প্রতিষ্ঠার লক্ষণ। রাজসিক প্রবৃত্তির ঐ

দুই—moral ও immoral-নাম, এবং একটার প্রশংসা ও অপরটার নিন্দা করা হয় এইজন্য যে, একটা সমাজের হিতকর, অপরটা তাহার বিপরীত; ব্যক্তির প্রকৃতি কিন্তু মূলে এক—দুইটাতেই সেই অহং-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু সাত্ত্বিক বলিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি বুঝায়। সেখানে ভোগে ও ত্যাগে, কোনটাতেই ঐরূপ অহং-চেতনা নাই; তাই ভোগেও ভোগ নাই, ত্যাগেও ত্যাগের আত্মগৌরব নাই; সে যেন শক্তিমত্তাও নয়, শক্তিহীনতাও নয়। সেখানে সেই Ego বা অহং—soul বা 'আত্মা' হইয়া গিয়াছে; সে একটি পরিপূর্ণতা, তাহাতে পিপাসার পরিবর্তে নির্বৃতি আছে, শক্তির পরিবর্তে শান্তি আছে।

মহত্ত্বের লক্ষণ

সত্যকার মহত্ত্বের একটা অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ এই যে, মহত্ত্ব আপনাকে জানে না, নিজের সেই মহত্ত্ব-চেতনা তাহার নাই।

শাকান্ন

সর্ব্বমানবের সহিত সমানভাবে যাহা ভোগ করিতে পারি, তাহাতেই আমার ন্যায্য অধিকার আছে; নিজের জন্য যে পৃথক্ অন্ন, তাহা পাপের অন্ন, গীতা ঠিকই বলিয়াছেন—"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"; অর্থাৎ যাহারা কেবল আপনার জন্য অন্ন পাক করে, তাহারা পাপের অন্ন ভোজন করে।

কারণ, কেবল আপনার জন্য হইলে, সকলের সহিত সমানভাবে ভোগ করা আবশ্যক হয় না। যখনই দেখি, একজন যাহা পায় না, আমি তাহা পাই—একজন যাহা খায় না, আমি তাহা খাই, তখনই মনে হয়, আমি চোর, আমি অধার্ম্মিক। ইহাও সত্য যে, একজন বেশি খায় বলিয়াই আর একজন খাইতে পায় না।

ইহা Communism নয়, ইহা সেই আত্মার ধর্ম্মবোধ—যে আত্মাকে Communist অস্বীকার করে। ভোগের উপকরণ-বাহুল্য আত্মার জন্য নয়; সর্ব্বমানবের সহিত সমান করিয়া যে ভোগ, তাহা কেবল সমানাধিকারের দাবী নয়; তাহাই যথার্থ ভোগ, অর্থাৎ সেই ভোগই আত্মার তৃপ্তিকর; তাহাতে ধনী-নির্ধনের প্রশ্ন নাই—সেই প্রশ্নও পাপ। সেই যে অন্ন, তাহা সামান্য হইলেও, ঐ কারণে—অর্থাৎ, আত্মার তৃপ্তিকর বলিয়াই—প্রচুর, দেহের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যকর। আমরা আত্মার উপরে দেহের ক্ষুধাকে বড় করিয়াছি বলিয়া তৃপ্তি চাই না, ঐ ক্ষুধাকেই বাড়াইয়া তুলি; সেই শাকান্নে রুচি হারাইয়াছি—যে-শাকান্ন মানুষ-

মাত্রকেই ভগবানের অযাচিত দান, এবং অতিরিক্ত ভোগলালসার বশে যাহা হইতে আমরা মানব-সাধারণকে বঞ্চিত করিয়াছি।

একটি প্রশ্ন

যাকে বুঝি তাকেই ভালবাসি, না—যাকে ভালবাসি, তাকেই বুঝি?

পাপাত্মা

পাপকে পূজো করে যারা তারাই 'পাপাত্মা', যারা শুধু পাপ করে তারা পাপী মাত্র, তার বেশি নয়। পাপীর পরিত্রাণ আছে, পাপাত্মার নেই।

কামনা-সিদ্ধি

আমাদের একটা বড় দুঃখ এই যে, আমরা যাহা কামনা করি তাহা পাই না,—ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, এমন কি, ধর্ম্মও—কিছুরই কামনা পূর্ণ হয় না। শেষে, দৈব বা অদৃষ্টই দায়ী, এইরূপ ধারণাই দৃঢ় হয়। কিন্তু, কেহই বুঝিতে পারি না যে, তজ্জন্য আদৌ আমরা নিজেরাই দায়ী। মানুষের জীবনে যে দৈব নাই—এ কথা বলি না, কিন্তু দৈবকে বাদ দিয়াও মানুষ নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে নিজ-কামনা পূর্ণ করিতে পারে। আসল কথা, আমাদের সেই সব কামনা সত্যকার 'কামনা' নয়—'সাধ যায়' বটে, কিন্তু তাহাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা নাই। নিষ্ঠা অর্থে, সেই বস্তুটির পিছনে একান্ত মনে ও একান্ত প্রাণে লাগিয়া থাকিতে হইবে, তাহার জন্য যাহা-কিছু করা আবশ্যক তাহা বিনা দ্বিধায়, বিনা ভয়ে, ও বিনা লজ্জায় করিতে হইবে —ধর্ম্মাধর্ম্মের এতটুকু কুণ্ঠা থাকিলে চলিবে না। কিন্তু কয়জন তাহা পারে? আমরা অনেক কিছু চাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কয়েকটি সর্ত্তও রক্ষা করিতে হইবে—সর্ব্ব-নিরপেক্ষ ভাবে সেই বস্তু কামনা করি না। যাহারা সেই কামনা-সিদ্ধির পথটিও যেমন আদ্যন্ত দেখিয়া লইতে পারে—সেই বুদ্ধি যাহাদের আছে, এবং যাহারা সেই পথের কোন বাধাকেই মনে স্থান দেয় না, তাহাদের কামনা পূর্ণ হইবেই—দৈব প্রতিকূল না হইলে। একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র 'সাধ করা' বা 'ইচ্ছা করা' ও 'কামনা করা' এক নয়।

পূর্ব্ব-সংস্কার

বাঙলাদেশ ও বাঙালীকে আমি কতটুকু দেখেছি, কতটুকুই বা জানি? তবু আমি যেন তার আদি-অন্ত, তার রূপ ও তার প্রাণ—সবটাই এক পলকে দেখতে পাই। এর একমাত্র কারণ, আমার এই অভিজ্ঞতা এক জন্মের নয়, আমি

অনেকবার এই দেশে জন্মেছি। এবার যা' দেখেছি তা আগের সেই দেখার তুলনায় সামান্য। অথবা, যাঁরা জন্মান্তর মানেন না, তাঁরা অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করবেন যে, আমার পূর্ব্বপুরুষদের রক্তে এই বাঙলাদেশের ও বাঙালী-সমাজের যে পরিচয় সঞ্চিত হয়েছিল, আমার রক্তেও তাই এমন অনুভব-তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে; তারও কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙালী এখন মরতে বসেছে।

বাসনা ও কামনা

'বাসনা' ও 'কামনা'—এই দুইটি শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। একটি—মানুষের সাধ, বা কাল্পনিক সুখাকাঙ্ক্ষা; তাহাতে কোন সত্যকার চেষ্টা নাই, জীবনের বাস্তব প্রবৃত্তি হইতে উহা বিচ্ছিন্ন। যেখানে ঐ আকাঙ্ক্ষার সহিত বাস্তব ভোগ-স্পৃহা যুক্ত থাকে সেইখানেই উহার নাম—কামনা। ঐরূপ বাসনার কারণ বুঝিতে হইলে জন্মান্তর মানিতে হয়। ঐ 'বাসনা' জন্মান্তরীণ 'কামনারই'—অতীত সুখ-ভোগের—একটা স্মৃতি মাত্র, উহার আর এক নাম—'সংস্কার'। সত্যকার ভোগ-পিপাসা আর নাই—তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন কেবল তাহার একটা কাল্পনিক রস-সম্ভোগ আছে। আর তাহা 'চাই না'—'চাহিতে ইচ্ছা হয়' মাত্র; এইরূপ ইচ্ছার নাম 'বাসনা'।

পাত্র ও পানীয়

আমারে করেছ পাষাণ-পাত্র—মসৃণ, মনোহর,
তোমার সভায় সুধা-পানে তাই তার এত সমাদর!
ওষ্ঠে সবার তুলিয়া ধরি যে পরম পিপাসা-বারি—
কণাটিও তার আপন অঙ্গে আমি যে শুষিতে নারি!
হায়, প্রভু, হায়! একি গৌরব, একি মোর সম্মান!—
পাত্র হইয়া র'ব চিরদিন—কভু না করিব পান!